রাজনীতি: জাতীয় ও আন্তর্জাতিক

প্রফেসর এমাজউদ্দীন আহমদ

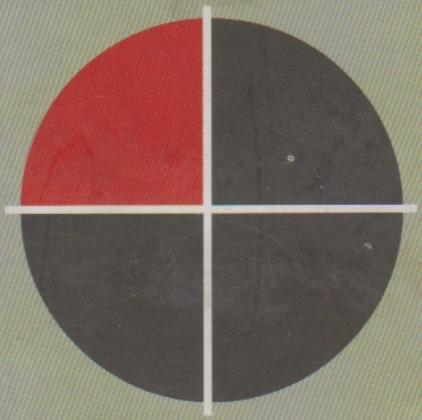

www.pathagar.com

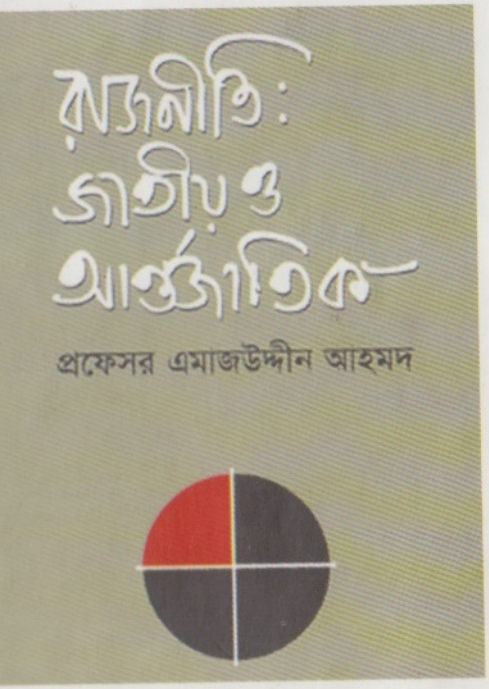

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারম্যান ও প্রফেসর ড. এমাজউদ্দীন আহমদ দেশের একজন খ্যাতনামা শিক্ষাবিদ এবং একাডেমিক ব্যক্তিত্ব। তিনি এই বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য এবং উপাচার্য রূপেও দায়িত্ব পালন করেন দীর্ঘ আট বছর। প্রফেসর এমাজউদ্দীন আহমদ একজন প্রখ্যাত গবেষক এবং পর্যালোচক। দীর্ঘ ৩৫ বছর ধরে তুলনামূলক রাজনীতি, বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি, দক্ষিণ এশিয়ার সামরিক বাহিনী সম্পর্কে গবেষণা করে চলেছেন। এসব ক্ষেত্রে তিনি সমগ্র দক্ষিণ এশিয়ায় অত্যন্ত শ্রদ্ধেয় বিশেষজ্ঞ হিসেবে প্রখ্যাত। তাঁর লিখিত গ্রন্থের সংখ্যা বর্তমানে ৪৩। দেশ-বিদেশের খ্যাতনামা জার্নালে তাঁর প্রকাশিত গবেষণামূলক প্রবন্ধের সংখ্যা দেড় শতাধিক।

তাঁর লিখিত গ্রন্থগুলোর (ইংরেজি) মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল: Bureaucratic Elites in Segmented Economic Growth: Bangladesh and Pakistan (1980), Development Administration : Bangladesh (1981),

www.pathagar.com

SARC: Seeds of Harmony (1985), Military Rule and Myth of Democracy (188) তার সম্পাদিত গ্রন্থগুলির (ইংরেজি) মধ্যে বিশেষভাগে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে Bangladesh Politics (1980), Foreign Policy of Bangladesh (1984), Society and Politics in Bangladesh (1989), Bangladesh, South Asia and the World (1992), তাঁর বাংলায় লেখা গ্রন্থগুলোর মধ্যে বিশেণষভাবে উল্লেখযোগ্য হল: রাষ্ট্রবিজ্ঞানের কথা (১৯৬৬), মধ্যযুগের রাষ্ট্রচিন্তা (১৯৭৫), তুলনামূলক রাজনীতি: রাজনৈতিক বিশ্লেষণ (১৯৮২), বাংলাদেশে গণতন্ত্রের সংকট (১৯৯১), বাংলাদেশ : সমাজ, সংস্কৃতি ও রাজনীতি (১৯৯২), সমাজ ও রাজনীতি (১৯৯৩), গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ, (১৯৯৪), শান্তিচুক্তি ও অন্যান্য প্রবন্ধ (১৯৯৮), আঞ্চলিক সহযোগিতা, জাতীয় নিরাপত্তা (১৯৯৯), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য প্রবন্ধ (২০০০)।

শিক্ষাক্ষেত্রে অবদান এবং সৃজনশীল লেখার জন্যে তিনি দেশে ও বিদেশে বিশেষভাবে সম্মানিত হয়েছেন। শিক্ষা ক্ষেত্রে বিশেষ বিশেষ অবদানের জন্যে তিনি লাভ করেছেন আকরাম খান গোল্ড মেডেল, মাইকেল মধুসূদন গোল্ড মেডেল, জিয়া স্মৃতি সংসদ গোল্ড মেডেল, শেরে বাংলা স্মৃতি স্বর্ণপদক, ঢাকা সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক স্বর্ণপদক, বাংলাদেশ ফ্রন্ট গোল্ড মেডেল, রাজশাহী বিভাগীয় উন্নয়ন ফোরাম স্বর্ণপদক। সৃষ্টিশীল গবেষণা ও আলেখ্য রচনার জন্যে তিনি লাভ করেছেন মহাকাল কৃষ্টি চিন্তা সংঘ স্বর্ণপদক। জাতীয় সাহিত্য সংসদ স্বর্ণপদক এবং জিয়া সাংস্কৃতিক সংস্থা স্বর্ণপদক এবং অন্যান্য অনেক সম্মাননা। ১৯৯২ সালে শিক্ষাক্ষেত্রে অবদানের জন্যে তাঁকে দেয়া হয় জাতীয় একুশে পদক। যুক্তরাষ্ট্র কেন্দ্রিক এবিআই কর্তৃক তিনি নব্বই দশকের সর্বাপেক্ষ প্রশংসিত ব্যক্তিত্ব।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

রাজনীতি : জাতীয় ও আন্তর্জাতিক

প্রফেসর এমাজউদ্দীন আহমদ

মিজান পাবলিশার্স
৩৮/৪, বাংলাবাজার, ঢাকা- ১১০০

www.pathagar.com

প্রকাশক

লায়ন আ. ন. ম. মিজানুর রহমান পাটওয়ারী

মিজান পাবলিশার্স

৩৮/৪, বাংলাবাজার (তৃতীয় তলা), ঢাকা-১১০০

ফোন ঃ ৭১১২৩৯১, ৭১১১৪৩৬, ৭১১১৬৪২

মোবাইল ঃ ০১১-৮৬৪৩২৬, ০১৭১-৪০০২১৮

ফ্যাক্স ঃ ০৮৮-০২-৭১১২৩৯১

প্রকাশকাল

একুশে বইমেলা, ২০০৫

স্বত্ব

লেখক

প্রচ্ছদ

নাসিম আহমেদ

বর্ণবিন্যাস

লাভলী কম্পিউটার

৩৮, বাংলাবাজার (৪র্থ তলা), ঢাকা-১১০০

মুদ্রণ

লাভলী প্রিন্টার্স এন্ড প্যাকেজিং ইন্ডাস্ট্রিজ (প্রাঃ) লিমিটেড

২৪, শ্রীশ দাস লেন, ঢাকা-১১০০

ফোন ঃ ৭১১২৩৯৫

মূল্য

২০০ টাকা মাত্র

ISBN

984-8613-05-6

Rajniti : Jatio O Antarjatik, Professor Emajuddin Ahmad

Published By : Lion A. N. M. Mizanur Rahman Patoary,

Mizan Publishers, 38/4 Banglabazar (2nd Floor), Dhaka- 1100.

Printed By : Lovely Printers & Packaging Industries (Pvt.) Limited

24, Srish Das Lane, Dhaka- 1100.

www.pathagar.com

উৎসর্গ
আমার বড় মেয়ে ইয়াসমিন
এবং
বড় ছেলে যীশুর জন্যে

www.pathagar.com

www.pathagar.com

ভূমিকা

জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সমস্যা সম্পর্কে জাতীয় দৈনিক পত্রে প্রকাশিত কিছুসংখ্যক লেখাকে একত্রিত করে মিজান পাবলিশার্স এর লায়ন আ. ন. ম মিজানুর রহমান পাটওয়ারী বই আকারে প্রকাশ করেছেন **রাজনীতি : জাতীয় ও আন্তর্জাতিক**–এই শিরোনামে। এজন্য তাকে উষ্ণ অভিনন্দন ও ধন্যবাদ জানাই। লেখাগুলি সমসাময়িক ঘটনাকে কেন্দ্র করে লিখিত হলেও এদের রয়েছে সাহিত্যিক এবং তথ্য সংক্রান্ত উপযোগ।

পাঠকের চিন্তা-ভাবনা উদ্দীপ্ত করার প্রবণতাও রয়েছে এসব লেখায়। তাই লেখাগুলিকে বই আকারে প্রকাশিত হতে দেখে খুশি হয়েছি। **রাজনীতি : জাতীয় ও আন্তর্জাতিক** বইটি পাঠক সমাজে সমাদৃত হলে ধন্য হব। প্রকাশক আ. ন. ম মিজানুর রহমান পাটওয়ারী যত্নসহকারে পাঠকের নিকট উপস্থাপিত করেছেন। তার উদ্যোগ সার্থক হোক–তাই কামনা করি।

ঢাকা
১ ফেব্রুয়ারি ২০০৫

এমাজউদ্দীন আহমদ

www.pathagar.com

www.pathagar.com

সূচিপত্র

ভূমিকা
১. জিয়াউর রহমানের নতুন রাজনীতি /১১
২. জিয়াউর রহমানের বৈদেশিক নীতি / ৩০
৩. এখন সবচেয়ে প্রয়োজন জিয়াউর রহমানের / ৩৪
৪. প্রেসিডেন্ট জিয়ার আন্তর্জাতিক সম্পর্ক / ৩৯
৫. প্রেসিডেন্ট জিয়ার অন্তর্দৃষ্টি : বাংলাদেশের পূর্বমুখী নীতি / ৪৩
৬. আজকের বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন রাষ্ট্রনায়ক জিয়াউর রহমানের/ ৪৮
৭. ২৫ মার্চের কালরাত্রি / ৫২
৮. এক পাকিস্তানি জেনারেলের কিছু অর্ধ-সত্য / ৬০
৯. সাত নভেম্বর বিপ্লবের মূলে/ ৬৪
১০. বুশ-ব্লেয়ারের নেতৃত্বে ইরাকে আগ্রাসন : বিশ্বব্যবস্থায় এর প্রভাব /৭১
১১. জর্জ ডব্লিউ বুশ ও ব্লেয়াররা কেমন আছেন? / ৯১
১২. এ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের প্রতিবেদন কীসের পরিচায়ক ? / ৯৭
১৩. ভারতের নতুন সরকার এবং বাংলাদেশ / ১০১
১৪. ভারতের নদী সংযোগের মহাপরিকল্পনা : আর এক মরণ ফাঁদ / ১০৭
১৫. আজকের রাজনীতি / ১১৮
১৬. বাংলাদেশে রাজনীতির ক্ষেত্রে তৃতীয় পন্থা / ১২২
১৭. জাতীয় নেতৃত্বের কঠিন পরীক্ষা / ১৩৪
১৮. বাংলাদেশে প্রয়োজন এক বুদ্ধিবৃত্তিক আন্দোলন / ১৩৮
১৯. বিশ্বায়নের একালে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস / ১৪৪
২০. মে দিবসের তাৎপর্য / ১৪৮
২১. নতুন বছরের এই দিনটিতে / ১৫১
২২. নতুন বছরের প্রত্যাশা / ১৫৪
২৩. পহেলা বৈশাখের মিলন মেলা / ১৫৯
২৪. গ্রন্থাগারের আলো / ১৬২
২৫. শান্তিপূর্ণ সমাজ জীবনের কিছু শর্ত / ১৬৬
২৬. সাংবাদিকতার দায়বদ্ধতা / ১৭১
২৭. গণতন্ত্র ও তথ্যের অবাধ প্রবাহ / ১৭৪
২৮. ইসলামে জবরদস্তির কোনো স্থান নেই /১৭৭
২৯. নওয়াব স্যার সলিমুল্লাহকে ভুলে কার সাধ্য? / ১৮২
৩০. স্মৃতিতে বেগম রোকেয়া কলেজ, রংপুর / ১৮৬
৩১. ইদ্রিস আহমাদকে যেমন দেখেছি / ১৯৪
৩২. আক্রান্ত ইরাক : বুশ ও ব্লেয়ারের অবৈধ আগ্রাসন / ১৯৭
৩৩. পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তি প্রসঙ্গে / ২০০
৩৪. কানকুনের দিকে তাকিয়ে / ২০৫
৩৫. আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বাংলাদেশের অর্জন / ২০৯

www.pathagar.com

www.pathagar.com

জিয়াউর রহমানের নতুন রাজনীতি

প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের শাহাদাত দিবসে অনুষ্ঠিত এই স্মারক বক্তৃতায় আমি তাঁর রাজনীতির বিভিন্ন দিক সম্পর্কে পর্যালোচনা উপস্থাপিত করতে চাই। তাঁর এই বিশাল কর্মকাণ্ডকে আমি "নতুন রাজনীতি" রূপে চিহ্নিত করে আলোচনা করেছি পাঁচভাগে। নতুন রাজনীতি বলেছি এই কারণে যে, এর পূর্বে কোনো জাতীয় নেতা রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডকে এমনভাবে জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছানোর উদ্যোগ গ্রহণ করেননি। প্রথমে রয়েছে তাঁর গ্রাম উন্নয়নের রাজনীতি এবং সর্বশেষে সৃজনশীল রাজনীতি। মাঝে রয়েছে তাঁর জনকল্যাণের রাজনীতি, উৎপাদনমুখী রাজনীতি এবং সমন্বয় ও ভারসাম্যের রাজনীতি।

এক : প্রেসিডেন্ট জিয়ার গ্রাম উন্নয়নের রাজনীতি

যে সমাজে রাজনীতি-সচেতন গুরুত্বপূর্ণ জনসমষ্টির মধ্যে (Politically relevant people) সমাজ জীবনের মৌলিক বিষয়সমূহে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সে সমাজে রাজনৈতিক কার্যকলাপ শান্তিপূর্ণভাবেই পরিচালিত হয়। প্রতিযোগিতা তীব্রতর হয়, কিন্তু বৈরিতার মাত্রা তেমন উঁচু হয় না। কিন্তু যে সমাজে সমাজ জীবনের মৌলিক বিষয় সমূহে প্রভাবশালীদের মধ্যে এখনো কোনো ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়নি, ঐ সমাজ দরিদ্র, দুর্ভাগ্যপীড়িত এবং অসহায় (রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক–উভয় অর্থেই)। সে সমাজে হিংসাত্মক প্রবণতাই প্রবল। প্রতিযোগিতার পরিবর্তে ঐ সমাজে মুখ্য হয়ে ওঠে বৈরিতা, সন্ত্রাস এবং সহিংসতা। এটি সমাজবদ্ধ মানুষের জীবনে এক নির্মম সত্য। ইউরোপ, উত্তর আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া, জাপানের মতো উন্নত গণতান্ত্রিক সমাজের দিকে দৃষ্টি দিন, দেখবেন সুস্থভাবে বেঁচে থাকার জন্যে যেসব মৌলিক চাহিদা মানুষের রয়েছে, যেমন : খাদ্য, পানীয়, বস্ত্র, সুস্বাস্থ্য, শিক্ষা ও অন্যান্য তা যেন সবার নিকট সহজলভ্য হয় এই সম্পর্কে ঐসব সমাজের সমাজপতিদের মধ্যে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। খাদ্যের ব্যবস্থা অথবা গৃহায়ণের দায়িত্ব যতটুকু ব্যক্তির, ঠিক ততটুকু সমাজের। সমাজে কর্মসংস্থানের দায়িত্ব যেমন ব্যক্তির, ঠিক তেমনি রাষ্ট্রের। শিক্ষা বা স্বাস্থ্যের জন্যে যা প্রয়োজন তার ব্যবস্থা গ্রহণ যেমন ব্যক্তির দায়িত্ব, ঠিক তেমনি রাষ্ট্রেরও দায়িত্ব। দারিদ্র্য বা বেকারত্বের অভিশাপ কোনো ব্যক্তিকে এককভাবে বহন

www.pathagar.com

করতে হয় না। মোট কথা, খেয়ে-পরে সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হয়ে, বাসস্থানের সর্বনিম্ন প্রয়োজন মিটিয়ে, শিক্ষা লাভের সুযোগ লাভ করে প্রত্যেকে উন্নত জীবনের আশীর্বাদ লাভ করুক–এ বিষয়ে সমাজব্যাপী ঐকমত্যের এক ঘন আস্তরণ তৈরি হয়ে গেছে। ঐসব সমাজে "বেকারত্ব বীমা" (Unemploment Insurance), "স্বাস্থ্য বীমা" (Health Insurance), এক পর্যায় পর্যন্ত সর্বজনীন শিক্ষা ব্যবস্থা প্রভৃতি হল ঐসব সমাজে ঐকমত্যের পরিচায়ক। আগেই বলেছি, সমাজব্যাপী ঐকমত্যের মাত্রা যত উঁচু, রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপে শান্তিপূর্ণ পরিবেশের অবস্থা তেমনি উঁচু মাত্রার। আবার ঐসব সমাজে যেসব ক্ষেত্রে এখনো ঐকমত্যের মাত্রা বৃদ্ধি পায়নি সেসব ক্ষেত্রে হিংসাত্মক কার্যকলাপের পরিমাণ এখনো অনেক বেশি। দৃষ্টান্তস্বরূপ, যুক্তরাষ্ট্রে "কালো মানুষের" সুযোগ-সুবিধার ক্ষেত্রে ঐকমত্যের মান তেমন উঁচু নয়। ফলে যা হবার তাই হচ্ছে।

আমাদের সমাজে সমাজ জীবনের মৌল সমস্যা সম্পর্কে এখনো কোনো ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়নি। কেউ বেকার হলে বেকারত্বের অভিশাপ তাকেই ভোগ করতে হয়। চরম দারিদ্র্যে নিপতিত হলে নিজ দায়িত্বেই সেই দরিদ্র বেঁচে থাকেন অথবা দিনে দিনে নিঃশেষ হয়ে যান। শিক্ষা গ্রহণের দায়িত্বও এককভাবে সেই পরিবারের। অসুস্থ হলে তাকেই সহ্য করতে হয় সেই মরণব্যাধির মরণ কামড়। এসব ক্ষেত্রে সমাজের নিকট থেকে যা আসে তা অনেকটা দয়া-দাক্ষিণ্য অথবা অনুকম্পারূপে আসে। সামাজিক দায়িত্বরূপে কখনো তা এ সমাজে স্বীকৃত হয়নি।

বাংলাদেশ সীমিত সম্পদের একটি ক্ষুদ্রায়তনের রাষ্ট্র। এই রাষ্ট্রে বসবাসকারী বিরাট জনসমষ্টি উৎপাদন ক্ষেত্রে সনাতন পদ্ধতির কবলে পড়ে সীমাহীন দারিদ্র্যে মানবেতর জীবনযাপনে বাধ্য হচ্ছে, যদিও সমাজের ক্ষুদ্রতর এক অংশের জন্যে বিলাসী জীবনের সব উপকরণের স্বল্পতা নেই। তাই উৎপাদন ব্যবস্থা, বণ্টন প্রক্রিয়া এবং সম্পদের সুষম বণ্টন সম্পর্কে বিদ্যমান রয়েছে সমাজব্যাপী তীব্র মতবিরোধ এবং সাংঘর্ষিক মনোভাব। ফলে এই ভিন্নমত এবং অসম্মতির তীর ঘেঁষে সংঘাত বাসা বেঁধেছে। এসব কারণেই রাজনৈতিক কার্যকলাপে হিংসাত্মক প্রবণতা সংশ্লিষ্ট হয়েছে। এও সত্য যে, সমাজ জীবনের মৌল সমস্যা সম্পর্কে এ সমাজে যতদিন ঐকমত্য সৃষ্টি না হচ্ছে ততদিন এদেশের রাজনীতি সংঘাতময় থাকতে বাধ্য। তাছাড়াও, এই দেশের রাজনীতির সাথে জড়িত রয়েছেন প্রচুর সংখ্যক সহায়-সম্বলহীন সর্বহারা ব্যক্তিবর্গ। বিভিন্ন কারণে রাজনীতির সাথে তাদের সংশ্লিষ্টতা বেড়েছে। রাজনৈতিক কার্যকলাপের মাধ্যমে তারা নিজেদের ভাগ্য পরিবর্তন করতে চান দ্রুতগতিতে। মিটিং-মিছিলে তারাই থাকেন সবার আগে। শ্লোগান উচ্চারণ এবং বিক্ষোভের সময় তারাই অগ্রপথিক। তাদের অনেকে রাজনীতিতে জড়িয়ে যান নিজেদের ইচ্ছায়, স্বতঃস্ফূর্তভাবে। কোনো কোনো সময় স্বার্থান্বেষী রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব তাদের বিভিন্ন প্রলোভনে রাজনীতির উত্তপ্ত অঙ্গনে টেনে আনেন। তাছাড়া, কর্মসংস্থানের অভাবে যেহেতু তাদের হাতে রয়েছে প্রচুর সময়, তাই তারাও উৎসাহিত হন রাজনীতির নামে। এসব কারণে এদেশে র‍্যাডিক্যাল (radical)

www.pathagar.com

রাজনীতির উর্বর ক্ষেত্র তৈরি হয়েছে। কোনো কোনো রাজনৈতিক দল নিজেদের দাবি জোরদার করার জন্যে অথবা নিজেদের শক্তি প্রদর্শনের লক্ষ্যে এসব বেকার অথবা আধা-বেকারদের ব্যবহার করে থাকে অর্থের বিনিময়ে। সমাজের এই স্তরের জনগণ রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপে যত বেশি জড়িয়ে পড়বেন, রাজনীতি ক্ষেত্রে শৃঙ্খলা ভঙ্গ তথা হিংসাত্মক কার্যকলাপের মাত্রা তত বৃদ্ধি পাবে।

রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান বাংলাদেশ সমাজের এই ধারাটি গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করেন এবং একজন সমাজবিজ্ঞানীর দৃষ্টি দিয়ে পর্যালোচনা করে এই দেশের রাজনীতিকে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। অন্য রাজনৈতিক নেতা যেমন রাজনীতিকে গ্রহণ করেন "ক্ষমতার রাজনীতি" (Power Politics) রূপে অথবা প্রভাব-বৈভবের মাধ্যম রূপে, জিয়াউর রহমান কিন্তু রাজনীতিকে গ্রহণ করেছিলেন "জাতীয় দায়িত্ব" (National Responsbility) হিসেবে। এক ধরনের "জাতীয় কর্তব্য" (National Duty) রূপে। জেডিবি মিলারের (JDB Miller) কথায়, "এক সুষম ক্রীড়ার মতো রাজনীতিতে রয়েছে নেতৃত্ব, প্রশংসা লাভ এবং আত্মনিবেদনের সুযোগ" ("Politics, like a game, gives scope for leadership, for applause and dedication."] জিয়াউর রহমান প্রচুর হাততালি অথবা প্রশংসার দিকে না তাকিয়ে রাজনীতিকে গ্রহণ করেন সঠিক নেতৃত্বদান এবং জাতীয় অগ্রগতি অর্জনের ক্ষেত্রে আত্মনিবেদনের সুযোগ হিসেবে, আত্মপ্রসাদ লাভ অথবা প্রশংসা কুড়োবার দীনতাকে ঝেড়ে ফেলে। তাঁর নিকট রাজনীতি ছিল জনকল্যাণের লক্ষ্যে এমন এক সুসংহত যৌথ কর্ম যা "নৈতিক বোধে উদ্বুদ্ধ কোনো মহৎ কর্ম সম্পাদনের এক প্রকৃষ্ট পন্থা।" ["Politics is a means of getting things done, often with a sense of moral urgency."]

তিনি ভালোভাবে জানতেন, সমাজ জীবনের যে সকল উপাদানের জন্যে রাজনীতি অপরিহার্য, বাংলাদেশ সমাজে তা অনেকটা নিত্য, চিরস্থায়ী। সীমিত সম্পদ, বিরাট জনসমষ্টির মৌলিক চাহিদার প্রেক্ষাপটে ভিন্নমত (Disagreement) এবং স্বার্থের সংঘাত (Conflict of Interest) শুধুমাত্র এই সমাজেই নয়, বিশ্বের সর্বত্রই কম-বেশি বিদ্যমান। তাই রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপও বিশ্বজনীন। জনসমাজ যতদিন থাকবে, সমাজে যতদিন অভাব-অনটন বিরাজ করবে এবং তা নিরসনের জন্যে যতদিন বহুমুখী নীতির প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হবে ততদিন রাজনীতিও ঐ সমাজকে ঘিরে টিকে থাকবে। রাজনীতিকে তাই শান্তিপূর্ণ, যুক্তিবাদী এবং প্রতিযোগিতামূলক করার জন্যে এবং রাজনীতি থেকে সন্ত্রাস ও সংঘাত দূর করার জন্যে সমাজের মৌল সমস্যা সম্পর্কে ঐকমত্যের এক ঘন আস্তরণ তৈরি করা অপরিহার্য। তিনি আরো অনুভব করেন, সমাজব্যাপী সেই ঐকমত্যের সৃষ্টি তখনই হবে যখন রাজনীতি সংকীর্ণ স্বার্থের আবর্ত থেকে জনজীবনের বৃহত্তর অঙ্গনে ছড়িয়ে পড়বে এবং গোষ্ঠিস্বার্থ অথবা শ্রেণীস্বার্থের দেয়াল ভেঙে ছড়িয়ে পড়বে জনস্বার্থের উদার প্রান্তরে। বিস্তৃত হবে কল্যাণমুখী বৃহত্তর মোহনায়।

www.pathagar.com

ক্ষমতার রাজনীতি কিন্তু জনগণের রাজনীতিতে আপনা আপনি রূপান্তরিত হবে না। আবদ্ধ জলাশয়ে কখনো আপনা আপনি স্রোতের সৃষ্টি হয় না। জীবনী শক্তির অসংখ্য ঝর্ণা ধারায় সিক্ত ও সমৃদ্ধ না হওয়া পর্যন্ত তা কখনো স্রোতস্বিনীতে রূপান্তরিত হবে না। এজন্যে চাই সার্থক নেতৃত্ব। চাই পরীক্ষিত ও কালোত্তীর্ণ উদ্যোগ। চাই জনকল্যাণে নিবেদিতপ্রাণ নেতার যাদুকরী স্পর্শ। এই প্রেক্ষাপটেই শুধু বাংলাদেশ রাজনীতির ক্ষেত্রে জিয়াউর রহমানের অবদানের সঠিক মূল্যায়ন সম্ভব। জিয়াউর রহমানের অনুধাবনে বিন্দুমাত্র অস্পষ্টতা ছিল না, যাদের কল্যাণের জন্যে রাজনীতি, সেই রাজনীতিতে জনগণের ব্যাপক এবং কার্যকর সংশ্লিষ্টতা ছাড়া সমাজব্যাপী ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হবে না। তিনি অনুধাবন করেন যে, এদেশের দুর্গত-বঞ্চিত-অসহায় ব্যক্তিবর্গ পারেন নিজেদের ভাগ্য পরিবর্তন করতে। শুধু তাদের কানে কানে বলতে হবে, আপনারা অসীম ক্ষমতার অধিকারী। একবার গা ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়ান। আত্মবিশ্বাসে বলীয়ান হয়ে নিজেদের সম্ভাবনাময় ভবিষ্যৎ রচনা করুন। শক্ত মাটিতে পা রেখে সোজা হয়ে দাঁড়ান। একবার সোজা হয়ে দাঁড়ালে বাধার বিন্ধ্যাচলও নড়ে উঠবে।

বাংলাদেশের মতো উপনিবেশ-উত্তর রাষ্ট্রে (Post-Colonial State) জনমনে এই সাহসী বার্তার ডালা সাজিয়ে জিয়াউর রহমানই সর্বপ্রথম জনগণের সামনে উপস্থিত হন। এদেশে তিনি এমন একজন জননেতা যার নিকট জনগণ পৌঁছার পূর্বেই তিনিই জনগণের সামনে উপস্থিত হয়েছেন। জনগণের নিকট তিনি উপস্থিত হয়েছেন কোনো উঁচু মঞ্চ থেকে কোনো নির্দেশ দেবার জন্যে নয়, বরং তাদেরই একজন হিসেবে, তাদের মাঝে গিয়ে অত্যন্ত অন্তরঙ্গ সুরে দুটো কথা বলতে, যে কথায় জনগণ উদ্দীপ্ত হয়ে অগ্রসর হবেন নিজেদের ভাগ্য পরিবর্তনের মহান উদ্যোগে। এই প্রেক্ষিতেই তিনি একবার সরবে উচ্চারণ করেছিলেন, "আমি তাদের (যারা ক্ষমতার রাজনীতি করেন) জন্যে রাজনীতি কঠিন করে তুলব" ["I will make politics difficult for them."] সত্যি তিনি তাদের জন্যে রাজনীতি কঠিন করে তুলেছিলেন। এক নদী রক্ত সাঁতরে যারা স্বাধীনতার স্বর্ণদ্বীপে পা রেখেছেন, তাদের জীবন, মান, সম্মান এবং ভবিষ্যৎ নিয়ে স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে যারা জনগণের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি করেছেন, যারা জনগণের দুর্দশা ও অসহায়ত্বের সুযোগ নিয়ে মাত্র ক'বছরের মধ্যে সম্পদের পাহাড় গড়েছেন, নিজেদের, আত্মীয়-স্বজনদের, দলীয় অনুগতদের হাতে জাতীয় সম্পদের সিন্দুকের চাবিটা তুলে দিয়ে বিজয়ীর অট্টহাসিতে বঞ্চিত জনগণের হাহাকার প্রকট করে তুলেছিলেন, তাদের দিকে দৃষ্টি রেখেই প্রেসিডেন্ট জিয়া এই সাবধানবাণী উচ্চারণ করেন।

তিনি কথা বলেই ক্ষান্ত হননি। নিজের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য পরিত্যাগ করে, আরামকে হারাম করে, নগর-জীবনের বিলাসী আবহাওয়া পরিত্যাগ করে, আরাম- কেদারায় বসে নেতৃত্বদানকারীদের দৃষ্টান্ত পরিহার করে দিনের পর দিন গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ছুটে

www.pathagar.com

গিয়ে হাটে-বাজারে, গ্রামে-গঞ্জে অসংখ্য মানুষের ভিড়ে, সাধারণের কাছাকাছি পৌঁছে তাদের আহ্বান জানালেন : "আসুন, এই দেশটা আমার, আপনার, সবার। এর উন্নয়নে সবাইকে ভূমিকা রাখতে হবে। সবাইকে দেশের জন্যে কাজ করতে হবে। সবাই মিলে অগ্রসর হলে বাধা যতই দুর্লঙ্ঘ্য হোক না কেন তা অতিক্রম করতে কোনো অসুবিধা হবে না "দেশ বাঁচলে আমরা বাঁচব, সবাইকে নিয়েই দেশ" এমন উদাত্ত আহ্বান যিনি করতে পারেন, তাও কোনো সুউচ্চ স্তম্ভ থেকে নয়, নয় কোনো আইভরি টাওয়ার (Ivory Tower) থেকে, সাধারণ মানুষের কাতার থেকে, দেশের অধিকাংশ জনগণ হাজার বছরের যে পুরনো গ্রামে বসবাস করে এসেছেন সেই গ্রাম থেকে, তা কি বৃথা যেতে পারে? যে সরকারি কর্মকর্তারা এতদিন লোকচক্ষুর অন্তরালে থেকে শুধু নির্দেশ দিয়েছেন, জিয়াউর রহমান তাদের সাথে করে মাইলের পর মাইল পায়ে হেঁটে, মাঠ-ঘাট পার হয়ে, সাধারণ মানুষের দোরগোড়ায় তাদের হাজির করে, জনসাধারণের সামনে তাদের জনগণের সেবক হিসেবে পরিচয় করিয়ে দিয়ে, জনসাধারণের মধ্যে যে কর্মচাঞ্চল্য সৃষ্টি করেন, বিশেষ করে দেশের তরুণ-তরুণীদের এই বিশাল কর্মোৎসবে শামিল করে যে নতুন গতিপথের দিক-নির্দেশ দান করেন বাংলাদেশে তা অভিনব। এই রাজনীতি জনগণের রাজনীতি। এই রাজনীতি মুক্ত, অবাধ রাজনীতি। এই রাজনীতি অন্ধকারের প্রাসাদ রাজনীতি থেকে স্বতন্ত্র। স্বতন্ত্র ক্ষমতার রাজনীতি থেকে। বাংলার দরিদ্র কৃষকদের ঋণের অভিশাপ থেকে মুক্ত করার লক্ষ্যে ক'দশক পূর্বে বাংলার আর এক কৃতী সন্তান আবুল কাশেম ফজলুল হক যে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন, জিয়ার এই নতুন রাজনীতি তারই এক নতুন সংস্করণ। মজলুম জননেতা মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী শোষিতদের স্বার্থরক্ষার জন্য স্বার্থান্বেষীদের দুর্গ প্রাচীরে দাঁড়িয়ে যেভাবে চিৎকার করে বলতেন "খামোশ", জিয়ার এই রাজনীতি তারই এক সংস্করণ। এদিক থেকে বাংলাদেশের রাজনীতি ক্ষেত্রে জিয়া এক অগ্রপথিক। এক পথ প্রদর্শক। একজন পথিকৃত। বাংলাদেশ রাজনীতির পর্যালোচকরা এই দিকটার প্রতি এখন পর্যন্ত তেমন দৃষ্টি দেননি, অথচ প্রেসিডেন্ট জিয়ার মৌলিক অবদানকে সঠিকভাবে অনুধাবনে এর কোনো বিকল্প নেই।

প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের এই নতুন রাজনীতি বিভিন্ন দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ। **এক.** কোনো সমাজে রাজনৈতিক কার্যকলাপ কেন্দ্র থেকে প্রান্ত পর্যন্ত সম্প্রসারিত না হলে তার জাতীয় চরিত্র প্রস্ফুটিত হয় না। জিয়াউর রহমান বাংলাদেশের রাজনীতিকে গ্রাম পর্যন্ত বিস্তৃত করে, গ্রামীণ সমস্যার সাথে রাজনীতিকে সম্পৃক্ত করে, বিশেষ করে গ্রাম পর্যায়ে নতুন নতুন প্রতিষ্ঠান রচনা করে এই রাজনীতির এক জাতীয় ভাবমূর্তি সৃষ্টি করেন। **দুই.** বাংলাদেশের জনসমষ্টির অধিকাংশ যে গ্রামে বসবাস করেন, যে গ্রাম বাংলাদেশের হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন রূপে সমগ্র রাষ্ট্রদেহকে প্রাণবন্ত করে রেখেছে, জাতীয় রাজনীতিতে সেই গ্রামের অভিষেক গ্রামীণ জনসাধারণের ক্ষমতায়নের পথ সুপ্রশস্ত করেছে। **তিন.** গ্রামীণ জনসাধারণের ক্ষমতায়নের পথ ঘেঁষেই রাজনীতি একদিকে

www.pathagar.com

যেমন পরিপূর্ণতা অর্জন করতে পারে, অন্যদিকে তেমনি তার সুষম বৃদ্ধিও সম্ভব হবে। শুধুমাত্র এই পর্যায়ে সমাজের রাজনীতি-সচেতন ব্যক্তিবর্গ এবং গোষ্ঠীর মধ্যে সমাজ জীবনের মৌলিক বিষয়ে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হতে পারে এবং শুধু তখনই সমাজের রাজনৈতিক কার্যকলাপ শান্তিপূর্ণ, যুক্তিবাদী এবং কল্যাণমুখী হতে পারে। এই অনুধাবনই প্রেসিডেন্ট জিয়াকে বাংলাদেশের রাজনীতির নতুন গতিধারা সুনির্দিষ্ট করতে অনুপ্রেরণা যোগায়।

দুই : জনকল্যাণের রাজনীতি

প্রত্যেকটি উন্নয়নশীল দেশে এবং বিশেষভাবে উপনিবেশ-উত্তর (Post-Colonial State) রাষ্ট্রে জনগণ কোনো দিন রাষ্ট্র বা সরকারের সাথে একাত্মতা অনুভব করেনি। রাজনৈতিক দলগুলোও জনগণের মধ্যে এই শিক্ষাদানে কোনো দিন এগিয়ে আসেনি। বাংলাদেশে এই সমস্যা বরাবরই অত্যন্ত প্রকট। এর অনেক কারণ রয়েছে। এসব সমাজে জনগণ বরাবরই বিশেষ এলাকা অথবা বিশেষ স্থানের অথবা বিশেষ সম্প্রদায়ের সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে বাস করেছেন অথবা বিশেষ স্বার্থের অভ্যন্তরে অত্যন্ত বিচ্ছিন্নভাবে জীবনধারা নির্বাহ করেছেন। অতীতে শাসনকর্তা ছিলেন রাজা-বাদশাহ। কোনো দিনই তারা জনগণের স্বার্থে প্রত্যক্ষ সংযোগ স্থাপন করেননি। গ্রামাঞ্চলের প্রধান বা মাতব্বরদের মাধ্যমে তারা কর আদায় করেছেন। তাদের মাধ্যমেই রাজকীয় ফরমান জারি করেছেন। মাঝে মাঝে নিজেদের ঐশ্বর্য ও ক্ষমতার জৌলুশ দেখিয়েছেন জনগণের নিকট থেকে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখেই। প্রজাদের সুখ-দুঃখের সাথে নিজেদের কোনো দিন জড়াতে চাননি। বরং নিজেদের আধিপত্যকে স্থায়ী করার লক্ষ্যে জনমনে এক ধরনের ভীতি ও ত্রাসের সৃষ্টি করে সরকারি ব্যবস্থাপনা যে অত্যন্ত দূরের এবং ভীতির তা প্রজাদের ভাবতে বাধ্য করেছেন বরাবর।

ঔপনিবেশিক আমলে বিদেশী শাসকরা জনগণের কাছাকাছি এসে অথবা তাদের সাথে সংশ্লিষ্ট হয়ে সরকার বা রাষ্ট্র যে তাদের জন্য কল্যাণকর এক সংস্থা তা জনগণের সামনে কখনও তুলে ধরেননি। জমিদার শ্রেণীর মতো মধ্যবর্তী এক শ্রেণী সৃষ্টি করে তাদেরই মাধ্যমে জনগণের ওপর নিজেদের প্রভুত্ব বিস্তার করেছেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এলিট প্রশাসক গোষ্ঠীর মাধ্যমে জনগণকে নিয়ন্ত্রণ করেছেন। সুতরাং অতীতে জনগণ রাষ্ট্র অথবা সরকারের সাথে কোনো সময়ে একাত্মতা অনুভব করেননি। ফলে জনগণ বরাবরই বিচ্ছিন্ন থেকে শ্রেণী অথবা বর্ণের মতো স্তরভিত্তিতে (vertical) অথবা ধর্মীয়, ভাষাগত এবং কৃষ্টিগত আনুভূমিক (horizontal) বিভাজনে বিন্যস্ত হয়ে ক্ষুদ্রতর গোষ্ঠী অথবা গ্রুপের প্রতি অনুগত থেকেছেন। সমাজ জীবনের বৃহত্তর একক যে রাষ্ট্র তার প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে অথবা রাষ্ট্রের ব্যবস্থাপক সরকারের সাথে একাত্মতা প্রকাশের সুযোগ কোনো সময়ে লাভ করেননি। কোনো দিনই শাসনব্যবস্থাকে আপন করে, নিজস্ব সম্পদ এবং নিজস্ব সত্তার প্রতিফলন হিসেবে গ্রহণ করতে পারেননি। সরকার এবং শাসনব্যবস্থা জনগণের নিকট সব সময়েই রয়ে গেছে এক বিজাতীয়

www.pathagar.com

সত্তা। সরকার বরাবরই এই সমাজে রয়ে গেছেন নিয়ন্ত্রণকারী ও করভার আরোপ করার কর্তৃপক্ষরূপে। রাষ্ট্রীয় সম্পদ যে তাদের নিজস্ব সম্পদ এবং রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব যে তাদের নিজস্ব কর্তৃত্ব এই চেতনায় কোনো দিন তারা উদ্বুদ্ধ হয়নি। ফলে সব সময় জনগণ রাষ্ট্র ও সরকার সম্পর্কে উদাসীন থেকেছে এবং সুযোগ পেলেই সরকারি সম্পত্তি বিনষ্ট করতে দ্বিধাবোধ করেনি। তাই দেখা যায়, কোনো হরতাল অথবা ধর্মঘট হলে অথবা কোনো আন্দোলন দানা বাঁধলে এখনো সর্বপ্রথম সরকারের গাড়ি ও সম্পদ এবং সরকারি কর্মকর্তারাই জনগণের আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু হয়ে উঠেছে। ব্যক্তিগত পর্যায়ে যে কথা কোনো বন্ধুকে বলা যায়, তা এই সমাজে কোনো সরকারি কর্মকর্তার নিকট প্রকাশ করা যায় না। তাই এই সমাজে রাজনীতি হয়ে উঠেছে সংঘাতময়, ধ্বংসাত্মক এবং দ্বন্দ্ব-সংকুল।

ক্ষমতাসীন হয়ে জিয়াউর রহমান এই সূত্র অনুধাবন করেন এবং তার রাজনৈতিক প্রজ্ঞা প্রয়োগ করে এই রাষ্ট্র এবং এর সরকার যে জনগণের, জনগণই যে এর প্রধানতম নিয়ামক এবং জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ ব্যতীত শাসনব্যবস্থা যে সচল ও কর্মক্ষম হতে পারে না তা বাস্তবায়নে সবিশেষ মনোযোগী হয়ে উঠেন। কোনো চক্রান্তের মাধ্যমে তিনি ক্ষমতাসীন হননি। কোনো ষড়যন্ত্র অথবা সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে তিনি ক্ষমতা দখল করেননি। ১৯৭৫ সালের আগস্ট অভ্যুত্থান ছিল আওয়ামী লীগ সরকারের বিরুদ্ধে আওয়ামী লীগের একাংশের বিদ্রোহ। শেখ মুজিবের সেই নির্মম হত্যাকাণ্ড ছিল আওয়ামী লীগের একাংশের নেতৃবৃন্দ ও কর্মীর অসৎ কর্মকাণ্ডের ফল। তাই দেখা যায়, শেখ মুজিবুর রহমানের সরকার উৎখাত করে খন্দকার মুশতাক আহমদের নেতৃত্বে যে সরকার গঠিত হয় সেই মন্ত্রিপরিষদে ছিল মুজিব সরকারের অধিকাংশ মন্ত্রী। শেখ মুজিব পাকিস্তানের জিন্দান খানা থেকে ফিরে এসে ১৯৭২ সালের সাময়িক সংবিধান আদেশের (Provisional Constitution Order 1972) বলে যখন প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন তখন রাষ্ট্রপতি হয়েছিলেন বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী। খন্দকার মুশতাক আহমদের মন্ত্রিপরিষদে তিনি ছিলেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী। স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়ক বঙ্গবীর এম এ জি ওসমানী ছিলেন খন্দকার মুশতাকের প্রতিরক্ষা উপদেষ্টা। খন্দকার মুশতাকের মন্ত্রিপরিষদে ছিলেন মুজিব মন্ত্রিপরিষদের ১৯ জন মন্ত্রীর মধ্যে ১১ জন এবং ৯ জন প্রতিমন্ত্রীর মধ্যে ৮ জনই। শুধু তাই নয়, মুশতাক সরকারের স্বীকৃতি আদায় করতে প্রবীণ আওয়ামী লীগ নেতা মহিউদ্দিন আহমেদ মস্কো পর্যন্ত ছুটে যান কম্যুনিস্ট বিশ্বে মুশতাক সরকারের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করতে। আর একজন খ্যাতিমান আওয়ামী লীগ নেতা আবদুল মালেক উকিল ইউরোপে মুশতাক সরকারের নীতি ও কার্যক্রমের স্বীকৃতি আদায় করতে গিয়ে লন্ডনের হিথ্রো বিমানবন্দরে যা বলেছিলেন তাও প্রমাণ করে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের পরিবর্তন ছিল আওয়ামী লীগের দলীয় কোন্দলের ফলশ্রুতি। তিনি শেখ মুজিবের মৃত্যু সম্পর্কে বলেছিলেন, ফেরাউনের মৃত্যুতে দেশ স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেছে।

www.pathagar.com

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে ১৯৭৫ সালের ৩ নভেম্বর যে সামরিক অভ্যুত্থান ঘটান খালেদ মোশাররফ, সেই অভ্যুত্থানকেও অনেকে আওয়ামীপন্থী অভ্যুত্থান বলে চিহ্নিত করার প্রয়াস পেয়েছেন। খালেদ মোশাররফই জাতীয় সংসদ বাতিল করেন। বাতিল করেন মন্ত্রিপরিষদ। নতুনভাবে দেশে সামরিক শাসন জারি করেন। এই প্রেক্ষাপটেই খন্দকার মুশতাক পদত্যাগ করেন এবং পদত্যাগের পূর্বে তার উত্তরাধিকার নির্ধারণী অধ্যাদেশ জারি করে সেই অধ্যাদেশ বলে প্রধান বিচারপতি মোহাম্মদ সায়েমকে রাষ্ট্রপতি নিয়োগ করেন। খালেদ মোশাররফের অভ্যুত্থান সংঘটিত হলে সামরিক বাহিনী প্রধান জিয়াউর রহমানকে গৃহবন্দী করা হয়। ৩ নভেম্বরের প্রতিক্রিয়া হিসেবে ৭ নভেম্বর সিপাহি-জনতার বিপ্লব সংঘটিত হলে জিয়া মুক্ত হন এবং সিপাহি-জনতার চাপেই তিনি একজন উপ-সামরিক আইন প্রশাসক হিসেবে দায়িত্ব পালনে রাজি হন শুধুমাত্র অভ্যুত্থান-প্রতি অভ্যুত্থানে ক্ষতবিক্ষত বাংলাদেশে সৃষ্ট ক্ষমতা-শূন্যতা পূরণের লক্ষ্যে। জেলখানায় যে চারজন জাতীয় নেতার হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয় তাও খালেদ মোশাররফের দায়িত্বের অংশবিশেষ। তখন জিয়াউর রহমান ছিলেন গৃহবন্দী অবস্থায়। খালেদ মোশাররফের কর্তৃত্ব সুদৃঢ় হলে অথবা তখন জিয়াউর রহমানের উপর দায়িত্ব বর্তালে ওই চার নেতাকে ওইভাবে প্রাণ দিতে হত না।

দলীয় কোন্দল এবং ক্ষমতার রাজনীতির এসব বিকৃতি জিয়াউর রহমান স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেন এবং শাসনব্যবস্থার সাথে জনগণকে গভীরভাবে সংশ্লিষ্ট করার সংকল্প গ্রহণ করেন। তার এই সংকল্পের মূলে ছিল মুক্তিযুদ্ধে তার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা। মুক্তিযুদ্ধকালে তিনি প্রতিনিয়ত অনুভব করেছেন কীভাবে জাতীয় সংকটকালে জনগণ দল ও মতের ঊর্ধ্বে উঠে, ধর্মের ভিন্নতা ভুলে গিয়ে মুক্তিযুদ্ধে প্রত্যক্ষভাবে শামিল হয়েছেন এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে সৈনিকদের ছাপিয়ে, মৃত্যুভয়ে ভীত না হয়ে, মুক্তিযুদ্ধের অগ্রপথিক হিসেবে নিজেদের ভূমিকা সুনির্দিষ্ট করেছেন। মুক্তিযুদ্ধের সমাপ্তি ঘটলে স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশে কিন্তু জনগণ তাদের এই ভূমিকার স্বীকৃতি পাননি। তারা অত্যন্ত অসহায় দৃষ্টিতে দেখেছেন কীভাবে এক সংকীর্ণ স্বার্থপর গোষ্ঠী দেশের সম্পদকে কুক্ষিগত করে চলেছে, কীভাবে ক্ষমতাসীনদের সীমাহীন ঔদাসীন্যে সমাজজীবন দুর্নীতিপরায়ণদের হাতে ক্ষতবিক্ষত হয়েছে, কীভাবে দলীয় চেতনার সর্বগ্রাসী কবলে পড়ে ক্ষমতাসীন কর্তাব্যক্তিরা 'ওরা আমাদেরই লোক' এই ভরসা দিয়ে কিছু সংখ্যককে পীড়নকারীর ভূমিকায় প্রতিষ্ঠিত করেছেন। দেশে আইন-শৃঙ্খলার অস্বাভাবিক অবনতি ঘটে। অর্থনীতি ক্রমে ক্রমে ভারত-নির্ভর হয়ে পড়ে। চুরি-ডাকাতি, ছিনতাই-রাহাজানি, হত্যাকাণ্ড ও ধর্ষণের অভিশাপে সমগ্র সমাজ অভিশপ্ত হয়ে ওঠে। চারদিক থেকে দাবি উত্থিত হয়–'আমরা অন্য কিছুই চাই না, চাই শুধু স্বাভাবিক মৃত্যুর গ্যারন্টি'। দুর্ভিক্ষের কালো ছায়ায় দেশ অন্ধকার হয়। বেকারত্ব, আধা-বেকারত্বের করাল গ্রাসে পড়ে দেশের তারুণ্য নিঃশেষ হতে থাকে। অন্যদিকে, ক্ষমতাসীনদের পারস্পরিক দ্বন্দ্বে সামাজিক স্থিতিশীলতাও বিনষ্ট হতে থাকে। এই প্রেক্ষাপটে জিয়ার রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের পর্যালোচনা করা প্রয়োজন।

www.pathagar.com

একজন রাষ্ট্রনায়কের মতো সার্থক কোনো পদক্ষেপ গ্রহণের পূর্বে জনগণ তার সম্পর্কে কী ভাবেন, তার ওপর জনগণের আস্থা আছে কি না, তার নীতি এবং কার্যক্রম সম্পর্কে জনগণের প্রতিক্রিয়া কী–এসব বিষয়ে জনগণের সুস্পষ্ট অভিমত জানার জন্যে তিনি ১৯৭৭ সালের ৩০ মে এক গণভোটের (Referendum) আয়োজন করেন। যেহেতু তিনি তখনও জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হননি তাই জনগণের ব্যাপক সমর্থন লাভ না করে এবং জনগণকে তার শাসনব্যবস্থায় প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট না করে তিনি অগ্রসর হতে চাননি। এই গণভোটে তিনি তার নীতি ও কর্মসূচি সমর্থন করেন কি না তা জানতে চেয়েছিলেন। প্রশ্নটি কোনো তত্ত্বের আড়ালে আলো-আঁধারি পরিবেশে অস্পষ্ট না করে সোজাসুজি তুলে ধরা হয় : "রাষ্ট্রপতি মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান এবং তাঁর নীতি ও কর্মসূচির প্রতি আপনার আস্থা আছে কি?" [Do you have confidence in President Major General Ziaur Rahman and in the Policies and programmes enunciated by him?] এই প্রশ্নটি তুলে ধরা হয় ৩ কোটি ৩২ লাখ ভোটদাতার নিকট। এই গণভোটে শতকরা ৮৮.৫ ভোটদাতা ভোট দিয়েছিলেন এবং প্রদত্ত ভোটের শতকরা ৯৮.০০ ভাগ তিনি লাভ করে রাষ্ট্রপতি হিসেবে বাংলাদেশের বন্ধুর রাজনৈতিক পথে পথপরিক্রমা শুরু করেন।

এ দেশের জনগণ অকৃতজ্ঞ নন। নন তারা হঠকারিতায় অভ্যস্ত। যারা তাদের জন্য কাজ করেছেন এবং তাদের সুখ-সুবিধা এবং আশা-আকাঙ্ক্ষা ধারণ করেছেন তারা তাদের কোনো দিন ভোলেননি। তাদের ভুলও বোঝেননি। ষাটের দশকে শেখ মুজিবের গণমুখী কার্যকলাপের জন্য জনগণ তার প্রতি এবং তার কর্মসূচির প্রতি সমর্থন জানিয়ে তাকে ১৯৭০ সালের নির্বাচনে বিজয়ী করে এই অঞ্চলের সবচেয়ে জনপ্রিয় নেতার আসনে আসীন করেন। কিন্তু স্বাধীনতার পরে মাত্র চার বছরের মধ্যে ওই জনপ্রিয় নেতার ক্ষমতাপ্রীতি, দলপ্রীতি এবং অন্যায়কারীদের প্রতি তার দুর্বলতা, বিশেষ করে জনকল্যাণে তার অনীহার জন্য সেই জনগণই তার নির্মম হত্যাকাণ্ডের পরে এক ফোঁটা চোখের পানি ফেলেনি। জিয়াউর রহমান বাংলাদেশ রাজনীতির এই গতিপ্রকৃতি অত্যন্ত আগ্রহের সাথে লক্ষ্য করে নির্ধারণ করেন তার পথ। তাই তিনি এই দীর্ঘ পথে কোনো দিন জনসমর্থন হারাননি। তাই দেখা যায়, যেদিন তিনি অভ্যুত্থান ও প্রতি-অভ্যুত্থানের দাপটে ক্লান্ত-শ্রান্ত বাংলাদেশ রাজনীতির ক্ষেত্রে নতুন এক অধ্যায়ের সূচনা করেন ১৯৭৫ সালের ৭ নভেম্বর, তখন দেশময় সূচনা হয় যেন এক মহোৎসবের। আবার যেদিন তিনি নির্মম ঘাতকের আঘাতে আপন জনের নিকট থেকে বিদায় গ্রহণ করেন, তখনও দেখা গিয়েছিল এক অভূতপূর্ব দৃশ্য। লাখ লাখ আবাল-বৃদ্ধ-বণিতার অশ্রুসজল আহাজারি থমকে দিয়েছিল সমগ্র রাজধানীকে। জীবনের স্পন্দন যেন থেমে গিয়েছিল কয়েক মুহূর্তের জন্য সমগ্র জনপদে। এর কারণ ছিল জিয়ার সৃজনশীল রাজনীতির বৈশিষ্ট্যপূর্ণ চালচিত্র। জনগণের সাথে তার অন্তরঙ্গ এবং নিরাভরণ যোগসূত্র। জনকল্যাণের প্রতি তার আপ্রাণ প্রয়াস এবং জনগণই যে রাষ্ট্রের ভিত্তি এই বিশ্বাসে সিক্ত জিয়ার মন-মানসিকতা।

www.pathagar.com

তিন : উৎপাদনমুখী রাজনীতি

অধিকাংশ উন্নয়নশীল দেশে রাজনীতি যে অস্থিতিশীল তার অন্যতম প্রধান কারণ হল প্রায় সকল উন্নয়নমূলক কর্মসূচি সরকার কর্তৃক সূচিত এবং এই সকল কর্মকাণ্ডে জনগণের সম্পৃক্ততা তেমন গভীর নয়। এসব দেশে বেসরকারি উদ্যোগ পল্লবিত হবার তেমন সুযোগ লাভ করেনি। অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অন্যান্য ক্ষেত্রে সরকারি উদ্যোগেই গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচি গৃহীত হয়েছে। উন্নত সমাজে অবশ্য দুটি ধারাই সুস্পষ্ট। তাই ওইসব দেশে সরকারি এবং বেসরকারি কাজের সমন্বয় সাধনই মুখ্য। অনুন্নত দেশে প্রায় সর্বত্রই জনগণ সরকারি উদ্যোগের ওপর নির্ভরশীল, যদিও এসব উদ্যোগে জনকল্যাণমূলক কাজ তেমনভাবে প্রতিফলিত হয়ে ওঠে না। এসব কারণেই উন্নয়নশীল দেশে শাসনযন্ত্র এত গুরুত্বপূর্ণ ও মূল্যবান। এই মূল্যবান যন্ত্রটির ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার জন্যই উন্নয়নশীল দেশগুলোতে রাজনীতি এত আবেগজড়িত এবং আকর্ষণীয়। রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ এবং প্রশাসনিক এলিটরা শাসনযন্ত্রের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠায় উঠে পড়ে লাগেন। আর একবার তা আয়ত্তে এলে তা যতক্ষণ পর্যন্ত নিয়ন্ত্রণে রাখা যায় ততক্ষণ পর্যন্ত আয়ত্তে রাখার চেষ্টা করেন। প্রয়োজনবোধে এজন্য হিংসাত্মক পথও বেছে নেয়া হয়। এও দেখা গেছে, উন্নয়নশীল দেশগুলোতে হিংসাত্মক কার্যকলাপের অধিকাংশই সংঘটিত হয় সমাজের প্রভাবশালী এলিট গোষ্ঠীর প্ররোচনায়। নিজেদের স্বার্থে তারাই জনগণকে ব্যবহার করে থাকে।

ক্ষমতাসীন হবার পরে জিয়াউর রহমান বাংলাদেশ সমাজের এই প্রবণতা গভীর আগ্রহের সাথে লক্ষ্য করেন একজন শিল্পীর মতো। এই প্রবণতা সমাজজীবন থেকে দূর করার জন্য কৃতসংকল্প হয়ে ওঠেন। তিনি একজন দূরদৃষ্টিসম্পন্ন রাষ্ট্রনায়কের মতো অনুধাবন করেন যে, যে সামাজিক অর্জনে জনগণের কোনো অংশগ্রহণ নেই, তা জনগণের নিজস্ব হতে পারে না। তা সংরক্ষণে কোনো দিন জনগণ আগ্রহী হয়ে ওঠেন না। এই সত্য অনুধাবন করেই জিয়াউর রহমান গ্রামীণ পূর্তকর্মে, বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে কৃষির উন্নতি সাধনের নিমিত্তে যে খাল কাটা বিপ্লবের সূচনা করেন তার প্রধানতম শর্ত ছিল গ্রামীণ জনসাধারণের স্বেচ্ছাশ্রম। কাউকে বাধ্যতামূলক শ্রমে টেনে না এনে অধিকাংশ ক্ষেত্রে নিজেই কোদাল হাতে মাটি কেটে দৃষ্টান্ত স্থাপন করে জনসাধারণের সর্বাধিক উপযোগ স্মরণ রেখে প্রকল্প নির্ধারণ করে, প্রত্যেকটি প্রকল্পে জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে, উন্নয়নমূলক কর্মে জনগণের স্বেচ্ছাশ্রমের যে নতুন অধ্যায় তিনি শুরু করেন তার কোনো তুলনা নেই। বিভিন্ন পর্যায়ে জনসমর্থনের মাধ্যমে এর পুরস্কারও তিনি লাভ করেন। পূর্বেই বলেছি, রাজনীতিকে তিনি ক্ষমতার রাজনীতির অন্ধ গলি থেকে সরিয়ে নিয়ে কর্মোজ্জ্বল রাজপথে স্থাপন করেছেন। আদেশ-নির্দেশের উচ্চতর শিখর থেকে নামিয়ে আনলেন সামাজিক উপত্যকায় মাটি ও মানুষের কাছাকাছি। নৈর্ব্যক্তিক সরকারি কার্যক্রমকে নিজেদের লোনা স্বেদযুক্ত করে নিজেদের কার্যকর উদ্যোগ ও পরিশ্রম মিশিয়ে জনগণের নিজস্ব কার্যক্রমে রূপান্তরিত করেন। ক্ষমতার অন্তঃসারশূন্য রাজনীতিকে উৎপাদনমুখী রাজনীতির স্বরূপে প্রকাশিত হতে

www.pathagar.com

সহায়তা করেছেন। উৎপাদনমুখী না হলে রাজনীতি যে বিভাজনের কৌশল মাত্র, জনগণের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ ব্যতীত শুধু যে তা প্রতারণার কলা মাত্র এবং বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে বিভাজন প্রতারণার কলা-কৌশল যে একেবারে অগ্রহণযোগ্য তা জিয়াউর রহমান প্রমাণ করলেন এবং দেশব্যাপী উৎপাদনমুখী রাজনীতির নতুন অধ্যায় রচনা করলেন।

উন্নয়ন সাহিত্যের (Development literature) সর্বত্রই বলা হয়েছে, যাদের জন্য উন্নয়ন তাদেরকেই সর্বপ্রথম উন্নত করতে হবে। রাজনীতির বিভিন্ন আলেখ্যে তেমনিভাবে উচ্চারিত হয়েছে যে, যাদেরকে ঘিরে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড তাদেরকেই সর্বাগ্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় সংশ্লিষ্ট করতে হবে। বিভিন্ন জনপদের উন্নয়ন প্রক্রিয়া বিশ্লেষণ করে এবং গণতান্ত্রিক সমাজের গতিধারা পর্যবেক্ষণ করে জিয়াউর রহমান বাংলাদেশের আর্থ-রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানে মনোনিবেশ করেন। জিয়ার নেতৃত্বের সুষ্ঠু পরিচয় এখানটায়। কৃষিক্ষেত্রে উন্নয়নের লক্ষ্যে খাল কাটা বিপ্লবের মাধ্যমে তিনি যেমন স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে ব্যাপকভাবে জনগণকে সম্পৃক্ত করেন উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে, তেমনি মানব সম্পদ উন্নয়নে, বিশেষ করে বয়স্কদের মাঝে সাক্ষরতা বৃদ্ধির জন্যে, দেশের শিক্ষিত তরুণ-তরুণীকে যেভাবে সাক্ষরতা কর্মসূচির সাথে সম্পৃক্ত করেন এবং প্রতিবছর এক কোটি জনসমষ্টিকে সাক্ষর করা ও দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকালে চার কোটি ব্যক্তিকে শিক্ষার আলো দান করার যে কর্মসূচি তিনি প্রণয়ন করেন তাও ছিল রাষ্ট্রনায়কোচিত উদ্যোগ। নিয়মিত ও অনিয়মিত প্রক্রিয়ায় সাধারণ শিক্ষার ব্যাপক বিস্তার, শিক্ষাখাতে ব্যয় বৃদ্ধি করে জাতীয় শক্তিকে এই উর্বর খাতে প্রবাহিত করার পরিকল্পনা তিনিই সর্বপ্রথম গ্রহণ করেন।

১৯৯০ সালে ইউনেস্কো (UNESCO) রিপোর্টে যে তথ্য প্রকাশিত হয় তা সত্যিই ভয়াবহ। বিশ্বের ৪.৫ ভাগ নিরক্ষর বাংলাদেশের। এই সংখ্যা ভারত, চীন এবং পাকিস্তানের নিরক্ষরদের পরেই। ১৯৯১ সালে বাংলাদেশে নিরক্ষরদের সংখ্যা ছিল প্রায় সাড়ে তিন কোটি। ১৯৯৯ সাল নাগাদ এই সংখ্যা হয়েছে ৬ কোটির মতো। এই সংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে, যদিও সাক্ষরতার হার বাড়ছে ধীরে ধীরে। যদি জিয়াউর রহমানের কর্মসূচি অব্যাহত থাকত, যদি জাতীয় সম্পদের বড় একটা অংশ শিক্ষাক্ষেত্রে নিয়োজিত হত এবং জাতির শিক্ষিত জনসমষ্টির সৃজনশীল অংশ জরুরিভিত্তিতে শিক্ষার প্রসারে নিয়োজিত থাকত তাহলে নিরক্ষরতার অন্ধকার আজকে যত গভীর হয়েছে তা হত না। বাংলাদেশের সার্বিক চেহারা অনেকটা পাল্টে যেতে পারত।

আইনের প্রতি শ্রদ্ধা ও আস্থা উভয়ই আমাদের দেশে অত্যন্ত শিথিল। এর কারণও রয়েছে। **এক.** এ দেশে আইনে জনমতের প্রতিফলন কদাচিৎ ঘটে। **দুই.** এই সমাজে আইন প্রয়োগকারীদের কোনো দিনই শ্রদ্ধার চোখে দেখা হয় না। তাছাড়া, আইনের প্রতি জনগণের আস্থাকে সুদৃঢ় করার জন্যে কোনো সার্থক প্রচেষ্টা এদেশে গৃহীত হয়নি, বরং ক্ষমতাসীনরা আইন প্রয়োগকারীদের মাধ্যমে অনেক সময় আইনের গলা টিপে মেরেছেন। ফলে আইনের প্রতি আস্থাহীনতা এবং আইন প্রয়োগকারীদের প্রতি অশ্রদ্ধা, এই দুই মিলে সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করেছে এবং রাজনীতিকে হিংসাত্মক করেছে।

www.pathagar.com

বাংলাদেশে এই সমস্যা নতুন নয়, কিন্তু এর সমাধানের জন্যে কোনো রাজনৈতিক নেতা কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করেননি। জিয়াউর রহমানই সর্বপ্রথম এই সমস্যাকে সহনীয় পর্যায়ে আনার চেষ্টা গ্রহণ করেন। তিনি আইন প্রয়োগকারী বাহিনীকে নতুনভাবে সংগঠিত করেন। বহুসংখ্যক পুলিশ কর্মকর্তাকে নতুনভাবে প্রশিক্ষণ দান করে এবং আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীতে বহুসংখ্যক নতুন মুখ সংযোজন করে এই নিস্তেজ বাহিনীকে কর্মক্ষম করেন। জিয়াউর রহমানের এই সকল পদক্ষেপের কোনো সময়ে যথার্থ মূল্যায়ন হয়নি। একদিকে তিনি যেমন আইন প্রয়োগকারীদের মধ্যে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে এনে তাদের দায়িত্বশীল করেন, অন্যদিকে জনগণের মধ্যেও আইনের প্রতি আস্থা ফিরিয়ে আনতে বদ্ধপরিকর হন। গ্রামাঞ্চলে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্যে সর্বপ্রথম তিনিই গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী সংগঠন করেন এবং গ্রাম সরকারের নেতৃবৃন্দের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে দায়িত্ব পালনের নির্দেশ দিয়েছিলেন। জাতীয় পর্যায়ে সুষ্ঠু পরিচালনা নিশ্চিত করতে তিনি যখন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (Bangladesh National Party- B.N.P) গঠন করেন, এবং জাতীয় অগ্রগতি নিশ্চিত করতে ১৯ দফা কর্মসূচি গ্রহণ করেন, তখনও তার লক্ষ্য ছিল দেশের সাধারণ মানুষের কল্যাণ সাধন। ১৯ দফা কর্মসূচি পর্যালোচনা করলে এটি সুস্পষ্ট হয় যে, তার ১৫টি দফাই হল জনসাধারণের অর্থনৈতিক উন্নতি সংক্রান্ত। এই প্রক্রিয়ায় জনসাধারণ নিজেদের স্বার্থ সম্পর্কে সচেতন হয়েছেন। সচেতন হয়েছেন ব্যক্তি স্বার্থের ঊর্ধ্বে যে সমষ্টিগত স্বার্থ এবং সবকিছুর উপরে যে রাষ্ট্রীয় স্বার্থ সে সম্পর্কেও। ব্যক্তি থেকে দল বড় এবং দল থেকে জাতি বড়–এই শিক্ষা এই জাতিকে জিয়াউর রহমানই দিয়েছেন।

চার : সমন্বয় ও ভারসাম্যের রাজনীতি

যেকোনো রাজনৈতিক ব্যবস্থায় ক্রমবর্ধমান অংশগ্রহণের দাবি সম্পর্কে অনিশ্চয়তা বিরাজ করলে অথবা বিদ্যমান রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলো ক্রমবর্ধনমান অংশগ্রহণকারীদের দাবি মেটাতে অক্ষম হলে অংশগ্রহণের সঙ্কট (Participation Crisis) দেখা দেয়। সমাজের বিভিন্ন স্বার্থগোষ্ঠী নিজেদের প্রতিনিধিত্ব সম্পর্কে নিশ্চিত হলে এবং সমাজে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রবর্তিত হলে এই সঙ্কটের তীব্রতা হ্রাস পায় (Myron Weiner, 1972 : 159-204)। বাংলাদেশে গত শতকের সপ্তম দশকের মাঝামাঝি সময়ে রাজনৈতিক ব্যবস্থার এই করুণ চিত্র একজন সমাজবিজ্ঞানীর গভীর অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে অবলোকন করে জিয়াউর রহমান জাতীয় একাত্মতার সঙ্কট মোকাবিলায় উদ্যোগী হয়েছিলেন। তাঁর অনুধাবনে কোনো সন্দেহ ছিল না যে, একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের ৯ মাসে বাংলাদেশ সমাজ অতিক্রম করেছে প্রায় নয় যুগ। মাত্র ১ মার্চ থেকে ২৫ মার্চের এই স্বল্প সময়কালে আওয়ামী লীগের ছয় দফা যেমন সকলের অজ্ঞাতসারে এক দফায় রূপান্তরিত হয়, নয় মাসের মুক্তিযুদ্ধের সময়েও শাসন-প্রশাসন সম্পর্কে জনগণের চিন্তাভাবনায়, সদ্য প্রাপ্ত রক্তাক্ত রাষ্ট্র এবং সরকারের প্রকৃতি সম্পর্কে সমাজের, বিশেষ করে রাজনীতি সচেতন জনসমষ্টির (Politically relevant) রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে সূচিত হয়েছে বৈপ্লবিক পরিবর্তন। পরিবর্তিত

www.pathagar.com

প্রেক্ষাপটে তাঁর ধারণা হয়েছিল, বাংলাদেশে জাতীয় একাত্মতার সঙ্কট থেকে উত্তরণের জন্যে প্রয়োজন সমন্বয়ের রাজনীতি। প্রয়োজন ভারসাম্যের রাজনীতির এবং প্রয়োজন নির্বাচনভিত্তিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার। তিনি লক্ষ্য করেন, জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে নেতৃত্বদানকারী দল আওয়ামী লীগ কর্তৃক আখ্যায়িত 'বাঙালি' জাতীয়তাবাদ ইসলামী ডানপন্থী ও চীন সমর্থিত বামপন্থীদের একাংশ এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতিরা গ্রহণ করেনি। তিনি লক্ষ্য করেন, ১৯৭১ সালের ডিসেম্বর মাসে বাংলাদেশের প্রবাসী সরকার কর্তৃক ৪টি ইসলাম-পসন্দ দলের নিষিদ্ধকরণ সমাজে এক ধরনের বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে। প্রবাসী সরকারের হেড কোয়ার্টার যে দেশে সেখানে মুসলিম লীগ, শিব সেনা, রাষ্ট্রীয় সেবক সঙ্ঘ, শিখ-জনতা পার্টি, পারসিক প্ল্যাটফরম, বিশ্ব হিন্দু পরিষদ কার্যকর থাকতে কোনো অসুবিধা নেই, কিন্তু বাংলাদেশে এই ধরনের কোনো দল থাকবে না। এ যে কত বড় ঔদ্ধত্য তা কে তাদের বোঝাবে? তিনি আরো লক্ষ্য করেন যে, পূর্ব পাকিস্তানে গণতন্ত্রের প্রক্রিয়াকে বিধ্বস্ত করার যে অভিযোগ একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম কারণ ছিল, স্বাধীনতা অর্জনের মাত্র তিন বছরের মধ্যে বাংলাদেশে একইভাবে গণতন্ত্রকে বিদায় জানানো হয় এবং রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারের নামে বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত হয় একদলীয় বাকশাল ব্যবস্থা। এই প্রেক্ষাপটে জিয়ার ভারসাম্যের রাজনীতি পর্যালোচনা অর্থপূর্ণ হতে পারে।

জিয়াউর রহমান অত্যন্ত আগ্রহভরে আর একটি বিষয় লক্ষ্য করেন এবং তা হল বাংলাদেশের বামপন্থী বিপ্লবীদের প্রতি ভারতের দৃষ্টিভঙ্গি। ১৯৭১ সালের জুলাই মাসে ভারতের Institutute for Defence Studies and Analysis- এর ডাইরেক্টর কে, সুব্রাহমানিয়াম (K. Subrahmanyam) ইচ্ছা করেই ভারতের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক গোপন দলিল প্রকাশ করে বলেন যে, 'মুক্ত বাংলাদেশে যেন বামপন্থী বিপ্লবীরা ক্ষমতাসীন হতে না পারে সেজন্যে ভারতের নিরাপত্তার স্বার্থেই বাংলাদেশে অবিলম্বে সামরিক হস্তক্ষেপ করা প্রয়োজন' ('by such pre-emptory military moves India could ensure her security by Preventing a radically left oriented leadership from being installed in power in free Bangladesh.') দেশের প্রগতিশীল তরুণদের সমন্বয়ে সংগঠিত 'মুক্তি বাহিনী' ভারতের বামবিরোধী দৃষ্টিভঙ্গির জন্যে ভারত সরকারের সুনজরে ছিল না। এ কারণেই ভারতপন্থী আওয়ামী লীগকে সমর্থন ও সহযোগিতা দানের লক্ষ্যে প্রবাসী সরকারের প্রধান তাজউদ্দিন আহমদের বিরোধিতা সত্ত্বেও ভারত সরকারের বিদেশ সংক্রান্ত গোয়েন্দা বিভাগ 'র'-এর (Research and Analysis Wing—RAW) উদ্যোগে আওয়ামী লীগের যুব শাখার নেতাকর্মীদের সহযোগে 'মুজিব বাহিনী' গঠন করে এবং এই সংগঠনটি যেন প্রবাসী সরকারের আওতার বাইরে কর্মরত থাকতে পারে তারও ব্যবস্থা করা হয়। এর প্রধান ছিলেন শেখ মুজিবের আত্মীয় শেখ ফজলুল হক মনি। তোফায়েল আহমদ, সিরাজুল আলম খান, আব্দুর রাজ্জাক প্রমুখরাও ছিলেন এর নেতৃত্বে। এই সংগঠনটির উদ্দেশ্য ছিল বহুবিধ। **এক.** বাংলাদেশে বামপন্থীদের প্রভাব হ্রাস করা। **দুই.** আওয়ামী লীগকে বামপন্থীদের হাত থেকে রক্ষা করা। **তিন.** বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ভারতীয় বাহিনীর

www.pathagar.com

কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার পথ প্রশস্ত করা। তাই দেখা যায়, ১৯৭১ সালের ১০ ডিসেম্বর বাংলাদেশকে ভারতের আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতির মাত্র চারদিন পরে এবং ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ শুরুর মাত্র সাতদিন পরে যখন 'মিত্র বাহিনীর' সম্মতিপত্র স্বাক্ষরিত হল, সেই সম্মতিপত্রে ভারতের পক্ষে স্বাক্ষর করেন ভারতের প্রতিরক্ষা বাহিনীসমূহের প্রধান জেনারেল সাম মানেক শ (Sam Manekshaw) এবং পলিসি প্রসেসিং কমিটির চেয়ারম্যান ডি পি ধর, প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী নন। অন্যদিকে, বাংলাদেশের পক্ষে স্বাক্ষর করেন প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদ ও উপ-রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম, কিন্তু বাংলাদেশ বাহিনী প্রধান এম এ জি ওসমানী নন। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী বামপন্থী তরুণদের সম্পর্কে ভারতের এই দৃষ্টিভঙ্গির আর একটি কারণ ছিল, বাংলাদেশ সঙ্কটে যুক্তরাষ্ট্র যেন কোনোভাবে কোনো দুর্বলতা প্রকাশ করতে না পারে তা নিশ্চিত করা। মোটকথা, এসব কারণে শুধু মুক্তিযুদ্ধের সময়ে নয়, স্বাধীন বাংলাদেশের প্রাথমিক পর্যায়েও ভারত-নির্ভর আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে বাংলাদেশের বামপন্থী নেতা ও কর্মীদের তীব্র অসন্তোষ পুঞ্জীভূত হতে থাকে। এই বাম ভীতির জন্যে মাওলানা ভাসানীকে ভারতে কার্যত অন্তরীণ থাকতে হয়।

জিয়াউর রহমান ক্ষমতাসীন হয়ে বাংলাদেশ রাজনীতির এই গতিসূত্রের তাৎপর্য অনুধাবন করেন এবং রাজনীতি ক্ষেত্রে বাংলাদেশের ব্যাপকভিত্তিক জনসমষ্টির অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টিতে মনোনিবেশ করেন তাঁর সৃজনশীল প্রক্রিয়ার মাধ্যমে। তাঁর ভারসাম্যে রাজনীতির প্রধান চারটি উপাদান হল : **ক.** বাঙালি জাতীয়তাবাদের পরিবর্তে বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের নতুন প্রত্যয়।। **খ.** রাজনৈতিক দল গঠনে ডান, কেন্দ্র এবং বামের সমন্বয় সাধন। **গ.** অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সরকারি উদ্যোগের সাথে বেসরকারি উদ্যোগের সহাবস্থান এবং **ঘ.** সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে ভারত-নির্ভরতা পরিহার করে এবং পাকিস্তানের প্রতি বৈরীভাব অক্ষুণ্ন রেখে বাংলাদেশে জীবন ব্যবস্থাভিত্তিক সাংস্কৃতিক বলয় রচনা। বলতে কোনো দ্বিধা নেই, এই চারটি ক্ষেত্রেই জিয়াউর রহমান সফল হয়েছেন। চারটি ক্ষেত্রেই জনগণের বিপুল সমর্থন তাঁর জনপ্রিয়তাকে আকাশচুম্বী করে তুলেছে এবং যুক্তির কষ্টিপাথরে চারটি সূত্রই যুগোত্তীর্ণ হয়েছে। এই চারটি সূত্রের ভিত্তিভূমিতেই গড়ে উঠেছে বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের বিশাল সৌধ।

আমরা জাতিগত পরিচয়ে বাঙালি না বাংলাদেশী, এই বিতর্ক বহুদিনের। পাকিস্তান আমলে পাকিস্তানের অধিবাসীদের সামগ্রিকভাবে বাঙালি বলে চিহ্নিত করা হলেও প্রকৃত প্রস্তাবে সবাই যেমন বাঙালি নয়, কেউ বাঙালি, কেউ গারো, কেউ বা চাকমা, মারমা, সাঁওতাল অথবা টিপরা, তেমনি পশ্চিম পাকিস্তানেও একই বিভাজন–কেউ পাঞ্জাবী, কেউবা সিন্ধি অথবা পাঠান অথবা বেলুচি। ভারতেও তাই। নাগরিক হিসেবে সবাই ভারতীয় হলেও জাতিসত্তার দিক থেকে কেউ বা বাঙালি, কেউ কেউ গুজরাটি, কেউবা বিহারী, অহমিয়া, মিজো অথবা দ্রাবিড়। শেখ মুজিব ব্যক্তি পরিচয়ে নিশ্চয়ই বাঙালি, যেমন বাঙালি জিয়াউর রহমানও, কিন্তু সন্তু লারমা কি বাঙালি? অংশু প্র চৌধুরী অথবা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা? স্বাধীনতার পূর্ব পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তানিদের বাঙালি বলাতে কেউ কোনো আপত্তি তোলেননি, কিন্তু স্বাধীনতার পরে, বিশেষ করে বাংলাদেশের সংবিধান রচিত হবার সময় গণপরিষদে এই সম্পর্কে তুমুল বিতর্কের সূচনা হয়।

www.pathagar.com

রচিত হবার সময় গণপরিষদে এই সম্পর্কে তুমুল বিতর্কের সূচনা হয়। পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে স্বতন্ত্র সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হয়ে মানবেন্দ্র লারমা গণপরিষদে যা বলেন তা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। ১৯৭২ সালের ৩১ অক্টোবরে গণপরিষদে তিনি বলেছিলেন "আমি একজন চাকমা। আমার বাপ-দাদা চৌদ্দ পুরুষ কেউ বলে নাই আমি বাঙালি। আমরা কোনোদিনই নিজেদেরকে বাঙালি বলে মনে করি নাই। আজ যদি স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশের সংবিধানের জন্যে এই সংশোধনী পাস হয়ে যায়, তাহলে আমাদের এই চাকমা জাতির অস্তিত্ব লোপ পেয়ে যাবে। আমরা বাংলাদেশের নাগরিক। আমরা আমাদেরকে বাংলাদেশী বলে মনে করি এবং বিশ্বাস করি। কিন্তু বাঙালি বলে নয়।"

[*বাংলাদেশ গণপরিষদ বিতর্ক*, ১৯৭২, পৃষ্ঠা ৪৫২]

মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার যুক্তি অকাট্য হলেও এবং তার সমাধান যুক্তিসঙ্গত হলেও তা শোনার ধৈর্য কারো ছিল না। শেখ মুজিবুর রহমান উপজাতীয়দের বাঙালি হয়ে যাবার নির্দেশ দিয়েই খালাস। ফলে সংবিধান অনুযায়ী দেশের সমগ্র জনসমষ্টি বাঙালি হয়ে গেল। ফলে বাংলাদেশে সৃষ্টি হল বিভ্রান্তি। সংশয়ে রাজনৈতিক পরিবেশ অন্ধকার হয়ে উঠল। বাংলাদেশে বসবাসকারী সকলেই যদি বাঙালি হয় তাহলে চাকমা, মারমা, মুরং, সাঁওতাল, গারোরা কি? ভারতের পশ্চিমবঙ্গের বাংলাভাষীরাই বা কি?

মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা যা বলেছিলেন তা কি ফেলে দেবার মতো? তিনি বাংলাদেশের নাগরিক হিসেবে নিজেকে বাংলাদেশী বলেই চিহ্নিত করেছিলেন, যেমন– বাঙালি, বিহারী, গুজরাটি বা অহমিয়া মিলে ভারতীয় অথবা সিন্ধি, পাঞ্জাবী, বেলুচি, পাঠান সবাই পাকিস্তানি। এক্ষেত্রে জিয়ার সৃজনশীল মেধার সুস্পষ্ট প্রকাশ ঘটেছে। শুধুমাত্র ভাষা ও সংস্কৃতির ঐক্যের ভিত্তিতে কোনো জাতি গড়ে ওঠে না। এজন্যে তাছাড়াও প্রয়োজন হয় জনসমষ্টির ঐতিহাসিক অর্জনের উজ্জ্বল স্মৃতি, ভৌগোলিক ঐক্যসূত্র, ধর্মীয় চেতনার সুষ্ঠু বন্ধন এবং অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সমতা। জিয়াউর রহমানের উদ্যোগে তার সুষ্ঠু প্রকাশ ঘটেছে। একাত্তর সালের মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের স্বপ্ন ছিল একটি স্বতন্ত্র ও গর্বিত জাতি হিসেবে আত্মপ্রকাশের। 'বাংলাদেশী জাতীয়তা'–এই পরিচয়ে সেই স্বপ্ন ও আকাঙ্ক্ষার বাস্তবায়ন ঘটে এবং সম্পন্ন হয় জিয়ার সমন্বয় ও ভারসাম্যের রাজনীতির প্রথম অধ্যায়। এই সম্পর্কে প্রেসিডেন্ট হিসেবে ১৯৭৮ সালের ৪ নভেম্বর বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের কেন্দ্রীয় আহ্বায়ক কমিটির এক সভায় প্রেসিডেন্ট জিয়া বলেন, "বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের অর্থ হচ্ছে আমরা বাংলাদেশী। আমাদের পৃথক ইতিহাস রয়েছে। আমাদের দেশ এক ভিন্ন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে জন্মলাভ করেছে। আমাদের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি পৃথক। আমাদের ভাষা পৃথক। আমরা তাকে নিজের মতো করে গড়ে তুলেছি। আমরা তাকে আধুনিক করেছি। আমাদের পৃথক সাহিত্য ও কবিতা রয়েছে। আমাদের পৃথক শিল্প ও চিন্তাধারা রয়েছে। আমাদের ভৌগোলিক অবস্থান পৃথক। আমাদের নদী ও ভূমি পৃথক। আমাদের জনগণ পৃথক। আমরা সম্পূর্ণ স্বাধীন ও সার্বভৌম। আজ আমাদের জনগণের মধ্যে এক চেতনা গড়ে উঠেছে–যে চেতনা আমাদের প্রতিবেশী দেশ ও এই অঞ্চলের অন্যান্য দেশের জনগণের থেকে ভিন্ন।" (*সংবাদ ৫ নভেম্বর ১৯৭৮: ইত্তেফাক, ৫ নভেম্বর ১৯৭৮*)। ১৯৮১ সালের ২৭ এপ্রিলে জিয়াউর রহমান এই সম্পর্কে বলেন যে, "ভাষাভিত্তিক জাতীয় পরিচয় আমাদের আংশিক পরিচয়।"

www.pathagar.com

পাঁচ : সৃজনশীল রাজনীতি

রাষ্ট্রের প্রকৃতি সম্পর্কে জিয়াউর রহমানের ছিল বৈশিষ্ট্যপূর্ণ এক ধারণা। বিশাল ভারত-বটবৃক্ষের শাখা-প্রশাখায় জড়িয়ে মেরুদণ্ডহীন লতা ও গুল্মের মতো টিকে না থেকে স্বল্প পরিসরে হলেও সরু তাল গাছের মতো মাথা উঁচু করবে বাংলাদেশ আপন গৌরবে। সরকারের রূপরেখা সম্পর্কেও তিনি পোষণ করতেন আকর্ষণীয় এক মতবাদ। তাঁর মতে, সরকারের রূপ এমন হবে যেখানে জনগণের অংশগ্রহণের পথ প্রশস্ত হবে। জনপ্রতিনিধিরাই নীতি-নির্ধারণ করবেন। নির্ধারিত নীতি এবং সংশ্লিষ্ট ক্রিয়াকাণ্ডের জন্য জনগণের নিকট তারা দায়ী থাকবেন এবং দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হলে নীরবে জনগণের চক্ষুর আড়ালে চলে যাবেন। তাঁর ধারণায়, যে সরকার গণ ইচ্ছার সার্থক প্রতিফলন ঘটায় তাই শ্রেষ্ঠ সরকার। যে সরকার ব্যবস্থায় দেশ ও জাতি গঠনমূলক প্রক্রিয়ায় দেশের জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করা যায় তাই হল কাঙ্ক্ষিত সরকার। যে ব্যবস্থায় জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত উদ্যোগকে ধারণ করা সম্ভব হয়, তাই হল সবচেয়ে উত্তম ব্যবস্থা। 'আমাদের পথ' শীর্ষক এক নিবন্ধে জিয়াউর রহমান নিজেই লিখেছেন, "আমাদের সামনে বর্তমানে লক্ষ্য একটাই, আর তা হলো দেশ ও জাতি গঠন। দু'শত বছর পরাধীন থাকার ফলে দেশ ও জাতির অনেক ক্ষতি হয়েছে। সময়ও নষ্ট হয়ে গেছে। তাই আমাদের প্রয়োজন অনতিবিলম্বে জনশক্তিকে ঐক্যবদ্ধ করা। তবে কথা থেকে যায়, জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করা হবে কীভাবে? একদলীয় শাসনব্যবস্থা চাপিয়ে দিয়ে? নিশ্চয়ই নয়। 'ওয়ান পার্টি সিস্টেম' এবং রেজিমেন্টেশন এনফোর্স করে যে সাফল্য অর্জন করা যায় না নিকট অতীত তার সাক্ষ্য দিচ্ছে।" জিয়াউর রহমান, 'আমাদের পথ' [*জিয়ার রাজনৈতিক দর্শন ও আদর্শ* (২০০০) পৃষ্ঠা ৪১]।

এক নেতার নির্দেশে একদলীয় সরকার ব্যবস্থা যে কাঙ্ক্ষিত নয়, ধর্ম-বর্ণ ও গোত্র নির্বিশেষে সকল মানুষের জন্য খাদ্য, বস্ত্র, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বাসস্থান ও পরিবার পরিকল্পনার মৌলিক চাহিদা পূরণের জন্য যে তা যথাযোগ্য নয় এবং প্রগতিশীল সমাজের জন্য প্রয়োজনীয় সমতা, নিরপেক্ষতা ও ন্যায়বিচারের জন্য যে অত্যন্ত অপ্রতুল তা শুধু এদেশে নয়, বিদেশেও প্রমাণিত। তাই বাংলাদেশের সুশাসনের জন্য কাম্য সরকার ব্যবস্থা হল গণতান্ত্রিক সরকার। একমাত্র গণতন্ত্রের আকাশেই থাকে না একক চন্দ্র। গণতন্ত্রের আকাশ হল অসংখ্য তারকা পরিপূর্ণ। গণতন্ত্র যেন মিটিমিটি আলোয় ভরা তারার মেলা। গণতন্ত্রেও নেতা থাকেন, থাকে নেতৃত্ব, কিন্তু গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার নেতা রাজনৈতিক আকাশ আলো করা একক চন্দ্রের মতো মহাপরাক্রমশালী, সমগ্র ব্যবস্থায় আধিপত্য বিস্তারকারী, সকল সমস্যায় চূড়ান্ত সিদ্ধান্তকারী এক দেশ, এক নেতার মতো নয়। তিনি অনেকটা সরকার ব্যবস্থার বিভিন্ন পর্যায়ে সমন্বয়কারী, বিভিন্ন ক্ষেত্রের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষাকারী, সর্বমহলে ঐক্যবন্ধন সুদৃঢ়কারী, তথ্যসমৃদ্ধ সেতুবন্ধনের মতো। গণতন্ত্রে নেতৃত্বের স্বরূপ হল এমনি। চারদিক আলো করা চন্দ্রে গ্রহণ লাগতে পারে। তার পর্যায়ক্রমিক হ্রাস-বৃদ্ধি হতে পারে, অমাবশ্যায় অন্ধকার পরিবেষ্টিত হতে পারে। কিন্তু তারকা ভরা গণতন্ত্রের আকাশে নেই কোনো অনিশ্চয়তা,

www.pathagar.com

একদলীয় সরকার ব্যবস্থার প্রেক্ষাপটে জিয়ার বহুদলীয় গণতন্ত্র এবং গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় জনগণের অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে সার্বিক ব্যবস্থাপনা জিয়াউর রহমানের এমনি সৃজনশীল চিন্তা-ভাবনার পরিচায়ক।

সরকারের রূপরেখা কিন্তু আপনা আপনি গজিয়ে ওঠে না। তারও ভিত্তি হল অর্থনীতির প্রকৃতি এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য। সংস্কৃতি সম্পর্কে জিয়ার ভাবনা- চিন্তা, বিশেষ করে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড সম্পর্কে তাঁর নতুন অনুধাবন ও দিকনির্দেশনা ১৯৭২-৭৫ সময়কালের সরকার কাঠামোর আমূল পরিবর্তনের মুখ্য নির্দেশক হয়ে দাঁড়ায়। বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্যের কথা তুলে ধরে জিয়াউর রহমান বলেন, "আমাদের পৃথক ইতিহাস রয়েছে। আমাদের দেশ এক ভিন্ন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে জন্ম লাভ করেছে। আমাদের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি পৃথক। আমাদের পৃথক শিল্প ও চিন্তাধারা রয়েছে"। তিনি আরো বলেন "ভাষাভিত্তিক জাতীয় পরিচয় আমাদের আংশিক পরিচয় মাত্র"। এই সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্যের ভিত্তিতে জনগণের সকল অংশের এবং দেশের সকল স্বার্থগোষ্ঠীর মধ্যে সমন্বয় সাধনের জন্য তিনি উদ্যোগ গ্রহণ করেন জাতীয় জীবনের সকল ধারার প্রতিনিধিত্বকারীদের সহযোগে দল গঠনের মাধ্যমে। এটি উল্লেখ্য যে, যখন তিনি ক্ষমতাসীন হন তখন বাংলাদেশে কোনো রাজনৈতিক দল ছিল না। ছিল না কোনো দলীয় কর্মতৎপরতা। কলকাতায় অবস্থানকারী বাংলাদেশের প্রবাসী সরকার ১৯৭১ সালে ডিসেম্বরের শেষ দিকে মুসলিম লীগসহ চারটি ইসলাম-পসন্দ দলকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। তারই চার বছর পরে একদলীয় বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ–বাকশাল গঠন করে শেখ মুজিবুর রহমান বাকশাল ছাড়া অন্য সব দলের বিলুপ্তি ঘোষণা করেন। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টে শেখ মুজিবের নির্মম হত্যাকাণ্ডের মধ্য দিয়ে রাজনীতির যে পটপরিবর্তন হয় এবং তার দলের নেতা খন্দকার মুশতাক আহমদ ক্ষমতাসীন হয়ে রাজনৈতিক দল হিসেবে বাকশালেরও বিলুপ্তি ঘোষণা করেন। অন্য কথায়, ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের পরে বাংলাদেশে কোনো রাজনৈতিক দল ছিল না।

দেশে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে, বিশেষ করে নির্বাচনের মাধ্যমে জনপ্রতিনিধি নির্বাচনের জন্য জিয়াউর রহমান ১৯৭৬ সালের দলবিধি প্রবর্তন করে দেশে নতুনভাবে রাজনৈতিক দল সৃষ্টির উদ্যোগ গ্রহণ করেন। এই প্রক্রিয়ায় দেশে রাজনৈতিক দলসমূহের পুনরুজ্জীবন ঘটে। বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের জন্ম হয় এই প্রক্রিয়ায়। বিএনপি সংসদীয় দলের গঠন থেকে আভাস মিলে যে, এই নতুন দলটির প্রায় শতকরা ৬০ ভাগ সদস্য অতীতে ছিলেন অন্যান্য দলের সদস্য (শতকরা ১৬ ভাগ বাংলাদেশ মুসলিম লীগের, ১৫ ভাগ ন্যাপ (ভাসানী) দলের, ৯ ভাগ আওয়ামী লীগের, ৩ ভাগ ইউপিপি-এর, ২ ভাগ ডেমোক্রেটিক লীগের, ১ ভাগ ন্যাপ (মোজাফফর), ১ ভাগ জাসদ, ৬ ভাগ ছাত্রলীগ ও ছাত্র ইউনিয়নের কর্মকর্তা এবং ৬ ভাগ অন্যান্য দল থেকে] এবং তারা এসেছিলেন যেমন ডানদিক থেকে, তেমনি এসেছেন বাম থেকে। এসেছেন কেন্দ্র থেকেও। তাদের যতজন ইসলামপন্থী তার চেয়ে অনেক বেশি ছিলেন মধ্য ও বামপন্থী। জিয়া তার সমন্বয়ের রাজনীতির সূচনা করেন এইভাবে।

www.pathagar.com

অর্থনৈতিক কার্যক্রম সম্পর্কেও ছিল ভারসাম্যমূলক অগ্রবর্তী চিন্তা-ভাবনা। ১৯৭২-৭৫ সময়কালে তিনি লক্ষ্য করেছেন কীভাবে বাংলাদেশে সমাজতন্ত্রের নামে এক অপচয়প্রবণ ব্যবস্থার জন্ম হয়, কীভাবে ক্ষমতাসীন দলের ছোট-বড়-মধ্যম পর্যায়ের নেতারা জাতীয় সম্পদ কুক্ষিগত করে রাতারাতি ফুলে-ফেঁপে ওঠেন, কীভাবে জাতীয় অর্থনীতি মাত্র ক'বছরে অন্তঃসারশূন্য হয়ে পড়ে এবং কীভাবে জাতীয় নেতা শেখ মুজিবুর রহমান ঐসব 'নষ্ট ব্যক্তিদের' লক্ষ্য করে আফসোস করে বলতেন মাঝে মাঝেই : "সবাই পায় সোনার খনি, বাংলাদেশে আমি পেয়েছি চোরের খনি"।

জিয়াউর রহমান তাই ক্ষমতাসীন হয়ে বাংলাদেশে এক নতুন উন্নয়ন কৌশল অবলম্বন করেন। এই উন্নয়ন কৌশলের প্রধান উপাদান ছিল তিনটি : **এক.** সরকারি খাত সংরক্ষণ করেও বেসরকারি উদ্যোগকে উৎসাহদান। **দুই.** বেসরকারি উদ্যোগের মাধ্যমে রফতানিমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ার উৎসাহদান, এবং **তিন.** কৃষির সার্বিক উন্নতি বিধান। বিনিয়োগ নীতি পরিবর্তন করে বেসরকারি খাতে বিনিয়োগের জন্য পূর্বনির্ধারিত ৩ কোটি টাকার স্থলে পরিবর্তিত পরিমাণ হয় ১০ কোটি টাকা–যা আরো ক'বছর পরে হয় যত খুশি। জাতীয়করণ ক্ষেত্রে প্রথমে ছিল ১৫ বছরের স্থগিতকরণ সময়সীমা–যা পরবর্তীতে পুরোপুরি মুছে যায়। জাতীয়করণ করা শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের কিছু সংখ্যককে পুরোপুরি বেসরকারি উদ্যোক্তাদের হাতে ফিরিয়ে দেয়াও ছিল এই কৌশলের অন্যতম উপাদান–যা আজকের বাংলাদেশে জিয়ার তীব্র সমালোচকরাও ধর্মীয় বিধির মতো অনুসরণ করছেন। বেসরকারি পর্যায়ে ব্যাংক প্রতিষ্ঠা, বীমা প্রতিষ্ঠান গঠন তখন থেকেই শুরু হয়। যে স্টক এক্সচেঞ্জ (Stock Exchange) এবং শেয়ার বাজারের কার্যক্রম আধুনিক বিশ্বে এত গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক কার্যক্রম, বাংলাদেশে জিয়াউর রহমানই তার সূচনা করেন। বাংলাদেশে বিদেশী বিনিয়োগের পথও তিনি প্রশস্ত করেন। উল্লেখ্য যে, তখন থেকেই জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া, থাইল্যান্ড, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ভারত ও পাকিস্তান বাংলাদেশে শিল্প প্রতিষ্ঠানে বিনিয়োগের সূচনা করে। বেসরকারি বিদেশী বিনিয়োগ অধিক পরিমাণে আকৃষ্ট করার জন্য চট্টগ্রামে একটি অবাধ বাণিজ্য প্রক্রিয়াকরণ জোন (A Free Trade Processing Zone) প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা হয় ১৯৭৮ সালে। এই পথ ধরেই এসেছে দেশের বিভিন্ন স্থানে আজকের রফতানি প্রক্রিয়াকরণ জোন (EPZ)। মোট কথা, সত্তর দশকের মাঝামাঝিতে বিশ্বব্যাপী সমাজতন্ত্রের আবেদন অত্যন্ত প্রবল থাকলেও জিয়াউর রহমানের অনুধাবনে এতটুকু অসুবিধা হয়নি যে, যে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা শুধুমাত্র বণ্টনের ওপর গুরুত্বারোপ করে এবং উৎপাদনের বিচিত্র গতি-প্রকৃতি সম্পর্কে উদাসীন থাকে, যে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড শুধুমাত্র সরকারি নিয়ন্ত্রণে বেড়ে ওঠে এবং সমাজের অন্যান্য সৃষ্টিশীল উদ্যোগের স্পর্শ থেকে বঞ্চিত হয় এবং যেখানে দলীয় নেতৃত্বের কঠোর নিয়ন্ত্রণের উৎপাদনমুখী কর্মতৎপরতা দলিত-মথিত হয়, সেখানে উৎপাদন হ্রাস পেতে বাধ্য। বণ্টন ক্ষেত্রে দুর্নীতির প্রসার হতে বাধ্য। ব্যবস্থাপনা নিম্নস্তরে নেমে যেতে বাধ্য। ঐসব সমাজে দারিদ্র্য, ব্যাধি, বেকারত্ব, অপুষ্টিই জনগণের ভাগ্যলিপি। তাই বিশ্বময় এই অনুধাবনের সর্বজনীনতা দেরিতে সুস্পষ্ট হলেও বাংলাদেশে জিয়ার কৃতিত্বপূর্ণ নেতৃত্বে এর প্রকাশ ঘটতে শুরু করে সত্তরের দশকের শেষ প্রান্ত থেকেই। এখানেই সুস্পষ্ট হয়েছে জিয়ার রাজনীতির বৈশিষ্ট্যপূর্ণ দিক।

www.pathagar.com

যেহেতু বাংলাদেশের সংস্কৃতি স্বতন্ত্র এবং যেহেতু গত দুশো বছর ধরে বাংলাদেশের জনগণ অভিশপ্ত হয়েছেন বিদেশী শাসনের নাগপাশে বন্দী থেকে দারিদ্র্য, ব্যাধি, অপুষ্টি, বেকারত্ব এবং অসহায়ত্বের অভিশাপে এবং যেহেতু ১৯৭২-৭৫ সময়কালের শাসনব্যবস্থায় দেশের অর্থনীতি কিছুসংখ্যক লুটেরার সম্পদে পরিণত হয়েছিল শুধুমাত্র একদলীয় ব্যবস্থার কঠোর নিষ্পেষণে, তাই জিয়াউর রহমান বাংলাদেশে সরকার গঠনের নতুন দিকদর্শন রচনা করলেন। এই ব্যবস্থা বহুদলীয় গণতন্ত্র তো বটেই, কিন্তু দলীয় পর্যায়ে কোনো বৃহৎ, কোনো মহান নেতার প্রতি আনুগত্যের বন্ধনে আবদ্ধ থেকে নেতাকর্মীরা শুধু দলীয় স্বার্থ উদ্ধারে রত থাকবেন, দলীয় স্বার্থের ছিদ্র পথে ব্যক্তিগত স্বার্থকে প্রাধান্য দেবেন এবং এই লক্ষ্যে শাসন-প্রশাসনের সর্বস্তরে দলীয় কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে সরকার ব্যবস্থাকে দলীয় নিয়ন্ত্রণে এনে বহুদলীয় ব্যবস্থায় অলিখিত একদলীয় ব্যবস্থা অব্যাহত রাখবেন বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে তা কখনো গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। সবার, বিশেষ করে সামগ্রিকভাবে জনগণের নিকট সরকারের গ্রহণযোগ্যতার একমাত্র মানদণ্ড যে জনগণের কল্যাণ সাধন তা জিয়ার নিকট এক গভীর বিশ্বাস সূত্র। এজন্যই তিনি বারে বারে ছুটে গেছেন গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে, সাধারণ মানুষের কাছাকাছি শুধু এ কথা বলতে যে, এ দেশ আপনাদের। এ দেশের ভাগ্যের সাথে জড়িয়ে রয়েছে সবার ভাগ্য। একবার মাথা উঁচু করে দাঁড়ান এবং এই দেশের কল্যাণের জন্য সরকারের কার্যক্রমে অংশীদার হোন। অবনত মস্তকে, কোনো প্রজার মতো নয়, বরং রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার মালিক হিসেবে। আপন গৌরবে। তাহলে দেখবেন, সব ঠিক হয়ে গেছে।

www.pathagar.com

জিয়াউর রহমানের বৈদেশিক নীতি

আজকের বিশ্ব পরিস্থিতির নিরিখে, বিশেষ করে বুশ-ব্লেয়ারের নেতৃত্বে ইঙ্গো-মার্কিন শক্তির ইরাক দখলের পরে, ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলি যে ধরনের হুমকির সম্মুখীন হয়েছে, সেই প্রেক্ষাপটে জাতীয় স্বার্থ রক্ষার জন্য দু'যুগ পূর্বে বাংলাদেশের কৃতী সন্তান জিয়াউর রহমান যে পররাষ্ট্র নীতির সূচনা করেছিলেন তার মূল্যায়ন নতুনভাবে নতুন আলোকে হওয়া উচিত। সম্ভাব্য শত্রুর উপর আগেভাগে আক্রমণ পরিচালনা করে তাকে বিধ্বস্ত করার যে বুশ তত্ত্ব (Doctrine of Pre-Emptive Attack), আক্রমণকালে আন্তর্জাতিক বিধিবিধানকে উপেক্ষা করে এবং জাতিসংঘকে পাশ কাটিয়ে শক্তি প্রদর্শনের দৃষ্টান্ত বিশ্ব ব্যবস্থায় সৃষ্টি করেছে গভীর অনিশ্চয়তা। এই অনিশ্চয়তা বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রকে ভীতসন্ত্রস্ত করেছে। করেছে আতঙ্কিত। শুধু সরকার পরিবর্তনই (Regime Change) নয়, যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেন কর্তৃক ইরাকের জবর-দখল আন্তর্জাতিক রাজনীতি ক্ষেত্রে যেমন সৃষ্টি করেছে গভীর অনিশ্চয়তা, অন্যদিকে তেমনি তার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া রূপে তৈরি হচ্ছে অথবা হবার সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছে বিভিন্ন প্রকরণের ক্ষমতার সমীকরণ এবং সামরিক মেরুকরণ। স্নায়ু যুদ্ধের অবসানের পরে এই সর্বপ্রথম বিশ্বময় সামরিক মেরুকরণের লক্ষ্যে নতুনভাবে জোট গঠন ও গোপন চুক্তির প্রবণতা সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

এই প্রবণতা অবশ্য স্বাভাবিক। ক্ষমতার দাম্ভিকতাই তার সীমারেখা নির্ধারণ করে থাকে এবং সীমাহীন ক্ষমতার দৈত্যরূপী প্রয়োগ অনতিবিলম্বে তার প্রতিদ্বন্দ্বীর মুখোমুখি হয়। আন্তর্জাতিক রাজনীতি ক্ষেত্রে ব্যালান্স অব পাওয়ারের (Balance of Power) প্রবণতা অনেকটা স্বয়ংক্রিয়। বিশ্বের একমাত্র পরাশক্তি যুক্তরাষ্ট্রের 'একক সিদ্ধান্তে স্বেচ্ছাসেবী ক্ষমতা প্রয়োগের নীতি' (Unilateralism) অবশ্যই প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্মুখীন হতে যাচ্ছে। তবে তা কখন এবং কীভাবে তা এখনো সুস্পষ্ট হয়নি। যুক্তরাষ্ট্রের অভ্যন্তরেই কিছু কিছু রাজনৈতিক বিশ্লেষক প্রশ্ন করে চলেছেন যুক্তরাষ্ট্রের এই এককভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণের কাল (new unilateralism') কত দীর্ঘ হতে পারে? আমেরিকান রাষ্ট্রবিজ্ঞান সমিতির এক সময়ের সভাপতি কেনেথ ওয়ালজ ((Kenneth Waltz) অবশ্য এই প্রশ্নের জবাবে বলেছেন, বিশ্বে একচ্ছত্র আধিপত্যের সময় অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। এর কারণ হচ্ছে, এই একক আধিপত্যকে চ্যালেঞ্জকারী শক্তির অভ্যুত্থান অবশ্যম্ভাবী। কেনেডী স্কুল অব গভর্নমেন্টের পরিচালক জোসেফ নাঈ (Joseph Nye) আরও জোর দিয়ে এই প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন এভাবে– আন্তর্জাতিক রাজনীতির ক্ষেত্রে কোনো শক্তি পরম পরাক্রমশালী হয়ে উঠলে প্রকৃতির নিয়মের মতোই এর বিরুদ্ধে আর এক শক্তি জোটের উদ্ভব হয়ে থাকে। সত্যি বটে। এই মুহূর্তে যুক্তরাষ্ট্রের কোনো একক প্রতিদ্বন্দ্বী

www.pathagar.com

নেই এবং অদূর ভবিষ্যতে যুক্তরাষ্ট্রকে চ্যালেঞ্জ করার মতো কোনো শক্তি জোটের আবির্ভাবের সম্ভাবনাও কম। কিন্তু দূর ভবিষ্যতে সুসংহত ইউরোপ যদি মনস্থির করে অথবা যে চীনকে জোসেফ নাই (NYE) বিশ শতকের কাইজারের ইউরোপ (Kaiser's Europe) রূপে চিহ্নিত করেছেন তা আরো শক্তি সঞ্চার করে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিদ্বন্দ্বী যে হবে না তা বলা যায় না। ইরাক আক্রমণের ক্ষেত্রে ফ্রান্স, জার্মানি ও রাশিয়ার ভিন্নমত তো রয়েছেই।

আন্তর্জাতিক রাজনীতি ক্ষেত্রে শুধুমাত্র যুক্তরাষ্ট্রের দৃষ্টান্তই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলির জন্যে ভীতির কারণ নয়, যুক্তরাষ্ট্র যেসব অঞ্চলে তার আধিপত্য বিস্তারে কৃত সংকল্প সেসব অঞ্চলে তার সহযোগিতা বা পৃষ্ঠপোষকতা লাভকারী বৃহৎ বা মধ্যম পর্যায়ের রাষ্ট্রগুলিও ঐসব অঞ্চলের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলির নিরাপত্তার জন্যে বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে। কিছুদিন পূর্বে আফগানিস্তানে এবং বর্তমানে ইরাকে যুক্তরাষ্ট্র যা করেছে তা থেকে মনে হয়, যে অঞ্চলে যুক্তরাষ্ট্রের মৌল অর্থনৈতিক স্বার্থ (vital economic interest) সংশ্লিষ্ট রয়েছে সেসব অঞ্চলে যুক্তরাষ্ট্র কোনো ঝুঁকি নিতে রাজি নয়। সরাসরি ঐ সব অঞ্চলের কৌশলগত অবস্থানে স্থায়ীভাবে ঘাঁটি স্থাপন করতে দ্বিধা করবে না। এমনকি যুদ্ধের মাধ্যমে হলেও সই। আন্তর্জাতিক রীতিনীত ও বিধিবিধান বা জাতিসংঘের অনুমোদনেরও কোনো তোয়াক্কা করবে না। এর ফলে সমগ্র এশিয়াব্যাপী পশ্চিম এশিয়া, মধ্য এশিয়া, দক্ষিণ এশিয়া, এমনকি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় রাজনৈতিক ও সামরিক মেরুকরণ প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। শুরু হয়েছে প্রতিরক্ষা জোট গঠন এবং গোপন চুক্তির প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সমগ্র এশিয়াব্যাপী ঠাণ্ডা যুদ্ধের মহড়া শুরু হয়েছে। দক্ষিণ এশিয়ার দিকে দৃষ্টি দিন, দেখবেন দক্ষিণ এশিয়ার দুই পারমাণবিক শক্তিধর ভারত এবং পাকিস্তান ব্যস্ত রয়েছে নতুন কৌশলে নিজেদের শক্তি বৃদ্ধি করতে এবং শক্তির ভারসাম্য রক্ষা করে নিজেদের প্রতিরক্ষা মজবুত করতে। ভারতকে এরই মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র বিভিন্ন ক্ষেত্রে সহযোগিতা দান করে দক্ষিণ এশিয়ায় তার বিশ্বস্ত সহযোগীরূপে চিহ্নিত করেছে। ভারত ও যুক্তরাষ্ট্রের বশংবদ এবং মধ্যপ্রাচ্যের অকৃত্রিম মিত্র ইসরাঈলের কাছাকাছি এসে গেছে। ইসরাঈল থেকে অত্যাধুনিক মারণাস্ত্র সংগ্রহ করেছে। কাজে লাগাচ্ছে ইসরাইলের গোয়েন্দা সংস্থার দক্ষ একসপার্টিজকে (Expertise)। লক্ষ্য একটাই এবং তা হল পূর্ব সীমান্তে দ্রুত পদে এগিয়ে আসা চীনের সার্থক মোকাবেলা। পূর্বে মালাক্কা প্রণালী থেকে শুরু করে পশ্চিম এশিয়ার ইসরাঈল এবং মধ্য এশিয়ার আফগানিস্তানের মধ্য দিয়ে কাজাকিস্তান ও তাজিকিস্তান পর্যন্ত প্রভাব বলয় বিস্তৃত করে এশিয়ায় এক নম্বর ক্ষমতারূপে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করা। চীনও বসে নেই। পাকিস্তানকে আরো কাছে টেনে, মায়ানমারের সাথে বন্ধনসূত্র আরো দৃঢ় করে, ভারতের পূর্ব প্রান্তের রাষ্ট্রগুলির- নেপাল এবং বাংলাদেশ-সাথে সুসম্পর্ক প্রতিষ্ঠায় ব্যস্ত। এক কথায়, এই নব্য স্নায়ুযুদ্ধের মহড়ায় ভারত যেমন চীনের তিন পাশে অবস্থিত রাষ্ট্রগুলির সাথে সখ্যতা স্থাপন করে কোনো কোনো ক্ষেত্রে চাপ সৃষ্টির মাধ্যমে এক ধরনের বন্ধনী সৃষ্টি করছে চীনও তেমনি তার সামরিক বলয় তিব্বত থেকে পাকিস্তান এবং মায়ানমার থেকে বাংলাদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত করতে উদ্যত হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষামন্ত্রী ডোনাল্ড রামসফেল্ডের গোপন দলিলেও দক্ষিণ এবং দক্ষিণ-

www.pathagar.com

পূর্ব এশিয়ায় যা ঘটছে সে সম্পর্কে বিস্তৃত বিবরণ রয়েছে। রামসফেল্ডের দলিলে বিবৃত বিষয়গুলোকে প্রামাণ্য ও সঠিক হিসেবে না ধরলেও দক্ষিণ এশিয়ার উত্তর-পশ্চিম ও উত্তর-পূর্বাংশের ভবিষ্যৎ কর্মপ্রণালী ও লক্ষ্যকে সামনে রেখে যে বেশকিছু ব্যবস্থা গৃহীত হচ্ছে তা বলাই বাহুল্য। তিব্বতে চীনের বিমানঘাটি বিস্তৃতকরণ, ভারতের আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের কাছাকাছি কোকো দ্বীপপুঞ্জে চীনের নৌবাহিনী ঘাঁটি, মায়ানমারের মান্দালয়ে প্রায় ১২০০০ ফুট দীর্ঘ রানওয়ে নির্মাণ, পাকিস্তানকে চীনের পারমাণবিক ও ক্ষেপণাস্ত্র প্রযুক্তি ক্ষেত্রে সহায়তা দান যেমন গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ, তেমনি গুরুত্বপূর্ণ হল ভারত মহাসাগের ভারতীয় নৌবাহিনীর শক্তিবৃদ্ধি। চীনের সন্নিকটে মালাক্কা প্রণালীতে মার্কিন ও ভারতীয় নৌবাহিনীর যৌথ টহল ব্যবস্থা, আফগানিস্তানে জাতীয় সামরিক বাহিনী গঠনে ভারতের সক্রিয় সহযোগিতা, তাজিকিস্তানের সাথে ভারতের সামরিক সহযোগিতা, এমনকি ভিয়েতনামের সাথে ভারতীয় নৌবাহিনীর যোগাযোগও এশিয়ায় ভারতকে প্রধান শক্তিরূপে সুসজ্জিত করার ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকা এখন পর্যন্ত সুস্পষ্ট না হলেও অনুধাবনে কোনো অসুবিধা হচ্ছে না যে, দুটি কারণে যুক্তরাষ্ট্র ভারতের গাঁটছড়া বাঁধতে পারে। এবং ২০২০ সালের পরে যুক্তরাষ্ট্রের দৃষ্টিতে চীনের যে অবস্থা সৃষ্টি হবে তা কোনোক্রমে যুক্তরাষ্ট্রের নিকট কাঙ্ক্ষিত হতে পারে না। সুতরাং চীনকে নিয়ন্ত্রণের জন্য (Containment) যুক্তরাষ্ট্রের প্রয়োজন হবে ভারতকে। **দুই.** উত্তর কোরিয়া যদি তার পারমাণবিক অস্ত্রসম্ভার বৃদ্ধি করতে থাকে তাহলে দূরপ্রাচ্যে যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থান অনিশ্চিত হয়ে উঠতে পারে। জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া থেকে তখন ভারত হয়ে উঠতে পারে যুক্তরাষ্ট্রের নিশ্চিত অবস্থানক্ষেত্র। তাছাড়া ইরাক দখলের পরবর্তী পর্যায়ে মধ্যপ্রাচ্য যদি অস্থিতিশীল হয়ে উঠে তাহলে সউদী আরব অথবা কুয়েত বা কাতার অপেক্ষা যুক্তরাষ্ট্রের দৃষ্টি বাড়বে ভারতের দিকেই।

আন্তর্জাতিক ভূ-রাজনীতির এই প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের অবস্থান অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। বাংলাদেশ শুধু যে, একদিকে পশ্চিমে এশিয়া ও দক্ষিণ এশিয়া এবং অন্যদিকে পূর্ব দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মাঝখানে অবস্থিত তাই নয়, এই শতাব্দীতে যে ভারত মহাসাগরে বৃহৎ ক্ষমতাসমূহের শক্তি প্রদর্শনের মহড়া হবে সেই ভারত মহাসাগরের উপকণ্ঠে বঙ্গোপসাগরের উপকূলে অবস্থিত। এখন গুরুত্বপূর্ণ কৌশলগত অবস্থানের অধিকারী বাংলাদেশ সুচিন্তিত ও সুপরিকল্পিত পররাষ্ট্র ও প্রতিরক্ষানীতি অনুসরণে ব্যর্থ হলে হয় পড়বে বিরাট কুমিরের পেটে, না হয় হবে ক্ষুধার্ত অজগরের সহজ শিকার। ডাঙ্গায় অজগর এবং পানিতে কুমির কোনোটিই নিরাপত্তার জন্য গ্রহণযোগ্য নয়। বাংলাদেশের অবস্থানের গুরুত্ব সম্পর্কে প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান নিজেই লিখেছেন. তাঁর 'আমাদের পথ' শীর্ষক নিবন্ধে : 'বাংলাদেশ এ উপমহাদেশে ও এ অঞ্চলের সামরিক ও রাজনৈতিক কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থান করছে। এর উত্তরে সুউচ্চ হিমালয় পর্বত আর দক্ষিণে গভীর বঙ্গোপসাগর। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সঙ্গে পশ্চিম এশিয়ার যোগসূত্র স্থাপন করে রেখেছে বাংলাদেশ তার আপন বৈচিত্র্য দিয়ে। তাই বাংলাদেশ নামক ভূখণ্ডটিতে অতীতে অনেক উত্থান-পতন ঘটে গেছে। হাজার হাজার বছরের পটপরিবর্তনের ইতিহাসকে বুকে ধারণ করে আছে বাংলাদেশ।'

www.pathagar.com

অতীতে অনেক উত্থান-পতন ঘটে গেছে। হাজার হাজার বছরের পটপরিবর্তনের ইতিহাসকে বুকে ধারণ করে আছে বাংলাদেশ।'

বাংলাদেশ শাসন-প্রশাসনের দায়িত্ব তাঁর ওপর ন্যস্ত হলে তাই তিনি সযত্নে জাতীয় স্বার্থকে সংরক্ষণের জন্য অত্যন্ত ধীরগতিতে অথচ সুপরিকল্পিত পদক্ষেপের মাধ্যমে অগ্রসর হতে থাকেন। বাংলাদেশের জন্মের ইতিহাস ভারত বা পাকিস্তানের ইতিহাসের মতো নয়। ভারত ও পাকিস্তানের জন্ম হয়েছে কনফারেন্স টেবিলে, তীক্ষ্ণধার যুক্তি-বুদ্ধির ফলে। বাংলাদেশের জন্ম হয়েছে রক্তাক্ত যুদ্ধক্ষেত্রে, তীক্ষ্ণধার মারণাস্ত্রের প্রভাবে। তাই বাংলাদেশের গন্তব্য যে ভারত ও পাকিস্তান থেকে ভিন্ন তা অন্য কেউ না হলেও প্রেসিডেন্ট জিয়া অনুধাবন করেছেন সর্বাগ্রে। ভারতের মতো আধিপত্যবাদী না হয়ে এবং পাকিস্তানের মতো যুদ্ধোন্মাদনায় ভেসে না গিয়ে বাংলাদেশকে যেতে হবে হাজারযোজন শান্তির পথে, ছুটতে হবে তীরগতিতে উন্নত জীবনের অভিযাত্রায়, অর্থনৈতিক অগ্রগতি অর্জনের লক্ষ্যে বন্ধুর পথে, গণতান্ত্রিক জীবনবোধের অন্বেষণে গভীর অনিশ্চয়তার মধ্যেও। তাই স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্য বাংলাদেশের সহজাত বৈশিষ্ট্য। কোনো জোটে আবদ্ধ না হয়ে সব সময় বিবেকের বাণীকে মাথায় রেখে, মুক্তচিন্তাকে মূলধন করে বাংলাদেশকে বিস্তৃত হতে হবে বিশ্বময়। এই অনুধাবনকে গ্রহণযোগ্য মনে করে প্রেসিডেন্ট জিয়া কোনো রাষ্ট্র অথবা রাষ্ট্রীয় জোটের ওপর নির্ভরশীল না হয়ে বাংলাদেশের জন্য সূচিত করেন তাঁর নতুন পররাষ্ট্রনীতি। এই নীতির আলোকেই তিনি ইন্দো-সোভিয়েত কক্ষপথ থেকে বাংলাদেশকে মুক্ত করে বিশ্বজনীন করে তোলেন। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের অন্দরমহলে বাংলাদেশকে গ্রহণযোগ্য করে তুললেন। একদিকে মুসলিম বিশ্ব, অন্যদিকে কনফুসিয়ান ও বৌদ্ধ জাপানের কাছাকাছি নিয়ে গেলেন বাংলাদেশকে। যে ভারত জিয়াউর রহমানের বিরোধিতা করেছিল সেই ভারত এক পর্যায়ে রূপান্তরিত হয় বাংলাদেশের অকৃত্রিম বন্ধুত্বে। মোট কথা, মাত্র ক'বছরের মধ্যে যে বাংলাদেশ ছিল বিশ্ব পরিমণ্ডলে বন্ধুবিহীন, নিঃসঙ্গ, একাকী প্রেসিডেন্ট জিয়ার সৃজনশীল পররাষ্ট্রনীতির বদৌলতে সেই বাংলাদেশ অল্পদিনের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয় এক সম্মানজনক অবস্থানে। জাতিসংঘে সুদৃঢ় হয় তাদের মর্যাদা। নিরাপত্তা পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হয় বাংলাদেশ। ইরাক-ইরান যুদ্ধের অন্যতম মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকায় মনোনীত হন প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান।

আজকে বাংলাদেশের চারপাশে বিশ্বরাজনীতির প্রভাবশালী অ্যাক্টরগণ নিজেদের প্রভাববলয় সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে ব্যস্ত রয়েছেন নিজেদের সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা মাথায় রেখে। বাংলাদেশকে নিজের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখার জন্য, বিশেষ করে তার সঠিক গন্তব্যে পৌছবার জন্য, তাই প্রয়োজন অত্যন্ত সুচিন্তিত ও সুপরিকল্পিত পদক্ষেপ। তাই প্রয়োজন প্রেসিডেন্ট জিয়ার সৃষ্টিশীল প্রয়াস। তাঁর সৃজনশীল পররাষ্ট্রনীতির যেসব উপাদান-**এক.** জাতীয় ঐক্য; **দুই.** আঞ্চলিক সহযোগিতা; **তিন.** বিশ্বময় বিস্তৃত হবার উদ্যোগ–তা কি স্মরণে রেখেছেন আজকের পররাষ্ট্রনীতির ব্যবস্থাপকরা? স্মরণে না রাখলে অন্তত আজকের দিনে ভাবুন সেসব কথা! সেই পরীক্ষিত পথ অনুসরণে কৃতসংকল্প হোন।

www.pathagar.com

এদেশে এখন সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন জিয়াউর রহমানের

আজকের বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন রাষ্ট্রনায়ক জিয়াউর রহমানের। সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন তাঁর সততার, তাঁর সঠিক দিক-নির্দেশনার, জনগণের প্রতি তাঁর সহমর্মিতার। আজকে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন সুশাসনের প্রতি তাঁর আসক্তির। সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন আইনের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধার। আইনানুগ সমাজ গঠনে তাঁর একনিষ্ঠতার। প্রয়োজন আজকে দুর্নীতির প্রতি তাঁর তীব্র ঘৃণার। দুর্নীতির পঙ্কিল পথ থেকে সমাজটাকে উদ্ধার করে সততার দুর্গে পুনঃস্থাপনে তাঁর দৃঢ় অঙ্গীকারের। আজকের বাংলাদেশে এসবেরই প্রয়োজন সবচেয়ে বেশি। তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের প্রকৃষ্ট পন্থা হল তিনি যেভাবে এবং যে প্রক্রিয়ায় মাত্র পাঁচ বছরে দেশটার চেহারা পাল্টে দিতে সক্ষম হয়েছিলেন, সেসব গুণপনার অনুশীলনের এবং সেসব প্রক্রিয়ার চর্চাকে রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দুতে টেনে আনার। পারবেন কি তাঁর শিষ্য-সাগরেদরা গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে বলতে যে, অনেক হয়েছে আর নয়। আমরা চাই রাষ্ট্রনায়ক জিয়ার নেতৃত্ব। আমরা চাই তাঁর সততার সেই পুরনো অধ্যায়। আমরা চাই দুর্নীতির মূলোচ্ছেদ করার তাঁর সেই দৃপ্ত অঙ্গীকার। আমরা চাই সুশাসন। আমরা চাই স্বশাসন। আমরা চাই এগিয়ে যাবার পথে তাঁর সৃষ্ট শান্তিপূর্ণ পরিবেশ। আমরা চাই তাঁর সৃজনশীল নেতৃত্বের আশীর্বাদ।

ভক্তদের মনে সৃষ্টিকর্তার আশীর্বাদের কথা স্মরণ করিয়ে দেবার লক্ষ্যে সম্ভবত ওয়েস্টমিনস্টার চাইমসে (Westminster Chimes) ক'টি লাইন উৎকীর্ণ হয়েছে।

" হে প্রভু, এই মুহূর্ত থেকে
তুমি আমাদের পথ প্রদর্শক হও,
যেন তোমার ক্ষমতার জোরে
আমাদের পা পিছলে না যায়।"

["Lord, through this hour
Be Thou our Guide,
So by Thy power
No foot shall slide"]

আল্লাহ তায়ালাকে স্মরণে রেখে এবং মহান নেতা জিয়ার স্মৃতিকে ধারণ করে একই সুরে আমরাও চারদিকে সেই আওয়াজ ধ্বনি শুনতে চাই :

হে পথ প্রদর্শক, তুমি আবারো হও আমাদের পরিচালক।

তোমার স্মৃতি আমাদের পিচ্ছিল পথে চলার নতুন সাহস যোগাক।

www.pathagar.com

গভীর সংকটকালে জিয়াউর রহমানের উপর শাসন ক্ষমতা অর্পিত হয়। তখন দেশে কোনো সুসংগঠিত রাজনৈতিক দল ছিল না। ছিল না সুসংহত আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী। সামরিক বাহিনীও ছিল খণ্ডছিন্ন। মুক্তিযুদ্ধ সমাপ্ত হলে একাত্তরের শেষ দিকে দেশে ফেরার পূর্বেই প্রবাসী সরকার ডানপন্থী দলগুলিকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। পঁচাত্তরে বাকশাল গঠনের পূর্বে বিদ্যমান সকল রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়। ১৫ আগস্টের পরে বাকশালেরও সমাপ্তি ঘটে। অন্য কথায়, জিয়াউর রহমান যখন দায়িত্ব গ্রহণ করেন তখন দেশে কোনো রাজনৈতিক দল অক্ষত ছিল না। অন্যপক্ষে, দেশে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার জন্যে পুলিশ ও প্যারা-মিলিটারী বাহিনী তখনো সুসংহত ও সুশৃঙ্খল হয়ে ওঠেনি। মুক্তিযুদ্ধে অনেকে শহীদ হয়েছিলেন। নতুন রাষ্ট্রের প্রয়োজন মিটানোর জন্যে নতুনভাবে এই বাহিনীকে গড়ে তোলার কোনো সার্থক ব্যবস্থা তখনো গৃহীত হয়নি। সামরিক বাহিনী তখন ছিল অন্ততপক্ষে চারভাগে বিভক্ত। এক গ্রুপ দেশে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার স্বপ্নে ছিল বিভোর। অন্য গ্রুপের লক্ষ্য ইসলামিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা। আর একটি গ্রুপের লক্ষ্য ছিল রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যম। এমনি করুণ অবস্থায় তিনি দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

যেকোনো জনপদে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্যে বিদ্যমান থাকে তিনটি নিয়ন্ত্রণকারী চ্যানেল। যেখানে রাজনৈতিক দল বিদ্যমান থাকে সেখানে দলই হয় নিয়ন্ত্রণ ও নির্দেশ দানের প্রথম প্রধান চ্যানেল। রাজনৈতিক দলের কর্তৃত্ব দুর্বল হলে পুলিশ বাহিনীর হাতে এই দায়িত্ব এসে পড়ে। পরিস্থিতি আরো জটিল হলে সামরিক বাহিনীর সরকারের সাহায্যে এগিয়ে আসে এইড টু সিভিল এডমিনিস্ট্রেশনে (Aid to civil admistration) ফরম্যাটে। ১৯৭৫ সালের শেষ পর্যায়ে বাংলাদেশে কোনোটি তেমন কার্যকর ছিল না। কিন্তু তখনকার অবস্থা পর্যালোচনা করে দেখুন ১৯৭২-৭৫ সময়কালে দেশে আইন-শৃঙ্খলার যে বেহাল অবস্থা ছিল, ১৯৭৫ সালের পরে তা কত সহজে নিয়ন্ত্রিত হয়। চুরি-ডাকাতি, ছিনতাই-রাহাজনি, চাঁদাবাজি, খুন-জখম-ধর্ষণ কত সহজে নিয়ন্ত্রণে আসে এবং কত অল্প সময়ে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে আসে। পুলিশ বাহিনীকে নতুনভাবে মটিভেট করা হয়। প্যারা-মিলিটারী বিডিআরকে সীমান্ত রক্ষায় নতুনভাবে উদ্বুদ্ধ করা হয়। সামরিক বাহিনীতে ঐক্য ফিরে আসে। আরো পরে রাজনৈতিক দল গঠিত হয়। সবকিছুর ঊর্ধ্বে কিন্তু ছিল প্রেসিডেন্ট জিয়ার মেধাবী ও সহৃদয় নেতৃত্ব।

তাঁর অনুধাবনে বিন্দুমাত্র অসুবিধা হয়নি যে, আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতিকে স্বাভাবিক করাই হল যেকোনো রাষ্ট্রের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ। এটি হল রাষ্ট্রের আদিমতম দায়িত্ব। যে কারণে রাষ্ট্রের জন্ম হয়েছে তার সবচেয়ে প্রধান হল আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা। তাই তিনি পুলিশ বাহিনী বৃদ্ধি এবং সমৃদ্ধির মাধ্যমে এর সূচনা করেন এবং নিজেই এর তদারকির দায়িত্ব গ্রহণ করেন। দেশের বিভিন্ন ইনটেলিজেন্স এজেন্সিগুলিকে তৎপর করে, প্রশাসকদের এই বিষয়ে সজাগ রেখে, এবং প্রতিনিয়ত পরিস্থিতি মনিটরিং এর মাধ্যমে প্রায় অসম্ভব বলে তখন যা মনে হত সেই অসম্ভবকে তিনি সম্ভব করেন। অনেকে তাঁর কাছাকাছি থেকে তখন লক্ষ্য করেছেন, রাত্রি ১২টা থেকে সকাল ২টা পর্যন্ত তিনি নিজে কথা বলতেন বিভিন্ন জেলার জেলা প্রশাসক এবং পুলিশের

www.pathagar.com

শীর্ষস্থানীয় কর্মকর্তাদের সাথে। জানতে চাইতেন দূরবর্তী জেলাসমূহে জনগণ শান্তিতে ঘুমোতে পারছেন কি না। একজন জেলা প্রশাসক বা জেলার এসপি যখন রাত্রি একটার দিকে স্বয়ং রাষ্ট্রপ্রধানের কণ্ঠস্বর শুনতে পান সেই জেলায় অপরাধের বিস্তৃতি হয় কীভাবে? তাছাড়া নিজস্ব উৎস থেকেও তিনি বিভিন্ন ধরনের তথ্য সংগ্রহ করতেন এবং এসব বিষয়ে প্রশাসকদের সাথে মত বিনিময় করতেন। নির্দেশ দিতেন কীভাবে অপরাধ নির্মূল করতে হবে। এভাবে দায়িত্ব গ্রহণের মাত্র বছর খানেকের মধ্যে দেশে অপরাধের মাত্রা কমে আসে অকল্পনীয়ভাবে। তাছাড়া, ১৯৭৭ সালের পর থেকে যখন তিনি দেশের বিভিন্ন স্থানে সফর করা শুরু করেন, কোনো কোনো স্থানে অকস্মাৎ উপস্থিত হয়ে খবরাখবর নেয়া শুরু করেন, তখন থেকে আইন-শৃঙ্খলার অবস্থা আরো উন্নত হয়ে ওঠে। যে ব্যুরোক্র্যাসী স্থবির বলে জনপ্রিয়তা হারিয়েছিল তাও প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে আশাতীতভাবে, মাত্র বছর খানেকের তদারকির ফলে।

নব্য সিঙ্গাপুরের রচয়িতা লি কুয়ান ইউকে (Lee Kuan Yew) ফিলিপিনসের এক আলোচনা সভায় জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল : "আপনি অবসর সময় কাটান কীভাবে?" তিনি উত্তর দিয়েছিলেন : "এমনিতেই আমার অবসর খুব কম, তবু যেটুকু অবসর পাই তার শতকরা ৩০ ভাগ কাটাই 'হেড হান্ট' ('Head Hunt) হেড হান্ট শব্দ দুটির ব্যাখ্যা করে তিনি বলেন, অন্যান্য উপনিবেশের মতোই সিঙ্গাপুর ও মালয়েশিয়া ছিল ভীষণভাবে দুর্নীতিগ্রস্ত। দেশে সৎ, দক্ষ, কর্মঠ লোকেরও অভাব ছিল না। এই সব সৎ, দক্ষ ও বিশেষজ্ঞদের খুঁজে বের করে যথাস্থানে তাদের বসানো অর্থে 'হেড হান্ট' শব্দ দুটি আমি ব্যবহার করেছি। এমন কিছু যোগ্য ব্যক্তি দেশে রয়েছেন যারা মোসাহেবী না করে, যে কথা শুনে আমি খুশি হব তা না বলে সত্য কথনে অভ্যস্ত, শুধুমাত্র অনুগত না হয়ে সঠিক তথ্য দানে নির্ভীক, সেই সব ব্যক্তিদের সেবা সিঙ্গাপুরের জন্যে অপরিহার্য করে তুলি। এদিক থেকে বিবেচনা করলে প্রেসিডেন্ট জিয়াকে সিঙ্গাপুরের লি কুয়ান ইউ এর সাথে তুলনা করা যথার্থ। তিনি যে সকল উপদেষ্টা নিয়োগ দিয়েছিলেন এবং পরবর্তীতে যে সকল মন্ত্রী নিয়োগ করেন তাদের দিকে দৃষ্টি দিলেই চলবে। আনুগত্যকে সবাই পছন্দ করেন, কিন্তু অনুগত শুধু দয়ার পাত্র। কোনো কঠিন দায়িত্ব পালন তাদের পক্ষে সম্ভব হয় না। তাই তিনি প্রেসিডেন্টের মুখের উপরে তাঁর ভুল যারা ধরিয়ে দিতে পারেন তাদেরকেই বেশি পছন্দ করতেন। এভাবেই তিনি তাঁর শাসনব্যবস্থাকে সাজিয়েছিলেন।

সিদ্ধান্ত গ্রহণ ক্ষেত্রে তাঁর ছিল অপরিসীম দক্ষতা। কোনো একটি বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার ক্ষেত্রে তিনি নিজে ভাবতেন। ভিন্ন মতের কিছু ব্যক্তির সাথে কথা বলতেন ফাঁকে ফাঁকে। তারপর অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সাথে সিদ্ধান্তে উপনীত হতেন। কোনো কোনো সময়ে তিনি ঐ স্থানেই (On the spot) তাঁর সিদ্ধান্ত ঘোষণা করতেন। সিদ্ধান্ত হীনতার অভিযোগ তাঁর বিরুদ্ধে তাঁর শত্রুরাও কোনো সময়ে উত্থাপনের সাহস পায়নি। হাজারো সমস্যার দেশে যেখানে প্রতিনিয়ত অসংখ্য সমস্যা ফণা উদ্যত করে রয়েছে সেখানে দিনের পর দিন মাসের পর মাস ধরে সিদ্ধান্তের জন্যে অফিস ফাইলে তা দিতে থাকলে সমস্যা যে শুধু জটিল থেকে জটিলতর হয়ে ওঠে তাই নয়, একটি সমস্যা

www.pathagar.com

হাজারে রূপান্তরিত হয়। এই সত্য তিনি অনুধাবন করেছিলেন সঠিকভাবে। তাই যেমন তড়িৎ গতিতে চারদিকে দেখে শুনে ব্যবস্থা গ্রহণ করতেন, তেমনি বিভিন্ন কার্যালয়ে কর্মরত উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের প্রতিও তাঁর নির্দেশ ছিল–সমস্যার পরিধি যেন আরো বিস্তৃত না হয় সেই লক্ষ্যে অতি সত্বর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করুন।

মনেপ্রাণে একজন গণতান্ত্রিক ব্যক্তিত্ব জিয়াউর রহমান অনুধাবন করেছেন, সিদ্ধান্ত গ্রহণের কেন্দ্রবিন্দু রাষ্ট্রপতির সচিবালয় বা প্রধানমন্ত্রীর সচিবালয় হতে পারে না। সমস্যা যেমন ছিটিয়ে ছড়িয়ে রয়েছে জাতীয় জীবনের সর্বত্র, সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রও সম্প্রসারিত হতে হবে দেশের সর্বত্র, বিশেষ করে সকল মন্ত্রণালয়ে। যোগ্যতর ব্যক্তিদের হাতে ন্যস্ত থাকবে মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব এবং তারাই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন। রাষ্ট্রপতি বা প্রধানমন্ত্রীর প্রধান কাজ বিভিন্ন পর্যায়ে সমন্বয় সাধন। তার বেশি কিছু নয়। গণতন্ত্রের আকাশে একক চন্দ্রের কোনো সুযোগ নেই। অসংখ্য তারকারজি শোভিত আকাশ হল গণতন্ত্রের। সমস্যা সমাধানই বলুন আর সিদ্ধান্ত গ্রহণই বলুন, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় কারো কোনো-একক আধিপত্যের স্থান নেই। এই সত্য অনুধাবনের জন্যেই জাতীয় নেতা জিয়াউর রহমান হতে পেরেছিলেন জাতীয় সম্পদ।

যে জনপদে জিয়াউর রহমানের মতো জাতীয় নেতা রাষ্ট্র পরিচালনা করেছিলেন, আমাদের চরম দুর্ভাগ্য, সেই জনপদ আজ দুর্নীতি কবলিত। একবার নয়, গত চার বছর ধরে বাংলাদেশ দুর্নীতিপরায়ণ দেশ হিসেবে বিশ্বে শীর্ষস্থানীয় রয়েছে। এ যে কত বড় জাতীয় অপমান জিয়ার অনুসারীরা একবার যদি অনুভব করতেন। অথচ প্রেসিডেন্ট জিয়া সবচেয়ে বেশি ঘৃণা করতেন দুর্নীতিকে। তাঁর জীবদ্দশায় দুর্নীতি বাংলাদেশকে স্পর্শ করার সাহস পায়নি। তিনি দুর্নীতির শত ছিদ্র বন্ধ করেছিলেন। দুর্নীতি যেন জাতীয় অর্জনকে গ্রাস করতে না পারে সেজন্যে তিনি ছিলেন সদা জাগ্রত। এই সত্য তাঁর নিয়ন্ত্রণে ছিল যে, রাষ্ট্রপ্রধান যদি নির্মল থাকেন, যদি তাঁর চারপাশ দুর্নীতিমুক্ত থাকে, যদি তাঁর আত্মীয়-স্বজন ও অনুসারীরা দুর্নীতি কবলিত না হয়, তাহলে সমগ্র রাজনৈতিক সমাজকে দুর্নীতিমুক্ত রাখা সম্ভব। তাঁর সততা সম্পর্কে অনেক গল্প প্রচলিত রয়েছে। কোনো কোনো নিকট আত্মীয়কে তিনি তাঁর বাসভবনে প্রবেশেও নিষেধাজ্ঞা জারি করেন। সরকারি গাড়ি তিনি নিজের সন্তানদের পর্যন্ত ব্যবহারের অযোগ্য ঘোষণা করেন। আত্মীয়ের বাড়ি থেকে যেন কখনো খাবার না আসে সে বিষয়েও তিনি সচেতন ছিলেন। লক্ষ্য একটাই এবং তা ছিল বাংলাদেশের শাসনব্যবস্থাকে তিনি যেন দুর্নীতিমুক্ত রাখতে পারেন। এও সত্য, তাঁর সবচেয়ে শত্রুও তাঁর বিরুদ্ধে এই অপবাদ আজও উত্থাপনে অপারগ। অথচ আজকের বাংলাদেশ বিশ্বে দুর্নীতিতে শীর্ষস্থান অধিকার করেছে।

এই মহান জাতীয় নেতার প্রতি শ্রদ্ধা জানাবার সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা হল তিনি যা চেয়েছিলেন তার দিকে দৃষ্টি রেখে পথ চলা। তিনি যা করেছিলেন তাকে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করে সেভাবে দায়িত্ব পালন করা। তিনি যে স্বপ্ন দেখতেন তাকে সযত্নে ধারণ করা। তিনি যেভাবে দেশ জনতার সাথে একাত্মতা স্থাপন করে জনকল্যাণে ব্রতী

www.pathagar.com

হয়েছিলেন তাকে কাম্য পদক্ষেপ হিসেবে গ্রহণ করা। জুনিয়াস (Junius) কর্তৃক লিখিত কয়েকটি লাইন এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য :

"একটি দৃষ্টান্ত আর একটির জন্ম দেয়।
সেগুলি একত্রিত হয়ে আইনে পরিণত হয়।
গতকাল যা ঘটনা ছিল, আজকে তা তত্ত্বে রূপান্তরিত"।
["One precedent creates another.
They soon accumulate and constitute law.
What yesterday was fact, today is doctrine."]

আমাদের পরম দুর্ভাগ্য, জিয়াউর রহমানের মতো জাতীয় নেতার অনুসারী হয়েও দেশটাকে আমরা তাঁর স্বপ্নের দেশরূপে সাজাতে ব্যর্থ হয়েছি। তাঁর দৃষ্টান্তও তাঁর অনুসারীদের নিকট আইন হয়ে ওঠেনি। গতকালের উজ্জ্বল দিনকে আজ তারা অন্ধকারাচ্ছন্ন করে তুলেছেন। গতকালের ঘটনাকে আজকের দিনের পাথেয় হিসেবে কোনো তত্ত্বে রূপদান করতে ব্যর্থ হয়েছি সবাই। রাজনীতির এই ক্রান্তি লগ্নে তাই আমরা মনে করি এখন এদেশে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন জিয়াউর রহমানের।

www.pathagar.com

প্রেসিডেন্ট জিয়ার আন্তর্জাতিক সম্পর্ক

একটি ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের সমস্যা বিশ্লেষণ করতে গিয়ে সুইডেনের নিরাপত্তা বিশারদ আর্লিং বিওল (Earling Biol) বলেছেন : "রাষ্ট্রের সমস্যা অনেকটা পাইলট মাছের সমস্যার মতো, হাঙরের কাছাকাছি থেকেও কীভাবে তার মুখে না পড়ার কৌশল।" ["The Rim state's problem is like the Problem of a pilot fish, how to keep close to the shark without being eaten up."] ভারতের মতো বিরাট শক্তিধরের কাছাকাছি থেকে পাইলট মাছের মতো ক্ষুদ্রাকৃতি অথচ নিরীহ বাংলাদেশ কীভাবে নিজের সার্বভৌমত্ব রক্ষা করবে বাংলাদেশের নিরাপত্তা সমস্যার প্রকৃতি এটিই। বাংলাদেশী প্রতীকে বলা যায়, বিপুলায়তন ভারতীয় বোয়াল মাছের কাছাকাছি ক্ষুদ্র পাবদা মাছের নিরাপত্তার কৌশল। খুব কাছেও যাওয়া যাবে না, কেননা তখন ক্ষুধার্ত বোয়ালের পেটে পড়তে হবে। অন্যদিকে খুব দূরেও থাকা সম্ভব নয়, কেননা বোয়ালটি কখন কী করে, কোন দিকে বাঁক ফেরে তাও জানা দরকার। এ দুইয়ের সাম্যাবস্থাই বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা নীতি। জিয়াউর রহমানের কৃতিত্ব এই যে, তিনি দুইয়ের মধ্যে সাম্যাবস্থা সৃষ্টির কৌশলটি পুরোপুরি আয়ত্ত করতে পেরেছিলেন।

একজন নিরাপত্তা বিশারদ হিসেবে জেনারেল জিয়া অনুধাবন করেন যে, **এক.** ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের সুসম্পর্ক স্থাপন করতে হবে, কিন্তু এই সুসম্পর্ক হতে হবে সম-সার্বভৌমত্বের ভিত্তিতে, আধিপত্য ও অধীনতার (dominance and dependence) কাঠামোয় নয়। **দুই.** ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের সুসম্পর্ককে স্থিতিশীল করার জন্য প্রয়োজন হবে আঞ্চলিক রাষ্ট্রগুলোকে সহযোগিতার স্বর্ণসূত্রে আবদ্ধ করা এবং এই সহযোগিতার ক্ষেত্র শুধু রাজনৈতিক নয়, সঙ্গে সঙ্গে অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, বুদ্ধিবৃত্তিসহ তথ্যপ্রবাহ ও অন্যান্য ক্ষেত্র। **তিন.** বাংলাদেশের মতো ক্ষুদ্র পাবদা মাছটিকে শুধু শক্তিশালী হলেই চলবে না, তাকে ক্ষিপ্রগতিসম্পন্নও হতে হবে। **চার.** সঙ্গে সঙ্গে এও তিনি অনুধাবন করেন যে, সঙ্কটকালে সাহায্য-সহযোগিতার হস্ত প্রসারিত করতে পারে এমন অকৃত্রিম, আদর্শিক দিক থেকে সমমনা এবং সম-স্বার্থের কিছু বান্ধব সৃষ্টি করাও অপরিহার্য। অন্য কথায়, আন্তর্জাতিক সম্পর্কের বহুমুখীকরণও ছিল এর অন্যতম উপাদান। জিয়াউর রহমানের পররাষ্ট্রনীতি এই চারটি সূত্রের বন্ধনীতেই আবদ্ধ ছিল।

সঙ্গে সঙ্গে তিনি একজন সফল রাজনীতিক হিসেবে এই সত্যও অনুধাবন করেন যে, বাংলাদেশের জনগণই বাংলাদেশের নিরাপত্তার সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান ঘাঁটি। জাতীয় ঐক্য হল জাতীয় নিরাপত্তার দুর্ভেদ্য দুর্গ। এই দুর্গ সুরক্ষিত থাকলে বৈরি শক্তি যতই প্রবল হোক না কেন, জাতীয় নিরাপত্তা সুরক্ষিত থাকবে। তাই তিনি জাতীয় নিরাপত্তা

www.pathagar.com

ও পররাষ্ট্রনীতি নির্ধারণের যে মৌল স্তম্ভ অভ্যন্তরীণ পরিবেশ, সেদিকে প্রথমে মনোনিবেশ করেন। একজন শ্রেষ্ঠ মুক্তিযোদ্ধারূপে এবং জেড ফোর্সের সংগঠক হিসেবে তিনি প্রতিনিয়ত লক্ষ্য করেছেন, একটি ঐক্যবদ্ধ জাতি কীভাবে অসম্ভবকে সম্ভব করে তোলে। যুদ্ধকালে কিছু বিপথগাগী পাকিস্তানপন্থী কিছু সমস্যা সৃষ্টি করেছিল বটে। কিন্তু সুদৃঢ় জাতীয় ঐক্যের মুখে সব প্রতিবন্ধকতা কর্পুরের মতো উবে গিয়েছিল। জাতীয় ঐক্য যে জাতীয় নিরাপত্তার প্রাণশক্তি এই বিশ্বাস তাকে এই পদক্ষেপ গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করে।

এই লক্ষ্যে তিনি বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। **এক.** তিনি আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি কঠোর হস্তে নিয়ন্ত্রণ করে সর্বপ্রথম জনগণের আস্থা অর্জন করেন। **দুই.** দল, মত ও বিশ্বাস নির্বিশেষে জনগণের কাছে গ্রহণযোগ্য ব্যক্তিদের চিহ্নিত করে তাদের মাধ্যমে জনগণের কাছে তার বক্তব্য উপস্থাপন করেন। **তিন.** আদর্শিক সংঘাতে বিভক্ত ১৯৭২-৭৫ সময়কালের সামাজিক শক্তিগুলোকে সংহত এবং ঐক্যবদ্ধ করেন। এ প্রসঙ্গে এটিও উল্লেখযোগ্য যে, তিনি তার শাসনকে দল-নিরপেক্ষ এবং সবার কাছে গ্রহণযোগ্য করার প্রয়াস গ্রহণ করেন। **চার.** তখন তিনি বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বি.এন.পি) গঠন করেন, তখনো 'উদার হস্ত' (Open arm) নীতির মাধ্যমে ডান থেকে, কেন্দ্র থেকে, এমনকি বামপন্থীদেরও নেতা-কর্মীরূপে বাছাই করে একটি জাতীয় দলের আদলে নিজের দলকে সমগ্র জাতির কাছে উপস্থাপন করেন। **পাঁচ.** দেশে বিদ্যমান অর্ধ শতাধিক উপজাতীয় জনগোষ্ঠী যেন বাংলাদেশের রাজনীতির মূল স্রোতে ফিরে এসে একাত্মতা অনুভব করতে পারেন সেই লক্ষ্যে শুধু ভাষাভিত্তিক সংকীর্ণ বাঙালি জাতীয়তাবাদের পরিবর্তে ভাষা, সংস্কৃতি, ইতিহাস ও অঞ্চলভিত্তিক বাংলাদেশ জাতীয়তবাদের নতুন সত্য সবার সামনে তুলে ধরেন। ফলে ১৯৭৬-৮১ সময়কালে বাংলাদেশ সমাজে যে ঐক্যবোধ সৃষ্টি হয় তা অভূতপূর্ব। এই জাতীয় সংহতি তার সাফল্যের অন্যতম চাবিকাঠি। এই ঐক্যবোধ সৃষ্টির জন্য তিনি তার লক্ষ্যে সফল হয়েছিলেন।

জাতীয় সংহতি সুদৃঢ় করার পরে তিনি দুই পর্যায়ে বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক নির্ধারণে অগ্রসর হন। আঞ্চলিক পর্যায়ে দক্ষিণ এশিয়ার সব কটি দেশ–ভারত, পাকিস্তান, নেপাল, ভুটান, শ্রীলঙ্কা সফর করেন এবং পরবর্তী পর্যায়ে উষ্ণ কূটনীতির মাধ্যমে সব দেশের রাষ্ট্রনায়কদের মনে এই বিশ্বাস সৃষ্টি করতে সক্ষম হন যে, বাংলাদেশ শান্তির পক্ষে, সহযোগিতার পক্ষে, অগ্রগতি ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির পক্ষে। প্রেসিডেন্ট হিসেবে জিয়ার বক্তব্যে তখন নেপাল, ভুটান, শ্রীলঙ্কা, মালদ্বীপের মতো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্র নিজেদের ভাবনা-চিন্তা, নিজেদের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন দেখতে পেল। এমনকি ভারত ও পাকিস্তানের শাসকগণও দক্ষিণ এশীয় অগ্রগতির ক্ষেত্রে প্রেসিডেন্ট জিয়ার বক্তব্যে দেখতে পান তাদেরই অভিপ্রায়, তাদেরই উচ্চাকাঙ্ক্ষা, তাদেরই দূরদৃষ্টি। ১৯৭৭ সালের ২৭ ডিসেম্বরে প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান ভারত সফরে গেলে তার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে ভারতের রাষ্ট্রপতি নীলম সঞ্জীব রেড্ডি তার সম্মানে আয়োজিত ভোজসভায় বলেছিলেন, "একজন সাহসী মুক্তিযোদ্ধা এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতার

www.pathagar.com

প্রথম ঘোষণা দানকারী হিসেবে আপনার মর্যাদা এরই মধ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত। ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার পরে জাতীয় অগ্রগতি এবং জনকল্যাণে নিবেদিত একজন জননেতা হিসেবে বাংলাদেশে ও বাংলাদেশের বাইরে আপনি গভীর শ্রদ্ধা অর্জন করেছেন।" ["Your position is already assured in the annals of the history of your country as a brave fighter who was the first to declare the Independence of Bangladesh. Since you took over the reins of government in your country, you have earned wide respect both in Bangladesh and abroad as a leader dedicated to the progress of your country and the well-being of your people."]

এভাবে হাজার বছরের জমাট বাঁধা অবিশ্বাস, সন্দেহ এবং আস্থাহীনতার ঘন অন্ধকারে প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান সর্বপ্রথম বিশ্বাস ও আস্থার প্রদীপটি জ্বালিয়েছিলেন। সেই পথ ধরেই ১৯৮৫ সালের ৭/৮ ডিসেম্বর ঢাকায় রচিত হয় দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সহযোগিতার (SAARC) সৌধটি। এক্ষেত্রে এও উল্লেখযোগ্য যে, প্রেসিডেন্ট জিয়ার আমলে (প্রথম বছরটি ছাড়া) ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক ছিল অত্যন্ত সৌহার্যপূর্ণ। গঙ্গার পানি বণ্টন চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হয় ঢাকায়, ভারতের প্রধানমন্ত্রী মোরারজি দেশাই-এর প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপে।

আঞ্চলিক পর্যায়ে তিনি যে কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তা আরো উজ্জ্বল হয়ে ওঠে তার সৃজনশীল প্রতিভার স্পর্শে। তিনি যখন ক্ষমতাসীন হন তখন আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ছিল নিঃসঙ্গ, একাকী, বন্ধুহীন। ইন্দো-সোভিয়েত কক্ষপথ আবর্তিত বাংলাদেশ ছিল অনেকটা শ্রীহীন, ভারতের বর্ধিতাংশের মতোই। অপচয়প্রবণ তথাকথিত সমাজতন্ত্রের নিগড়ে বন্দী বাংলাদেশ হয়ে পড়েছিল, হেনরি কিসিঞ্জারের কথায়, এক তলাবিহীন ঝুড়ি। বাকশালের অপসৃষ্টির ফলে দেশ থেকে গণতন্ত্র হয় নির্বাসিত। প্রেসিডেন্ট জিয়া বাংলাদেশ থেকে সেই পীড়নমূলক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার অবসান ঘটিয়ে দেশে বহুদলীয় গণতন্ত্রের ক্ষেত্র রচনা করেন, বিশেষ করে বেসরকারি পর্যায়ে দেশী-বিদেশী উদ্যোক্তাদের বিনিয়োগে উৎসাহ দিয়ে। বেসরকারি ব্যাংক-বীমা ব্যবস্থা প্রর্বতন করে এবং ইন্দো-সোভিয়েত কক্ষপথ থেকে বাংলাদেশের গতিপথ পরিবর্তন করে বিশ্বময় বিস্তৃত হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি করেন। তখনকার অন্যতম পরাশক্তি যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের সঙ্গে হাজারো প্রকরণে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় সংশ্লিষ্ট হয়ে আবদ্ধ হয় বন্ধুত্বের দৃঢ় সূত্রে। আজকে বাংলাদেশের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের যে সম্পর্ক তার ভিত্তি রচিত হয় তখন। ইউরোপ তখন থেকে আগ্রহী হয় বাংলাদেশ সম্পর্কে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া এবং গতিশীল অর্থনীতির দূরপ্রাচ্য বন্ধুত্বের বার্তা নিয়ে বাংলাদেশের কাছাকাছি আসে তখন থেকেই। ছুটে আসে বিনিয়োগের ডালা সাজিয়ে। যে চীন এতদিন বাংলাদেশ থেকে মুখ ফিরিয়ে রেখেছিল সেই চীনের সঙ্গেও গড়ে ওঠে বাংলাদেশের হৃদ্যতা। ওই সময় থেকেই ৫৭টি রাষ্ট্রের সমন্বয়ে গড়া ইসলামী সম্মেলন সংস্থা (ওআইসি) তথা মুসলিম বিশ্ব বাংলাদেশের অকৃত্রিম মিত্রে পরিণত হয় জিয়াউর রহমানের রাষ্ট্রনায়কোচিত পদক্ষেপের জন্য। মুসলিম বিশ্বের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং

www.pathagar.com

মর্যাদাসম্পন্ন আল-কুদস কমিটির সদস্য হয় বাংলাদেশ। সৌদি আরব হয়ে ওঠে বাংলাদেশের অকৃত্রিম বন্ধু। আরাফাত ময়দানে সারি সারি রোপিত নিমগাছ এখনো সৌদি আরব-বাংলাদেশের মধ্যে গভীর সেতুবন্ধনের জীবন্ত সাক্ষ্য হয়ে রয়েছে। ইরাক-ইরান যুদ্ধাবস্থা নিরসনের দায়িত্ব আসে বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের ওপর। অন্যদিকে জাতিসংঘে বাংলাদেশের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। ১৯৭৮ সালে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে নির্বাচিত হয়ে আন্তর্জাতিক শান্তি রক্ষার পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনের সুযোগ লাভ করে। এখন শান্তিরক্ষী বাহিনীর মাধ্যমে বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশের নির্ভীক সেনানীরা যে ভূমিকা পালন করে চলেছেন তার সূচনা তখন থেকেই। এমনি পরিবেশে যে ভারত সব সময় বাংলাদেশকে 'তাদের সৃষ্টি' বলে দাবি করে উদাসীন থেকেছে বাংলাদেশের জাতীয় স্বার্থ ও জনস্বার্থ সম্পর্কে, জিয়ার সৃষ্টিশীল নেতৃত্বের সেই ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্ক 'আধিপত্য-অধীনতা' (dominance-dependence) কাঠামো ছাড়িয়ে সহযোগিতার শর্তে সূত্রে গ্রথিত হতে থাকে। উভয়ের সম্পর্ক হয়ে ওঠে পারস্পরিক শ্রদ্ধার, সাম্যের এবং সম-সার্বভৌমত্বের। ভারত হয় বাংলাদেশের অন্যতম নির্ভরযোগ্য মিত্র।

মোট কথা, একজন দূরদর্শী রাষ্ট্রনায়করূপে প্রেসিডেন্ট জিয়া জাতীয় পর্যায়ে যে সুষমনীতি নির্ধারণ করেন, তাই প্রতিফলিত হয়েছে আঞ্চলিক পর্যায়ে এবং আন্তর্জাতি ক্ষেত্রে। এসবের মূলে সার্বক্ষণিকভাবে কাজ করেছে জিয়ার এই বিশ্বাস যে, মুক্তিযুদ্ধের অনলকুণ্ড থেকে প্রাণ পাওয়া বাংলাদেশের রয়েছে এক ঐতিহাসিক গন্তব্য। রয়েছে তার স্বতন্ত্র ঠিকানা। বাংলাদেশ অন্যের এক ইঞ্চি ভূমির ওপর দখল কায়েম করতে চায় না। চায় না কিন্তু তার এক ইঞ্চি ভূমির ওপর অন্য কেউ দখলদারিত্ব প্রতিষ্ঠা করুক। বাংলাদেশের জনগণ কারো আধিপত্য যেমন মেনে নেবে না, তেমনি কারো ওপর আধিপত্য বিস্তার করে অন্যকে অধীন করতেও নারাজ। জনগণের এই ধ্যান-ধারণা ধারণ করেই জিয়াউর রহমান চেয়েছিলেন আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বাংলাদেশকে এক স্বাধীন সত্তারূপে বিকশিত হওয়ার ক্ষেত্র তৈরি করতে। এক সময় ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী লর্ড পামারস্টোন বলেছিলেন : ব্রিটেনের নেই কোনো স্থায়ী বন্ধু, নেই কোনো স্থায়ী শত্রুও। যা স্থায়ী তা হল ব্রিটেনের স্থায়ী স্বার্থ। প্রেসিডেন্ট জিয়ার তৈরি বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক সম্পর্কের জটিল জাল পর্যালোচনা করুন, সঙ্গে সঙ্গে মুক্তিযুদ্ধে তার গুরুত্বপূর্ণ অবদান স্মরণে রাখুন এবং বাংলাদেশের জনগণের চিন্তা-ভাবনা এবং রাজনৈতিক সচেতনতাকে পাশে রাখুন, দেখবেন, প্রায় আড়াই দশক আগের বাংলাদেশে যা ঘটেছিল তা এক কথায় ঐতিহাসিক। কোনো প্রাজ্ঞ নিরাপত্তা বিশারদ অথবা কোনো সৃজনশীল পররাষ্ট্রনীতি বিশেষজ্ঞ আজও এর কোনো বিকল্প উদ্ভাবনে অক্ষম। এই ক্ষেত্রেই জিয়ার সাফল্য।

www.pathagar.com

প্রেসিডেন্ট জিয়ার অন্তর্দৃষ্টি : বাংলাদেশের পূর্বমুখী নীতি

বাংলাদেশের পররাষ্ট্র নীতির ক্ষেত্রে পূর্বমুখী হওয়া অথবা পূর্বদিগন্তের উন্মোচন করা নতুন নয়, নয় বৈপবিক কোনো পদক্ষেপও। বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান, জনসমষ্টির সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য, বাংলাদেশের পশ্চিম, পূর্ব ও দক্ষিণ–পূর্বে অবস্থিত রাষ্ট্রসমূহের বিদ্যমান অর্থনৈতিক অবস্থা, জাতীয় নিরাপত্তার দাবি এবং অর্থনৈতিক অগ্রগতির জরুরি চাহিদার প্রেক্ষিতে বাংলাদেশের পূর্বমুখী নীতি স্বাভাবিক এবং কাঙ্ক্ষিতও বটে।

কাঙ্ক্ষিত বলছি এই জন্য যে, একুশ শতকের দ্বিতীয় দশকের পরবর্তী পর্যায়ে বিশ্বের যে কটি দেশ অর্থনীতি ক্ষেত্রে মাথা উঁচু করবে তাদের অধিকাংশই অবস্থিত বাংলাদেশের পূর্বে ও দক্ষিণ-পূর্বে। বিশ্বব্যাংকের হিসাব অনুযায়ী একুশ শতকের দ্বিতীয় দশকের পরবর্তী পর্যায়ে যে চারটি বৃহৎ অর্থনীতি বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় হয়ে উঠবে অর্থাৎ চীন, যুক্তরাষ্ট্র, জাপান ও ভারত, তাদের একটি বাংলাদেশের পশ্চিম-উত্তরে, কিন্তু দুটির অবস্থান বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বে। বিশ্বব্যাংকের ঐ হিসাব অনুযায়ী যে দশটি অর্থনীতি বিশ্বময় মাথা উঁচু করবে অর্থাৎ চীন, যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, ভারত, দক্ষিণ কোরিয়া, ইন্দোনেশিয়া, থাইল্যান্ড, ফ্রান্স, জার্মানি ও তাইওয়ান, তাদের সাতটিই এশিয়া মহাদেশের এবং ছয়টির অবস্থান বাংলাদেশের পূর্বে ও দক্ষিণ-পূর্বে। শুধুমাত্র একটির অবস্থান পশ্চিমে আর তিনটি বহুদূরের, উধুর আমেরিকা ও ইউরোপের। অন্যদিকে দৃষ্টি না দিয়ে শুধু অর্থনৈতিক অগ্রগতির এই মহাসমারোহে শামিল হওয়ার তাগিদেই বাংলাদেশের মুখ পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্বে ফেরাতে হবে। আর একদিক থেকেও বাংলাদেশের পূর্বমুখী হবার প্রয়োজন রয়েছে। গত শতকে বিশ্বের বৃহৎ শক্তিগুলোর ক্ষমতা দ্বন্দ্বের প্রতিযোগিতার সাক্ষী যেমন ছিল ভূমধ্যসাগর ও আটলান্টিক মহাসাগর, একুশ শতকে কিন্তু তেমনি প্রতিযোগিতা ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শনের ক্ষেত্র হয়ে উঠতে পারে ভারত মহাসাগর, পূর্ব প্রশান্ত মহাসাগরীয় এলাকা এবং বাংলাদেশের অবস্থান হচ্ছে ভারত মহাসাগর সংলগ্ন বঙ্গোপসাগরের উপকূলে। বাংলাদেশ এক দিকে পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া এবং অন্যদিকে দক্ষিণ এশিয়ার সংযোগ বিন্দুতুল্য। অনেকটা হাইফেনের মতো। বাংলাদেশের এই কৌশলগত অবস্থান দিনে দিনে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে এবং কালক্রমে তা রূপান্তরিত হচ্ছে বাংলাদেশের গন্তব্য কোন দিকে তা যদি বাংলাদেশের নিরাপত্তা বিশারদ ও অর্থনীতির পণ্ডিতরা অনুধাবনে ব্যর্থ হন তাহলে বাংলাদেশ যে ব্যাকওয়াটার (backwater) অবস্থান করছিল সেখানেই পড়ে থাকতে হবে অর্থাৎ অজ্ঞাত দক্ষিণ এশিয়ার প্রান্তসীমায় অবস্থিত এক প্রান্তিক রাষ্ট্র (marginalized) হিসাবে।

www.pathagar.com

পূর্বেই বলেছি, বাংলাদেশের পূর্বমুখী হওয়া নতুন নয়, নয় কোনো বিপ্লবাত্মক পদক্ষেপ। বাংলাদেশের কৃতী রাষ্ট্রনায়ক প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান সর্বপ্রথম বাংলাদেশের এই কৌশলগত অবস্থান সম্পর্কে সচকিত হন। তিনি 'আমাদের পথ' শীর্ষক এক নিবন্ধে নিজেই লিখেছেন : 'বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান সম্পর্কে আমি কিছু বলতে চাই। উপমহাদেশ এবং এই অঞ্চলের মানচিত্রের দিকে তাকালে এটা স্পষ্টতই বোঝা যায় যে, ভৌগোলিক অবস্থানের দিক দিয়ে বাংলাদেশের বিশেষ একটা গুরুত্ব রয়েছে। বাংলাদেশ এই উপমহাদেশের এই অঞ্চলে সামরিক ও রাজনৈতিক কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থান করছে। এর উত্তরে সুউচ্চ হিমালয় পর্বত আর দক্ষিণে সুগভীর বঙ্গোপসাগর। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সঙ্গে পশ্চিম এশিয়ার যোগসূত্র স্থাপন করে রেখেছে বাংলাদেশ তার আপন ভূখণ্ডে বৈচিত্র্য দিয়ে।'

এই যোগসূত্রের সঠিক ব্যবহার হলে আজ বাংলাদেশ যে পর্যায়ে রয়েছে তার বৈপ্লবিক পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী। বাংলাদেশ পূর্বমুখী হলে অবিলম্বে প্রক্ষিপ্ত হবে রাজনৈতিক দিক থেকে প্রাণবন্ত এবং অর্থনৈতিক দিক থেকে অত্যন্ত গতিশীল এক এলাকায়। আধিপত্য-আনুগত্যের (dominance-dependence) সম্পর্কের ঊর্ধ্বে ওঠে, সম-সার্বভৌমত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে, জাতীয় স্বার্থকে প্রাধান্য দিয়ে, বাংলাদেশ অগ্রসর হতে পারবে অগ্রগতির বিস্তীর্ণ মোহনায়। ইউনান, মায়ানমার, ভারতের উত্তর-পূর্বের সাতটি প্রদেশের সাথে সংশ্লিষ্ট হলে সম্ভাবনার শত বাতায়ন উন্মুক্ত হবে। সবকিছু ঠিকঠাক চললে লাওস, কম্বোডিয়া এবং থাইল্যান্ডের শেষ প্রান্ত ছাড়িয়ে সমগ্র পূর্ব ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় বাংলাদেশ পৌঁছে যেতে পারে। এই এলাকায় বিনিয়োগ এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার অভূতপূর্ব উন্নতি সাধিত হতে পারে। এই সমগ্র অঞ্চলের সম্পদের বৃদ্ধি ঘটতে পারে প্রচুর পরিমাণে। অর্থনৈতিক অগ্রগতির তীর ঘেঁষে রাজনৈতিক শ্রেষ্ঠত্বের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে যেতে পারে।

বাংলাদেশ পূর্বমুখী হলে এবং সার্থকভাবে পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্বের রাষ্ট্রসমূহের সাথে সুসম্পর্ক প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হলে আমাদের প্রতিবেশী বিরাট ভারতের ওপর যে স্বভাবজাত আনুগত্যের প্রবণতা বিদ্যমান তা থেকে অব্যাহতি লাভও সম্ভব হবে। বিশেষ করে রাজনৈতিক ও জাতীয় নিরাপত্তার ক্ষেত্রে। বিষয়টিকে বিশেষভাবে ব্যাখ্যা না করেও শুধু এটুকু বলতে চাই, ভারত বিরাট প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে চীনকে খাড়া করে ভারতের পূর্ব ও উত্তর-পূর্বের রাষ্ট্রগুলোকে নেপাল, ভুটান ও বাংলাদেশকে যেভাবে তার নিরাপত্তার লক্ষ্যে ভারত সীমানার বর্ধিতাংশ (extended frontier) রূপে ব্যবহারে মনোযোগী হয়েছে এবং এজন্য তার প্রভাব বলয়ের মধ্যে রাখতে সংকল্পবদ্ধ রয়েছে, সে প্রেক্ষাপটে ভারতের সাথে সুষম সম্পর্কের জন্য প্রয়োজন পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার রাষ্ট্রসমূহের সাথে সুসম্পর্ক স্থাপন করা। এর কোনো বিকল্প নেই।

কিন্তু বাংলাদেশের পূর্বমুখী হবার পথটি তেমন মসৃণ নয়। এ পথ বড় বন্ধুর। তাই অত্যন্ত সাবধানে এ পথে চলতে হবে। এর কারণ বহুবিধ : **এক.** বাংলাদেশের প্রতিবেশী ভারত চায় না বাংলাদেশ পূর্বমুখী হোক, কেননা তাতে ভারত বাংলাদেশকে

www.pathagar.com

তার প্রভাব বলয় থেকে ছিটকে যাচ্ছে বলে আশঙ্কা করবে। **দুই.** ভারতও তার অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডকে আরো গতিশীল করার জন্য দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় প্রবেশে গভীরভাবে আগ্রহী। এক্ষেত্রে বাংলাদেশের পূর্বমুখী নীতি ভারতীয় নীতির পরিপূরক নয়, বরং প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক। ট্রান্স-এশিয়ান রেলপথকে সোজাসুজি চট্টগ্রাম থেকে মায়ানমারে না নিয়ে সিলেট হয়ে উত্তর-পূর্ব ভারত থেকে মায়ানমারে নেয়ার যে ভারতীয় অভিসন্ধিতে তার প্রতিফলন সুস্পষ্ট। **তিন.** ভারতে পূর্ব এবং উত্তর-পূর্বে অবস্থিত রাষ্ট্রগুলোকে ভারত যে কোনো সংকটকালে যেভাবে 'সীমাহীন' (borderless) এলাকারূপে পরিগণিত করার পরিকল্পনা করেছিল তা ব্যাহত হবে। **চার.** চীন সম্পর্কে ভারত এবং যুক্তরাষ্ট্রের সহমত যেভাবে দিনে দিনে সুস্পষ্ট হয়ে উঠছে তাও এক্ষেত্রে প্রশ্নবোধক চিহ্নের মতো।

এই অবস্থায় বাংলাদেশ সরকারকে অত্যন্ত সাবধানে পা ফেলতে হবে এবং এক্ষেত্রে যিনি পথিকৃত সেই কৃতী রাষ্ট্রনায়ক প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের প্রদর্শিত পদক্ষেপ গ্রহণ অত্যন্ত জরুরি বলে মনে হয়। তাঁর তিক্ত ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা এক্ষেত্রে এক দিকনির্দেশকের ভূমিকা পালন করেছে। ১৯৭৫ সালের ৭ নভেম্বরের ঐতিহাসিক সিপাহী-জনতা বিপ্লবের উত্তাল তরঙ্গের প্রবল টানে তিনি বাংলাদেশ সরকারের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। দায়িত্ব গ্রহণের পরেই তিনি অনুভব করেন প্রতিবেশী ভারতের বিরাট এবং তার আন্তর্জাতিক ভাবমূর্তি, বাংলাদেশের প্রতি তার বৈরিভাব, বাংলাদেশের একাকীত্ব প্রভৃতি শুধুমাত্র বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতির জন্য নয়, তার সার্বভৌম অবস্থানের প্রতিও এক বিরাট হুমকিস্বরূপ। আন্তর্জাতিক নদী গঙ্গার ওপর ভারতের ফারাক্কা বাঁধ নির্মাণ ও একতরফাভাবে গঙ্গার পানি প্রত্যাহার, দেশের বিভিন্ন সীমান্তে ভারতের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ইঙ্গিতে কিছু বাংলাদেশীর সরকারবিরোধী অপতৎপরতা দেশের স্থিতিশীল অবস্থার ওপর মারাত্মক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। গঙ্গার পানি প্রত্যাহারের ফলে দেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে মরুকরণ প্রক্রিয়ার সূচনা হয়। এসব সমস্যা সমাধানের জন্য তিনি বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ফোরামে উদ্যোগ গ্রহণ করেন। ১৯৭৬ সালে কলম্বোয় অনুষ্ঠিত জোট নিরপেক্ষ রাষ্ট্রমণ্ডলীর সভায়, এমনকি ঐ বছর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৩১তম অধিবেশনে উত্থাপন করে বিশ্ব জনমতের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। শেষ পর্যন্ত তাঁকে বিফল মনোরথ হয়ে ফিরে আসতে হয়েছিল। শেষ পর্যায়ে বৃটেনে অনুষ্ঠিত কমনওয়েলথ কনফারেন্সে ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী মোরারাজি দেশাই এর সাথে প্রেসিডেন্ট জিয়ার ব্যক্তিগত আলোচনার মাধ্যমে এসব সমস্যার সুরাহা হয়। ১৯৭৭ সালের নভেম্বরে গঙ্গার পানি বণ্টন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় এবং বাংলাদেশের বিপথগামীদের দেশে ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা গৃহীত হয়। এসব ঘটনাক্রমের মাধ্যমে প্রেসিডেন্ট জিয়ার ধারণা দৃঢ় হয়ে ওঠে কয়েকটি বিষয়ে। **এক.** প্রতিবেশী বিরাট ভারতের সাথে সংঘর্ষমূলক সম্পর্ক অথবা নির্ভরশীলতার সম্পর্কের পরিবর্তে বাংলাদেশের জাতীয় স্বার্থে অপরিহার্য হল গঠনমূলক সহযোগিতার সম্পর্ক।

www.pathagar.com

দুই. এজন্য অপরিহার্য হল জাতীয় পর্যায়ে ঐক্যবদ্ধ হওয়া এবং দলমত নির্বিশেষে জাতীয় স্বার্থ অর্জনের লক্ষ্যে জাতিকে সচেতন করে তোলা। **তিন.** জাতীয় স্বার্থে বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক সম্পর্কের বহুমুখী (diversification of international relation) করা। **চার.** আন্তঃরাষ্ট্র বা আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সমস্যা যতই প্রকট হোক না কেন, সরকার প্রধানদের সম্মিলিত হবার নিয়মিত ফোরাম সংগঠন একান্ত প্রয়োজনীয়। প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান এরপর থেকে তাঁর কর্মপ্রবাহকে এসব খাতেই প্রবাহিত করেছিলেন। জাতীয় ঐক্যের প্রয়োজনে তিনি উদারনীতি গ্রহণ করে ডান থেকে, বাম থেকে, কেন্দ্র থেকে নেতা-কর্মী সংগ্রহ করে জাতির প্রতিনিধিত্বকারী বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বি. এন. পি) গঠন করেন। তিনি বাংলাদেশের প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহ সফর করে প্রত্যেক প্রতিবেশীর সাথে সুসম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি ভারতের সাথে সৎ প্রতিবেশীসুলভ সম্পর্কের জন্য দিল্লি সফর করেন এবং বাংলাদেশ–ভারত সম্পর্কের ক্ষেত্রে নতুন অধ্যায় সংযোজন করেন। বাংলাদেশ–ভারত সম্পর্ককে বন্ধুত্বপূর্ণ ও স্বাভাবিক করার পরেই তিনি চীন, থাইল্যান্ড, বার্মা ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অন্যান্য রাষ্ট্রের সাথে সুসম্পর্ক প্রতিষ্ঠায় অগ্রসর হন। মোট কথা, তার প্রক্রিয়া ছিল : প্রথমে জাতীয় পর্যায়ে ঐক্য প্রতিষ্ঠার একাগ্রতা। দ্বিতীয়, তিনি জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠার পরেই আঞ্চলিক পর্যায়ে বিভিন্ন প্রতিবেশীর সাথে সুসম্পর্ক প্রতিষ্ঠায় অগ্রসর হন। সবশেষে, তিনি বিশ্বব্যাপী বাংলাদেশকে তুলে ধরার প্রচেষ্টা গ্রহণ করেন।

বেগম খালেদা জিয়াকেও একই পথ এবং একই প্রক্রিয়া অনুসরণ করে অগ্রসর হতে হবে। তা না হলে তাঁর মহৎ উদ্যোগ সফল নাও হতে পারে। ভারতের সাথে সুসম্পর্ক প্রতিষ্ঠা একান্তভাবে জরুরি। জরুরি বিভিন্ন প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলোকে কাছে টেনে নিয়ে তাদের মনে বাংলাদেশ সম্পর্কে আস্থার ভাব সৃষ্টি করে, বাংলাদেশের পূর্বমুখী হওয়া যে প্রতিবেশী কোনো রাষ্ট্রের স্বার্থে প্রতিকূল নয় তা সুস্পষ্টভাবে জানিয়ে-বুঝিয়ে বাংলাদেশের পূর্বমুখী হওয়া প্রয়োজন। এর কোনো বিকল্প নেই। তাছাড়াও রাজনৈতিক বা নিরাপত্তার বিষয়গুলোকে সামনে না এনে, অর্থনৈতিক অগ্রগতির বিষয়টিকে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে গ্রহণ করে অগ্রসর হওয়া সমীচীন, কেননা রাজনৈতিক নিরাপত্তার বিষয়ে যে পরিমাণ বিতর্কের তাপ সৃষ্টি হতে পারে, অর্থনৈতিক অগ্রগতির বিষয়ে সে পরিমাণ হবে তুলনামূলকভাবে কম।

কিন্তু পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্বে অর্থনৈতিক বিষয়টিকে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে নিয়ে অগ্রসর হলে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে কয়েকটি বিষয়কে প্রাধান্য দিতে হবে। **এক.** পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় গণতন্ত্রের কার্যকারিতা সম্পর্কে নানা জন নানা প্রশ্নের অবতারণা করলেও ঐসব দেশে আইন-শৃঙ্খলার যে মান তা অত্যন্ত উন্নত। উন্নত বলেই অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যে বিনিয়োগ হয় তা হয়েছে নিশ্চিত। কর্মকাণ্ড সম্পন্ন হয় এক নিশ্চিন্ত পরিবেশে। বাংলাদেশেও তেমনি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় আমলাতান্ত্রিক জটিলতা নেই বললেও চলে। কোনো পরিকল্পনা পেশ করলে অথবা কোনো প্রকল্প বাস্তবায়নের

www.pathagar.com

জন্য হাজারো ঘাটে বিনিয়োগকারীকে ছোটাছুটি করতে হয় না। বাংলাদেশে কিন্তু আমলাতান্ত্রিক জটিলতার মাত্রা অনেক উঁচু। এদেশে আমলাদের কাজই হল প্রতিপদে বাধার সৃষ্টি করা। এর অবসান হতে হবে। **তিন.** দুর্নীতি বিশ্বের সর্বত্রই কম-বেশি প্রচলিত। কিন্তু বাংলাদেশে দুর্নীতি হয়ে উঠেছে সর্বগ্রাসী। তাই বাংলাদেশে দুর্নীতির পরিমাণকে প্রচুর পরিমাণে হ্রাস করতে না পারলে বহির্বিশ্বে আমাদের গ্রহণযোগ্যতা কমে যাবে।

এমনি সবদিক বিবেচনা করে প্রথমে অর্থনৈতিক এজেন্ডা নিয়ে অগ্রসর হলে, পরবর্তীতে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে সৃষ্ট আস্থার মধ্য দিয়ে রাজনৈতিক ও নিরাপত্তার বিষয়কে সামনে আনলে, বাংলাদেশের পূর্বমুখী অভিযান সফল হতে বাধ্য। জাতি এক্ষেত্রে সাফল্যকে অভিনন্দিত করার আশায় প্রহর গুনছে।

www.pathagar.com

আজকের বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন রাষ্ট্রনায়ক জিয়াউর রহমানের

বাংলাদেশে এখন সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন রাষ্ট্রনায়ক জিয়াউর রহমানের। এখন সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন তাঁর সততার, তাঁর সঠিক দিকনির্দেশনার, জনগণের প্রতি তাঁর সহমর্মিতার। এই মুহূর্তে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন একজন রাষ্ট্রনায়কের (Statesman), যিনি উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্যে বর্তমানকে সুসজ্জিত করতে পারেন। সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন এখন প্রয়োগবাদীর (Pragmatist), যিনি বাস্তবতার নিরিখে নতুন নতুন কর্মসূচি গ্রহণ করে প্রমাণ করবেন যে, রাষ্ট্র এবং সরকার সকলের, সকল জনসমষ্টির। এখন সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন একজন দেশপ্রেমিকের (Patriot), যার নেতৃত্বের পরশমণি সবাইকে জাতীয় স্বার্থের বৃহত্তর মোহনায় সম্মিলিত করতে সক্ষম। এদেশ দীর্ঘ তিন দশকে বহু রাজনীতিকের দর্শন পেয়েছে। দর্শন পায়নি তেমন সার্থক রাষ্ট্রনায়কের। রাজনীতি তাই আজকে ক্ষমতার রাজনীতিতে রূপান্তরিত হয়েছে। রাজনীতিতে কালো টাকার প্রভাব তাই হয়েছে আকাশচুম্বী। পেশি শক্তির নির্লজ্জ প্রভাব তাই রাজনীতিকে করেছে কলঙ্কিত। রাজনীতি তাই জনকল্যাণের মাধ্যম না হয়ে, হয়ে পড়েছে রাজনীতিকদের প্রভাব ও বৈভবের মাধ্যম। আইনের প্রাধান্যের পরিবর্তে সুস্পষ্ট হয়েছে সমাজব্যাপী ব্যক্তি-প্রাধান্য। সৃষ্টি হয়েছে প্রতিযোগিতার পরিবর্তে বৈরিতা। অসহিষ্ণুতা এবং অরুচিকর হিংসা-প্রতিহিংসার মরণ খেলায় জড়িয়ে পড়েছে সামাজিক শক্তিসমূহ। চারদিকে অনৈক্য ফণা তুলেছে। জাতীয় শক্তি প্রতিনিয়ত ক্ষয়প্রাপ্ত হচ্ছে। বাইরে জাতির ভাবমূর্তি ম্লান হয়ে পড়েছে। এই প্রেক্ষাপটে জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষা ধারণ করে, জাতিকে সঠিক দিকনির্দেশনা দিয়ে, উজ্জ্বল ভবিষ্যতের স্বপ্নে সচকিত করতে প্রয়োজন আর একজন জিয়াউর রহমানের। প্রয়োজন একজন যথার্থ রাষ্ট্রনায়কের।

রাজনীতিকরা ক্ষমতার অন্ধকার গুহায় বন্দী হয়ে শুধুমাত্র ক্ষমতা প্রসূত সুবিধার দিকে দৃষ্টি রাখেন। ক্ষমতার বৃদ্ধি-প্রবৃদ্ধিতেই খুশি হন। রাষ্ট্রনায়ক কিন্তু রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাকে সমাজে কল্যাণমুখী কর্মসূচির মাধ্যমরূপেই দেখে থাকেন। তাই যে ক্ষেত্রে রাজনীতিক চান ক্ষমতার কেন্দ্রিকরণ, রাষ্ট্রনায়ক চান ক্ষমতাকে বিকেন্দ্রিকরণের মাধ্যমে রাজনৈতিক ব্যবস্থার সর্বত্র তা ছড়িয়ে দিতে। রাজনীতিকরা জনগণকে তাদের ক্ষমতা লাভের সোপান হিসেবে ব্যবহার করেই সন্তুষ্ট, রাষ্ট্রনায়ক কিন্তু জনগণকে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অংশীদার করে চান তাদের ক্ষমতাশালী করতে। রাজনীতিকরা নিজেদের স্বার্থে জাতীয় ঐক্যে ভাঙন ধরাতেও রাজি, রাষ্ট্রনায়ক কিন্তু রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা প্রয়োগ করে জাতীয় ঐক্য সুদৃঢ় করেন। রাজনীতিকদের নিকট ব্যক্তিগত, গোষ্ঠীগত অথবা দলীয় স্বার্থই মুখ্য। রাষ্ট্রনায়কের লক্ষ্য কিন্তু জাতীয় স্বার্থকে সমুন্নত রাখা। দেশের ভেতরে

www.pathagar.com

অথবা বাইরে জাতীয় ভাবমূর্তিকে উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর করা। শুধুমাত্র রাষ্ট্রনায়কই জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা ধারণ করে, তাদের সুখ-দুঃখের সাথী হয়ে, বর্তমানকে ছাপিয়ে দূর ভবিষ্যতের স্বপ্নে জনগণকে সচকিত করতে সক্ষম।

এসব বিবেচনায় রেখেই বলতে চাই, আজকের বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন হল প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের আকাশছোঁয়া গুণপনাসমূহের-আইনানুগ সমাজ গঠনে তাঁর একাগ্রতার, দুর্নীতির প্রতি তাঁর তীব্র ঘৃণার, সুশাসনের প্রতি গভীর আর্কষণের, স্বশাসনের প্রতি তাঁর সহজাত দুর্বলতার, সমাজব্যাপী শান্তিপূর্ণ পরিবেশ রচনায় তাঁর বলিষ্ঠ পদক্ষেপের। বিশ্বায়নের একালে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন মননশীলতার, সৃজনশীল চিন্তাভাবনার। উন্নয়নশীল বিশ্বের প্রান্তসীমায় দণ্ডায়মান বাংলাদেশের শিল্প-বাণিজ্যকে বিশ্বময় প্রতিযোগিতার জন্যে প্রস্তুত করতে হবে। প্রতিযোগিতার বৃহত্তর ক্ষেত্রে টিকে থাকার জন্যে জনগণকে প্রশিক্ষিত করতে হবে। উন্নত মানব সম্পদরূপে তাদের গড়ে তুলতে হবে। সমগ্র সমাজটাকে জ্ঞান-ভিত্তিক (Knowledge-based) সমাজে রূপান্তরিত করতে হবে। সামাজিক শক্তিগুলিকে সকল অনৈক্য ও বিভেদ জয় করে বৃহত্তর ঐক্যের উপত্যকায় উপনীত হতে হবে। মেধা চর্চাকে শাণিত করার লক্ষ্যে দুর্নীতির মূলোচ্ছেদ করতে হবে। পেশির পরিবর্তে মনন চর্চার মাধ্যমে সৃষ্টিশীল প্রত্যয়ের (Creative Cognition) দিগন্ত বিস্তৃত করতে হবে। সমাজটাকে মুক্ত সমাজের (Open society) আদলে তুলে ধরতে হবে। এসবই তো এখনকার প্রয়োজন। এই সব প্রয়োজনের নিরিখেই এ সমাজের দাবি হচ্ছে জিয়াউর রহমানের ধীশক্তি। তাঁর মেধা। তাঁর বিশ্বাস। তাঁর সততা। তাঁর দক্ষতা। তাঁর দূরদৃষ্টি। তাঁর দেশপ্রেম। যখন তিনি ১৯৭৫ সালের ৭ নভেম্বরে বাংলাদেশ পরিচালনার দায়িত্ব পেলেন, তখনকার কথা একবার ভেবে দেখুন। ভেবে দেখুন কীভাবে মাত্র দু'বছরের মধ্যে, জাতীয় জীবনের সেই সঙ্কটময় মুহূর্তে অকুতোভয় এক সৈনিকের মতো, অনেকটা একক প্রচেষ্টায় দুস্থ, অসহায়, বাংলাদেশকে অনগ্রসরতার গভীর গহ্বর থেকে তুলে উপস্থাপন করলেন অগ্রগতির মহাসমুদ্রের তীরে। ১৯৭৫ সালের শেষ দিকে বাংলাদেশ ছিল সামরিক অভ্যুত্থান-প্রতি অভ্যুত্থানের আঘাতে আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত। ডান-বামের টানা পোড়নে নিঃস্ব প্রায়। যে গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ দাবিতে জাতি রক্তাক্ত মুক্তিযুদ্ধের আগুনে ঝলসে গেল সেই বাংলাদেশ থেকে গণতন্ত্র নির্বাসিত। এক দলীয় কর্তৃত্ব ব্যঞ্জক বাকশালের গুরুভাবে জাতীয় জীবন ন্যুব্জ। সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার অবয়বে অপচয়প্রবণ ও পীড়ামূলক লুটেরা অর্থনীতির ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ায় বাংলাদেশের দীনহীন ও নিঃস্ব অবস্থা তথা তলাবিহীন ঝুড়ির দুর্দশা। আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে বাংলাদেশের নিঃসঙ্গ, একাকী, বন্ধুবিহীন, শ্রমহীন ও হতশ্রী চেহারা।

এমনি যখন বাংলাদেশের অবস্থা তখন দেশ পরিচালনার দায়িত্ব এল জিয়াউর রহমানের ওপর। একজন দক্ষ প্রশাসক হিসেবে তিনি একজন পেশাদার সমাজ বিজ্ঞানীর দৃষ্টিতে সমাজের সামগ্রিক চেহারাটা অনুধাবন করে এর সমস্যাগুলিকে বিশ্লেষণ করেন। তারপর এসব সমস্যার সমাধানের দিকে দৃষ্টি দেন। তিনি অনুধাবন করেন যে, দেশের হাজারো সমস্যার মোকাবেলার জন্যে প্রথমত সরকারকে হতে হবে শক্তিশালী, ভীষণ

www.pathagar.com

শক্তিশালী। সরকারকে শক্তিশালী হতে হবে বিভিন্ন কারণে : **এক.** রাষ্ট্রের প্রধান যেসব দায়িত্ব–ভৌগোলিক অখণ্ডতা সংরক্ষণ, স্বাধীনতা এবং সার্বভৌমত্ব নিশ্চিন্তকরণ, দেশের অভ্যন্তরে আইন-শৃঙ্খলা স্বাভাবিকীকরণ এবং আইনের প্রাধান্য নিশ্চিতকরণ, নাগরিকদের জীবন ও সম্পদের নিশ্চয়তা বিধান–তা পালন করা। এ কোনো দুর্বল সরকারের পক্ষে সম্ভব নয়। তাই তিনি বিদ্যমান প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার উন্নতি সাধনে মনোযোগী হন। আগ্রহী হন আধা-সামারিক বাহিনীর সার্বিক উন্নয়নে। আগ্রহী হন আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর আধুনিকীকরণে। প্রচলিত বিচার ব্যবস্থার কার্যক্রমে দক্ষতা, নিরপেক্ষতা এবং সততা আনয়নে উদ্যোগী হন। দায়িত্ব গ্রহণের ছয় মাসের মধ্যেই এসব ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত হয়। **দুই.** তিনি অনুধাবনে সক্ষম হন যে, সরকার শক্তিশালী না হলে জনগণের আনুগত্য লাভে তা সমর্থ হবে না। তিনি বিশ্বাস করতেন, জনগণের সার্বিক সমর্থনই সরকারকে শক্তিশালী করে তোলে। তাই জন সমর্থন নিশ্চিত করতে তিনি কেন্দ্রের ওপর যতটা নির্ভর করেছেন, তার শত গুণ নির্ভর করেছেন প্রান্তের ওপর। দেশের প্রান্তসীমা পর্যন্ত তিনি ছুটাছুটি করেছেন জনগণের সাথে আত্মিক সম্পর্ক গড়ে তোলার জন্যে। তাদের ভাষায় কথা বলে, তাদের চিন্তা-ভাবনা, আশা-আকাঙ্ক্ষা ধারণ করে, আমলাতান্ত্রিক জটিলতাকে ছিন্ন করে জনগণের সাথে সরাসরি সম্পর্ক স্থাপন করে। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় জনগণের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন অপরিহার্য দুটি কারণে। **এক.** রাষ্ট্রীয় কার্যক্রমে জনগণ যদি একবার ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত হয় তাহলে উন্নয়নের গতি ত্বরান্বিত হতে বাধ্য, কেননা সরাসরি জনগণের জন্যেই উন্নয়নমূলক কর্ম। **দুই.** জনগণ একবার রাজনৈতিক ক্ষমতায় অংশীদার হয়ে উঠলে সমাজের অগ্রহণযোগ্য অংশ–মাস্তান, চাঁদাবাজ, লুণ্ঠনকারী, নিপীড়ক, আইন ভঙ্গকারী নিরস্ত হতে বাধ্য। ফলে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কাজ সহজ হয়ে আসে। সমাজে আইনের প্রাধান্য নিশ্চিত হয়। তাই দেখা যায়, জিয়াউর রহমান যতদিন ক্ষমতাসীন ছিলেন সেই সময়কালই এদেশের ইতিহাসে সর্বাপেক্ষা শান্তির কাল বলে চিহ্নিত হয়েছে। আজকের সমাজে হত্যা, ধর্ষণ, লুণ্ঠন, ছিনতাই ও চাঁদাবাজির যে মচ্ছব পরিলক্ষিত হচ্ছে ঐ সময়ে তার বিন্দুমাত্রেরও প্রকাশ ঘটেনি। অথচ ১৯৭২-৭৫ সময়কালে তা ছিল অনেকটা দুরারোগ্য ব্যাধির মতো। তাঁর মৃত্যুর পরে আবারো ঐ সব ব্যাধি নতুন আকারে-প্রকারে প্রকাশিত হয়।

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে তাঁর নতুন নতুন পদক্ষেপ এ সমাজে সৃষ্টি করে সৃজনশীল এক আবহ। কৃষককে ঋণ দান করে, পানি সেচের ব্যবস্থা করে, রাসায়নিক সার প্রয়োগে কৃষককে উদ্বুদ্ধ করে, উন্নত বীজের প্রয়োগ সহজলভ্য করে তিনি কৃষিক্ষেত্রে বিপ্লবের সূচনা করেন। খাল খনন প্রকল্প এক্ষেত্রে ছিল এক বৈপ্লবিক পদক্ষেপ। দেশের পণ্য সামগ্রী বিদেশে রপ্তানির মাধ্যমে, নতুন নতুন পণ্যের বাজারজাতকরণের মাধ্যমে, বেসরকারি খাতে উৎপাদনের উৎসাহ যুগিয়ে, বেসরকারি ব্যাংক-বীমা ও অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি করে দেশে উৎপাদনের নতুন জোয়ার সৃষ্টি করেন। ফলে বাংলাদেশ "তুলাবিহীন ঝুড়ির" যে লজ্জাকর অভিধা লাভ করেছিল তা থেকে জাতি অব্যাহতি লাভ করে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এভাবে মর্যাদার আসনে আসীন হয়

www.pathagar.com

বাংলাদেশ। সংশ্লিষ্ট হয় কর্মতৎপর মধ্য প্রাচ্যের সাথে। যুক্ত হয় দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সাথে। ইউরোপ এবং আমেরিকা বাংলাদেশকে নতুন আলোকে দেখতে শুরু করে। আজকে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি যেভাবে কলঙ্কিত হয়েছে, বছরের পর বছর ধরে বিশ্বের সবচেয়ে দুর্নীতিপরায়ণ দেশ হিসেবে চিহ্নিত হয়ে জাতীয় মর্যাদা যেভাবে ধূলি ধূসরিত, প্রেসিডেন্ট জিয়ার আমলে এমন অবস্থা ছিল কল্পনাতীত।

তাই বলি, সেই মহান নেতার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের সবচেয়ে উত্তম প্রক্রিয়া হল তাঁর চিন্তা-ভাবনাকে ধারণ করে, তাঁর আদর্শকে মাথায় নিয়ে, তাঁর দক্ষতা, সততা এবং জনদরদী ভাবধারাকে পুঁজি করে তাঁরই নির্দেশিত পথে চলা। নিজেদের কাজে-কর্মে তাঁকে আদর্শ জ্ঞান করে তাঁকে সামনে রাখা।

www.pathagar.com

২৫ মার্চের কালরাত্রি

[এক] ২৫ মার্চের কাল রাত্রির পটভূমি

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চে পাকিস্তানের সামরিক জান্তা যা করেছিল অর্থাৎ পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক সংকট নিরসনের জন্যে যেভাবে সামরিক সমাধানের প্রয়াস গৃহীত হয় তার ফলে পাকিস্তান যে ভেঙে যাবে তা তারা জানতেন। তারপরেও কেন তারা সেই পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিল? কেন পাকিস্তানের প্রশিক্ষিত সামরিক বাহিনীকে পূর্ব পাকিস্তানের নিরস্ত্র, শান্তিপ্রিয়, অসহায় জনসাধারণের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেয়া হয়েছিল? আলোচনা-সমঝোতার বাতাবরণে কেন পশ্চিম পাকিস্তান থেকে সৈন্য-সামন্ত ও যুদ্ধাস্ত্র আমদানি করা হয়েছিল? কাদের বিরুদ্ধে তা ব্যবহার করার লক্ষ্য ছিল?

১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনের ফল অবশ্য পশ্চিম পাকিস্তানের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও সামরিক কর্মকর্তাদের নিকট ছিল অপ্রত্যাশিত। বিভিন্ন উৎস থেকে প্রাপ্ত তথ্যের উপর ভিত্তি করে তারা ধারণা করেছিলেন, আওয়ামী লীগ পূর্ব পাকিস্তানে সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসেবে উঠে আসবে এবং পাকিস্তানের সামগ্রিক কাঠামোয় খুব জোর শতকরা ৬ ভাগ আসন লাভ করবে। কিন্তু ১৯৭০ সালের নভেম্বরে অভূতপূর্ব সামুদ্রিক ঝড় এবং ঐ সংকটকালে কেন্দ্রীয় সরকারের অমার্জনীয় ঔদাসীন্য পূর্ব পাকিস্তানের আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবির আবেদন জনসমষ্টির নিকট অপ্রতিরোধ্য হয়ে ওঠে। আওয়ামী লীগ পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদের ৩১৩টি আসনের মধ্যে লাভ করেছিল ১৬৭টি আসন। এভাবে আওয়ামী লীগ শুধু পূর্ব পাকিস্তানে নয়, সমগ্র পাকিস্তানে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলরূপে আত্মপ্রকাশ করে। পাকিস্তানে যে সংকট দেখা দিয়েছিল ১৯৭১ সালে তা জটিলতম হয়ে উঠে ভয়ঙ্কর ধূর্ত রাজনীতিক জুলফিকার আলী ভুট্টোর পাঞ্জাব ও সিন্দুতে নাটকীয় বিজয়ের ফলে। এক্ষেত্রেও কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন ইনটেলিজেন্স এজেন্সি থেকে প্রাপ্ত তথ্য তাদের জন্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে। জুলফিকার আলী ভুট্টো সবাইকে তাক লাগিয়ে তার দলকে পাঞ্জাব ও সিন্দুতে বিজয়ী করেন এবং তার দল পাকিস্তান জাতীয় পরিষদে লাভ করে ৮৮টি আসন।

কাউন্সিল মুসলিম লীগ ও জামায়াতের অভিজ্ঞ নেতাদের হারিয়ে বিশেষ করে পশ্চিম পাকিস্তানের শক্তিকেন্দ্ররূপে চিহ্নিত পাঞ্জাবে জুলফিকার আলী ভুট্টোর বিজয় ইয়াহিয়া প্রশাসনের সব হিসাব-নিকাশ পাল্টে ফেলে। তাদের ধারণা ছিল, পূর্ব পাকিস্তানে আওয়ামী লীগ লাভ করবে খুব জোর ৭০ কি ৮০টি আসন এবং পশ্চিম পাকিস্তানে বিজয়ী হবে পিডিপি (PDP) অথবা ইসলাম-পসন্দ রাজনৈতিক দলগুলি। ফলে প্রশাসন একটিকে অন্যের বিরুদ্ধে লাগিয়ে অথবা অতীতের সেই সনাতন পন্থায় কেনা-বেচার

www.pathagar.com

প্রক্রিয়ায় নির্বাচিত সদস্যদের নিয়ন্ত্রণে এনে আবার সুখে শাসন কাজ অব্যাহত রাখবে। কিন্তু জাতীয় পরিষদে আওয়ামী লীগের সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন ইয়াহিয়া প্রশাসনের সব হিসাব পাল্টে ফেলে। অন্যদিকে ভুট্টোর পিপল্‌স পার্টির বিজয়। বিশেষ করে পাঞ্জাবে পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে দ্বন্দ্বকে আরো ঘনীভূত করে। এই দ্বন্দ্ব শুধুমাত্র দলীয় পর্যায়ে সীমিত থাকেনি, ব্যক্তি পর্যায়ে নেমে আসে এবং চূড়ান্ত পর্যায়ে তা পূর্ব পাকিস্তানের শেখ মুজিব এবং পশ্চিম পাকিস্তানের জুলফিকার আলী ভুট্টোর মধ্যে ক্ষমতা লাভের তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার রূপ লাভ করে।

ফলে নির্বাচনোত্তর পর্যায়ে পাকিস্তানে সুদৃঢ় হয় তিনটি শক্তিকেন্দ্র–পূর্ব পাকিস্তানে শেখ মুজিবের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ, পশ্চিম পাকিস্তানে জুলফিকার আলী ভুট্টোর নেতৃত্বে পিপল্‌স পার্টি এবং ইয়াহিয়া খানের নেতৃত্বে পাকিস্তানের সামরিক বাহিনী। এই তিনটির মধ্যে ছিল না কোনো সাধারণ সূত্র, ছিল না সহযোগিতার কোনো মনোভাব। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা লাভ ছাড়া অন্যকোনো ক্ষেত্রে এই তিনের মধ্যে ছিল না কোনো কমন ফ্যাক্টর। আওয়ামী লীগের সমর্থনভিত্তি ছিল পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্র-জনতা, পেশাজীবী-বুদ্ধিজীবী ও উঠতি বুর্জোয়া শ্রেণী। পিপল্‌স পার্টির সমর্থনভিত্তি ছিল পশ্চিম পাকিস্তানের ছাত্র-জনতা, কৃষক-শ্রমিক ও বুর্জোয়া শ্রেণী। সামরিক বাহিনীর ছিল সব দল ও গ্রুপকে নিয়ন্ত্রণে রেখে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা প্রয়োগের উদগ্র আকাঙ্ক্ষা। নির্বাচনের পর কিন্তু সামরিক বাহিনীর অবস্থা দ্রুতগতিতে অবনতি হতে থাকে। অতীতের সেই নিজেদের প্রতি দুর্বিনীত আস্থা হ্রাস পেতে থাকে। তাই তারা পূর্ব পাকিস্তানের পিপল্‌স পার্টির মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে, মাঝে মাঝে দুই-এর মধ্যে ব্যালেন্স সৃষ্টি করে অগ্রসর হতে থাকে। জেনারেল ইয়াহিয়া খান এ কারণেই সম্ভবত পূর্ব পাকিস্তানের নেতা শেখ মুজিবুর রহমানকে 'পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ প্রধানমন্ত্রী' বলে উল্লেখ করেও পরক্ষণেই পশ্চিম পাকিস্তানের নেতা জুলফিকার আরী ভুট্টোর সাথে যোগাযোগ করেছিলেন। শুরু করেছিলেন গভীর ষড়যন্ত্রের সূত্রগুলোকে প্রাণবন্ত করতে।

সাধারণ নির্বাচনের পরে বিশেষ করে নির্বাচনে পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে, পূর্বপাকিস্তানের অবিসংবাদিত নেতা শেখ মুজিবুর রহমান স্বাভাবিকভাবেই পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীরূপে নিজেকে প্রজেক্ট করার চেষ্টা গ্রহণ করেন। ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনকে তিনি একাধিকবার ছয় দফা দাবির উপর এক-দফা রেফারেন্ডাম রূপে ঘোষণা করেছিলেন। নির্বাচনের পরে ছয় দফা দাবি আদায়ের পথ প্রশস্ত হয়েছে বলেও মন্তব্য করেছেন বহুবার। যেকোনো মানদণ্ডে বিচার করলে তিনিই যে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হবেন তাও প্রায় নিশ্চিত ছিল। অবস্থাদৃষ্টে মনে হয়েছিল, সামরিক বাহিনীও তাঁর এই অবস্থানের জন্যে সামগ্রিকভাবে প্রস্তুত। কিন্তু বাদ সাধলেন পাঞ্জাব ও সিন্দু প্রদেশে বিজয়ী পিপল্‌স পার্টির নেতা জুলফিকার আলী ভুট্টো। শেখ মুজিবুর রহমানকে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীরূপে মেনে নেয়া ভুট্টো এবং পশ্চিম পাকিস্তানের অন্যান্য নেতার পক্ষে সম্ভব ছিল না কয়েকটি কারণে।

এক. এর পূর্বেও পূর্ব পাকিস্তান থেকে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন বেশ কয়েকজন। কিন্তু শেখ মুজিবুর রহমানের ব্যক্তিত্ব এবং অবস্থান ছিল তাদের থেকে

www.pathagar.com

স্বতন্ত্র। শেখ মুজিব ঢাকার খাজা নাজিমুদ্দিন অথবা বগুড়ার মোহাম্মদ আলীর চেয়ে ছিলেন বিভিন্ন ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র। তিনি ছিলেন বরং হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর মতো। যেকোনো মুহূর্তে যেকোনো অজুহাতে তাঁকে ছুঁড়ে ফেলা প্রায় অসম্ভব। **দুই.** শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হলে নিজের শক্তিশালী সমর্থনভিত্তি নিয়েই ক্ষমতাসীন হতেন পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা হিসেবে। ফলে খাজা নাজিমুদ্দিন বা মোহাম্মদ আলীকে, এমনকি শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে যেভাবে ক্ষমতা থেকে অপসারণ করা সম্ভব হয়েছিল এক্ষেত্রে তা সম্ভব হত না। **তিন.** শেখ মুজিবুর রহমানের ছিল সুনির্দিষ্ট কর্মসূচি যা ছয় দফা কর্মসূচিরূপে চিহ্নিত ছিল এবং এই কর্মসূচি বাস্তবায়িত হলে এতদিন পূর্ব পাকিস্তানকে যেভাবে ব্যবহার করা হয়েছে, বিশেষভাবে পূর্ব পাকিস্তানের সম্পদকে পশ্চিম পাকিস্তানের স্বার্থে, তা সম্ভব হত না। এই মনস্তাত্ত্বিক জটিলতাই শেষ পর্যন্ত পাকিস্তানের অখণ্ডতার পক্ষে কাল হয়ে দাঁড়ায়। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ভুট্টোর বিরোধিতা এবং ছয়-দফায় পূর্ব পাকিস্তানের সম্পদের ব্যবস্থাপনা যেভাবে পূর্ব পাকিস্তানিদের নেতৃত্বে আনয়নের ব্যবস্থা ছিল, বিশেষ করে যেভাবে পাকিস্তানের সামরিক বাহিনীকে পূর্ব পাকিস্তানের উপর নির্ভরশীল করা হয়েছিল–এসবই আলোচিত-পর্যালোচিত ও বিশ্লেষিত হয়ে পশ্চিম পাকিস্তানি নেতৃত্বের রাজনৈতিক ও সামরিক উভয় পর্যায়ে এমন মানসিকতার সৃষ্টি হয় যে, তখনকার পাকিস্তানকে ঐ পর্যায়ে ঐ অবস্থায় সংরক্ষণ করার প্রয়োজন ফুরিয়েছে। ২৫ মার্চের কালরাত্রির এই পটভূমি স্মরণযোগ্য। এ পটভূমির কথা স্মরণে রেখেই শুধু ২৫ মার্চে কেন পাকিস্তানিরা পাকিস্তানের আর এক অংশের উপর যুদ্ধ চাপিয়ে দিয়েছিল কেন শেষ পর্যন্ত তারা গণহত্যার মতো জঘন্য পন্থার আশ্রয় নিয়েছিল তা ব্যাখ্য করা সম্ভব। তারা জানতেন, ২৫ মার্চের পরে পূর্ব পাকিস্তান অতীতের পূর্ব পাকিস্তান থেকে স্বতন্ত্র হয়ে উঠবে। পূর্ব পাকিস্তান তার স্বাতন্ত্র্য হারিয়ে স্থায়ীভাবে পশ্চিম পাকিস্তানের কলোনী হিসেবে সম্পদ আহরণের ক্ষেত্র হিসেবে চিরদিন মাথা নীচু করে থাকবে পশ্চিম পাকিস্তানের নিকট। আর কোনোদিন পশ্চিম পাকিস্তানকে পূর্ব পাকিস্তান নিয়ে মাথা ঘামাতে হবে না। ইতিহাসের রায় কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানের পক্ষেই গিয়েছিল এবং এই ইতিহাস রচনা করেন পূর্ব পাকিস্তানের সাধারণ জনগণই। এক নদী রক্ত সাঁতরে, লক্ষ লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে পূর্ব পাকিস্তানের উত্তরণ ঘটে স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশে। বাংলাদেশ হয়ে ওঠে স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্যের এক তীর্থক্ষেত্র। বাংলাদেশের জনগণ ত্যাগ-তিতিক্ষার কঠোরতম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে তুলে আনে রক্তরঞ্জিত পতাকা। নির্মাণ করে এক স্থায়ী ঠিকানা বিশ্বের মানচিত্রে। এসবের সূচনা হয় কিন্তু ঐ ২৫ মার্চের ঘন অন্ধকার রাত্রিতে, যখন পাকিস্তানের প্রশিক্ষিত বাহিনী ঝাঁপিয়ে পড়ে অসহায়, নিরস্ত্র সাধারণ মানুষের উপর। তাদের অপরাধ ছিল তারা তাদের দাবি সম্পর্কে হয়েছিল উচ্চকণ্ঠ। মিটিং এবং মিছিলের অগ্রপথিকরূপে তারা অগ্রসরমাণ ছিল। তখনকার পাকিস্তানি নেতৃত্বের হীনম্মন্যতার আর এক নজির হল, তারা স্তব্ধ করতে চেয়েছিল এদেশের বুদ্ধিবৃত্তিচর্চায় নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গকে, দেশপ্রেমিক শিক্ষক, বুদ্ধিজীবী, পেশাজীবী ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে। ইতিহাসের গতিপ্রকৃতির দিকে দৃষ্টি দিলে অনুধানে কোনো অসুবিধা হয়

www.pathagar.com

না যে, নির্যাতন ও নিপীড়নের মাত্রা যত প্রবল হয়, সেই জুলুম ও নির্যাতনকে দুমড়ে মুচড়ে সুস্থজীবন প্রতিষ্ঠার সংকল্প ততই সুদৃঢ় হয়। নয় মাসের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে তারও প্রমাণ মেলে। কোনো নেতার নেতৃত্বে নয়, কোনো নেতার নির্দেশে নয়, কোনো দলের সদস্য হিসেবে নয়, পূর্ব পাকিস্তানের কোটি কোটি জনসাধারণ সে দিন জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে, রাজনৈতিক মত ও পথ নির্বিশেষে মাতৃভূমির সম্মান রক্ষার্থে, পূর্ব পাকিস্তানকে স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশের জন্যে অকাতরে প্রাণ বিসর্জন দিয়ে হাজার বছরের স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করার লক্ষ্যে অগ্রসর হয় যুদ্ধক্ষেত্রে।

বাংলাদেশের ইতিহাসের সেই ঘন অন্ধকার ক্ষণে দেখা যায়নি কোনো আলোর নিশানা। শোনা যায়নি কোনো বিবেকের বাণী। আসেনি কোথাও থেকে কোনো অভয়বাণী। আসেনি কোনো নেতার নির্দেশ। জনগণ নিজেরাই রচনা করেছিলেন নিজেদের পথ। নিজেরাই শুরু করেছিলেন দুর্গম পথে অভিযাত্রা। তবে ঐ ঘন অন্ধকারে অত্যন্ত অপ্রত্যাশিতভাবে তাদের কাছে পৌঁছেছিল এক দুঃসাহসিক তরুণের উচ্চকণ্ঠের স্পর্ধিত উচ্চারণ–"আমরা বিদ্রোহ করলাম। আমরা তুলে নিয়েছি বাংলাদেশের পতাকা। আমরা যুদ্ধে লিপ্ত রয়েছি। হানাদার বাহিনীকে নির্মূল করতে আমরা সংকল্পবদ্ধ।" জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে আমরা সাহায্য কামনা করছি স্বাধীনতার পক্ষে। অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ আমরা গড়ে তুলছি। আসুন, আমাদের এই মহতি উদ্যোগকে সার্থক করে তুলুন। আজ থেকে বাংলাদেশ স্বাধীন। হানাদার ও দখলকার বাহিনীকে পর্যুদস্ত করতে আমরা কৃতসংকল্প। তারপর শুরু হয় মুক্তিযোদ্ধাদের কাফেলা।

সেই জমাটবাঁধা ঘন অন্ধকারে সেই অভয়বাণী ব্যর্থ হয়নি। বৃথা যায়নি সেই বিবেকের বাণী। আজ তাই গভীর শ্রদ্ধাভরে সেই কাফেলার বীর সেনানীদের স্মরণ করি। বলতে কোনো দ্বিধা নেই সেই মুক্তিযোদ্ধারাই এদেশের শ্রেষ্ঠ সন্তান।

[দুই] ২৫ মার্চের কাল রাত্রি

আমি তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক তরুণ শিক্ষক। রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের সহকারী অধ্যাপক (তখন বলা হত সিনিয়র লেকচারার) এবং সূর্যসেন হলের (তখন ঐ হলের নাম ছিল মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ হল) একজন আবাসিক শিক্ষক। হল পর্যায়ে আমার সহকর্মী ছিলেন ইতিহাস বিভাগের শিক্ষক কে এম মহসিন, আই বি-এর শিক্ষক রহিম বকস তালুকদার, আইইআর-এর শিক্ষক মাজহারুল হক এবং সাদাত আলী। বিশ্ববিদ্যালয়ে তরুণ শিক্ষক এবং সিনিয়র ছাত্রদের মধ্যে তেমন বেশি পার্থক্য থাকে না। বয়সের দিক থেকে এটি যেমন সত্য, মন-মানসিকতা, চিন্তা-ভাবনা, আবেগ-উচ্ছ্বাসের ক্ষেত্রেও তেমনি সত্য। তাই উভয়ের মধ্যে মিলই বেশি অমিলের চেয়ে, বিশেষ করে রাজনৈতিক চিন্তা-ভাবনার ক্ষেত্রে। কথাগুলো বলছি এই কারণে যে, ১ মার্চে পাকিস্তানের বলদর্পী প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান যখন পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত করার ঘোষণা দিয়েছিলেন, সবার অজান্তে তখনই আওয়ামী লীগের ছয় দফা দাবি এক দফায় রূপান্তরিত হয়। তখন থেকে পূর্ব

www.pathagar.com

পাকিস্তানের আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের জন্য সযত্নে রচিত ছয় দফা, যার ভিত্তিতে ১৯৬৬ সাল থেকে পূর্ব পাকিস্তানে স্বাধিকার আন্দোলন গড়ে ওঠে এবং যার ভিত্তিতে ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তানে আওয়ামী লীগ অভূতপূর্ব বিজয় অর্জন করে সমগ্র পাকিস্তানে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলরূপে আবির্ভূত হয়। সেই ছয় দফা এক দফায় পরিণত হয়। সেই এক দফা হয়ে ওঠে পূর্ব পাকিস্তানকে স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশে রূপান্তরিত করার ইস্পাত কঠিন সংকল্প। এই সংকল্প সজ্ঞানে তৈরি হয়। স্বতঃস্ফূর্তভাবে সুদৃঢ় হয়। পূর্ব পাকিস্তানের জনসমষ্টির সর্বস্তরে এই স্বতঃস্ফূর্ততার প্রকাশ ঘটে ১ মার্চেই। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার সেই ঘোষণার পরপরই তাই দেশের ছাত্র সমাজ বেরিয়ে এল বিদ্যায়তন ছেড়ে। শিক্ষকগণ বেরিয়ে এলেন বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয় এবং বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। শ্রমিকরা বেরিয়ে এসেছিলেন মিল-ফ্যাক্টরি থেকে। নগর ও পল্লীর দুর্দান্ত তরুণরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে ছুটে গিয়েছিল রাস্তার মিছিলে। চিকিৎসক, প্রকৌশলী, ব্যবহারবিদদের অনেকেই প্রত্যক্ষভাবে না হলেও পরোক্ষভাবে এই আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। অংশগ্রহণ করেন সরকারি কর্মকর্তাদের এক উল্লেখযোগ্য অংশ। মোটকথা, ১৯৭১ সালের ১ মার্চেই সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানের জনসমষ্টি এক দফার দাবিতে সোচ্চার হয়ে ওঠে। পূর্ব পাকিস্তান সেই দিন থেকেই বাংলাদেশে রূপান্তরিত হয়। আন্দোলনের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে ওঠে বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা এবং ঢাকার প্রাণকেন্দ্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নেতৃস্থানীয় ছাত্ররাই অগ্রণী ভূমিকা পালনে এগিয়ে এলেন। ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের নেতৃবৃন্দই স্বাধীন বাংলাদেশের মূল প্রবক্তা হয়ে ওঠেন তখন থেকে।

আগেই বলেছি, তরুণ শিক্ষক এবং নেতৃস্থানীয় ছাত্রদের পার্থক্য থাকে অতি অল্পই। আমাদের জাতীয় ইতিহাসের ঐ সন্ধিক্ষণে সেই অল্প পার্থক্যও যেন মুছে গিয়েছিল। আজও মনে পড়ে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের নেতৃস্থানীয় সদস্য আ স ম আব্দুর রব যখন ২ মার্চের সকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবনে বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করেন, তখন সেই মহোৎসবে ছাত্রছাত্রীরা যে পরিমাণে জমায়েত হয়, শিক্ষকদের সংখ্যাও ছিল প্রায় তেমনি। ছাত্রছাত্রীদের হাততালি যেমনটি ছিল, তেমনি সুউচ্চ ছিল শিক্ষকদের হাততালিও। ছাত্রছাত্রীদের অবস্থান ছিল কলাভবনের সামনের মাঠে। আর শিক্ষকরা অবস্থান গ্রহণ করেন কলা ভবনের সবকটি দক্ষিণ দিকের বারান্দায়। ছাত্রছাত্রীদের আবেগ-উচ্ছ্বাস আর শিক্ষকদের ঐকান্তিক সহযোগিতার মন-মানসিকতার উষ্ণতা সম্মিলিত হয় সবার অলক্ষ্যে। জাতীয় মানস তৈরি হয় নতুন সৃষ্টির উন্মাদনায়। সৃষ্টি হয় নতুন সৃষ্টির প্রহর গণনার।

শুধু ২ মার্চের পতাকা উত্তোলনে নয়, ৩ মার্চ ঐতিহাসিক পল্টন ময়দানে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের আর এক কৃতী ছাত্র শাজাহান সিরাজের স্বাধীনতার ইশতেহার পাঠের সময়ও তেমনি সৃষ্টি হয় এক অভূতপূর্ব দৃশ্যের। শিক্ষক হিসেবে আমরা মিছিলে যোগ দিতে পারতাম না, কিন্তু অত্যন্ত কাছে থেকে সবকিছু অবলোকন করার সুযোগ ঠিকই গ্রহণ করতাম। ৩ মার্চের পল্টন সমাবেশেও যখন শাজাহান সিরাজ স্বাধীনতার ইশতেহার ঘোষণা করলেন, আজ থেকে বাংলাদেশ স্বাধীন, তখন যে দৃশ্যের অবতারণা

www.pathagar.com

হয় তা অভূতপূর্ব এবং তখন ছাত্রদের মধ্যে যে উল্লাস পরিলক্ষিত হয় শিক্ষকদের মধ্যে, বিশেষ করে তরুণ শিক্ষকদের মধ্যেও তেমনি প্রত্যাশা, তেমনি ভাবাবেগের সৃষ্টি হয়। দৃশ্যমান না হয়েও বহু তরুণ শিক্ষক শাজাহান সিরাজের সেই ঘোষণা শুনেছিলেন এবং স্বাধীন বাংলাদেশের স্বপ্ন বুকে ধারণ করেছিলেন। সম্ভবত এ কারণেই তখনকার অবিসংবাদিত নেতা শেখ মুজিবের ৭ মার্চের ভাষণে এদেশের ছাত্র-জনতা, তরুণ-তরুণীরা তখন তেমন খুশি হতে পারেনি, কেননা তারা লক্ষ্য করলেন ১ মার্চে ক্ষমতাশ্রয়ী ইয়াহিয়ার বক্তৃতার পরে শেখ মুজিবের ছয় দফা জাতীয় পর্যায়ে এক দফায় রূপান্তরিত হয়ে গেলেও তার কাছে তখনও ছয় দফা জীবন্ত রয়ে গেছে। তখনও তিনি ছয় দফার কাঠামোয় 'পূর্ব পাকিস্তান সংকটের' সমাধান আশা করেছিলেন। তখনও তিনি সামরিক বাহিনী কর্তৃক সংঘটিত হত্যাকাণ্ডের তদন্তে বিশ্বাস রেখেছেন। বিশ্বাস করছিলেন যে, হঠাৎ করে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত না রেখে আবারও আহ্বান করবেন ছয় দফার কাঠামোয় সংবিধান রচনা করা সম্ভব এবং পাকিস্তানকে অক্ষত রেখেও পূর্ব পাকিস্তানিদের দাবি-দাওয়া মেটানো সম্ভব। তাই তিনি ৭ মার্চের ভাষণের সমাপ্তিলগ্নে যেমন উচ্চারণ করেছিলেন 'জয় বাংলা' শ্লোগান, তেমনি সবশেষে বলেছিলেন 'জয় পাকিস্তান'। সম্ভবত এ কারণেই তিনি পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও জেনারেলদের সাথে ২৩ মার্চ পর্যন্ত আপোস-মীমাংসার কথা চালিয়ে গেছেন, যদিও তিনি লক্ষ্য করেছিলেন লাহোর প্রস্তাব গ্রহণের যে দিন ২৩ মার্চকে পাকিস্তানে শুধু গর্ভণর হাউস ও ক্যান্টনমেন্ট জিওসি ভবন ব্যতীত কোথাও পাকিস্তানের পতাকা উত্তোলিত হয়নি। সেই দিনও তার সঙ্গী-সাথীদের বলেছিলেন, 'আলোচনা ফলপ্রসূ হয়েছে।'

এই বিভ্রান্তির কারণও ছিল। ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের ঐতিহাসিক বিজয় পাকিস্তানের নেতৃবৃন্দের কাছে ছিল অপ্রত্যাশিত। তারা বিভিন্ন ইন্টেলিজেন্স রিপোর্টের মাধ্যমে ধারণা করেছিলেন, আওয়ামী লীগ খুব জোর পূর্ব পাকিস্তানে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করবে। কিন্তু যখন নির্বাচনের ফল প্রকাশিত হল তখন দেখা গেল, পূর্ব পাকিস্তানে তো বটেই, সমগ্র পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে আওয়ামী লীগ (৩১৩ আসনের জাতীয় পরিষদে ১৬৭টি আসনের প্রতিনিধি হিসেবে)। এমনিতেই ছয় দফা দাবি সম্পর্কে তাদের ছিল গভীর সন্দেহ। বিশেষ করে পশ্চিম পাকিস্তানের জেনারেলদের। কেননা ছয় দফার ৩, ৪, ৫, ৬ দফায় সুস্পষ্টভাবে নির্দেশিত হয় যে, পূর্ব পাকিস্তানের সম্পদের ওপর পূর্ব পাকিস্তানি নেতৃত্বের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হবে এবং নিরাপত্তার ক্ষেত্রেও পূর্ব পাকিস্তানের কর্তৃত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত হবে। ফলে পাকিস্তানের সামরিক বাহিনীকে পূর্ব পাকিস্তানের সদিচ্ছার ওপর নির্ভরশীল হতে হবে। তারপর ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের এই অভূতপূর্ব বিজয় যেকোনো শাসন পদ্ধতিতে বাঙালিদের এনে ফেলে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার একেবারে দোরগোড়ায়। এ অবস্থার জন্য পশ্চিম পাকিস্তানি রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, বিশেষ করে পাঞ্জাবের নেতৃবৃন্দ ও সামরিক বাহিনীর উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা কোনোক্রমেই প্রস্তুত ছিল না। মার্চের প্রথমদিকে পূর্ব পাকিস্তানে ছিল যুদ্ধাপরাধী

www.pathagar.com

সুসজ্জিত একটি মাত্র ইনফ্যান্ট্রি ডিভিশন। ১ মার্চের ঘোষণার পর মুহূর্তেই ঢাকাসহ পূর্ব পাকিস্তানের সর্বত্র যে বিদ্রোহী চেতনা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে তা দমন করার জন্য প্রয়োজনীয় জনবল তখন পাকিস্তানি শাসকদের ছিল না। ৭ মার্চে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষিত না হলেও স্বাধীনতার কথা উচ্চারিত হয় সেই ১০ লক্ষাধিক জনসমুদ্রের সমাবেশে। যেকোনো নির্যাতন, অন্যায় ও অবিচার প্রতিরোধেরও ঘোষণা আসে জাতীয় নেতার কাছ থেকে। এ অবস্থাকে সামনে রেখেই প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া পশ্চিম পাকিস্তানের ধুরন্ধর রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব জুলফিকার আলী ভুট্টোর পরামর্শক্রমে শুধুমাত্র কিছু সময় পাওয়ার লক্ষ্যে পূর্ব পাকিস্তানের নেতৃবৃন্দের সাথে আলোচনার সূত্রপাত করেন। এই আলোচনা অব্যাহত থাকে ২৩ মার্চ পর্যন্ত। এই আলোচনার লক্ষ্য ছিল কিছু সময় পাওয়া, যে সময়ের মধ্যে তারা পূর্ব পাকিস্তানে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে প্রচুর সংখ্যক সৈন্য ও যুদ্ধযন্ত্র আনয়ন করতে পারবে। এই কারণে সাংবাদিক ম্যাস কারেনহাস এই আলোচনাকে আখ্যায়িত করেন 'বিশ শতকের সবচেয়ে জঘন্যতম প্রবঞ্চনা' রূপে।

২৫ মার্চে পাকিস্তানের সামরিক কর্মকর্তাগণ নিশ্চিত হন যে, পূর্ব পাকিস্তানকে নিয়ন্ত্রণে রাখার মতো সামরিক প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়েছে। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান নিঃশব্দে ঢাকা ত্যাগ করেন আনুষ্ঠানিক আলোচনা সমাপ্ত না করেই। ভুট্টো পশ্চিম পাকিস্তানে পা দিয়েই গর্বভরে ঘোষণা দিলেন যে, 'পাকিস্তান রক্ষা পেয়েছে।' তারা পূর্ব পাকিস্তান ত্যাগ করার আগে পাকিস্তানের প্রশিক্ষিত সামরিক বাহিনীকে লেলিয়ে দিয়ে যান পূর্ব পাকিস্তানে এক ভীতির রাজ্য তৈরি করতে। রাজনৈতিক সমস্যার সামরিক সমাধানের পন্থা নির্দেশ করেই তারা ঢাকা ত্যাগ করেন। তাদের মানসিকতার বিশ্লেষণে দু'টি বিষয় সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। **এক.** বাঙালিদের নেতৃত্বে পাকিস্তান পরিচালিত হবে–এটি তাদের কাছে অসহ্য। সুতরাং, এ ধরনের পাকিস্তান থাকলেই কি আর ধ্বংস হলেই বা কি? এ ধরনের বেপরোয়া মনোভাবের প্রকাশ ঘটে ২৫ মার্চে। **দুই.** পূর্ব পাকিস্তানের ভূমি ও সম্পদ তাদের জন্য লোভনীয় হলেও পূর্ব পাকিস্তানের নেতৃত্ব তাদের জন্য ছিল অনাকাঙ্ক্ষিত। সেই মানসিকতায় পাকিস্তানকে রক্ষা করারও কোনো চিন্তা-ভাবনা তাদের অবশিষ্ট ছিল না।

পশ্চিম পাকিস্তানের নেতৃবৃন্দের এই মানসিকতা অনুধাবনে ভ্রান্তি এবং বিভ্রান্তি সেদিন পূর্ব পাকিস্তানে কালো রাত্রির সূচনা করে। ২৫ মার্চের রাত্রিকে আমরা কালরাত্রি বা কালো রাত্রি বলি দুই অর্থে। **এক.** সেই রাত্রি ঢাকা মহানগরীর অধিবাসীদের জন্য এমন বিভীষিকাময় হয়ে ওঠে যার কোনো তুলনা ইতিহাসে নেই। সেই রাত্রিতে এক হিসেব অনুযায়ী অন্ততপক্ষে ৫০ হাজার অসহায় নর-নারীর জীবনাবসান ঘটে। রেল লাইনের দু'ধারে গড়ে ওঠা অসংখ্য বস্তিতে রাত্রি সাড়ে ১১ বা ১২টায় আগুন ধরিয়ে দেয়া হয়। কেননা তাদের কাছে খবর ছিল, এসব বস্তিতে রাজনৈতিক নেতারা আত্মগোপন করে রয়েছিল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জহুরুল হক হল, জগন্নাথ হলে নারকীয় আক্রমণের মাধ্যমে হত্যা করা হয় বেশ কিছুসংখ্যক ছাত্রকে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক হলে প্রবেশ করে, বিশেষ করে ঐ দু'টি হলের সংলগ্ন শিক্ষকদের গৃহে হানা দিয়ে

www.pathagar.com

নৃশংসভাবে হত্যা করা হয় বেশ ক'জন শিক্ষককে। পিলখানায় তখনকার ইপিআর (আজকের বিডিআর হেডকোয়ার্টার্সে) আক্রমণ করে এবং রাজারবাগ পুলিশের সদর দপ্তরে অকস্মাৎ হানা দিয়ে যারা তাদের আক্রমণ প্রতিহত করতে সক্ষম তাদের হত্যা করা হয় নির্বিচারে। তাই ২৫ মার্চের রাত্রি হয়ে ওঠে নিধনযজ্ঞের কালো রাত্রি। **দুই.** রাজনৈতিক নেতৃত্ব ও পাকিস্তানি ষড়যন্ত্রকারীদের গোপন অভিলাষ অনুধাবনে ব্যর্থ হয়ে ২৫ মার্চের রাত্রিতে যে এমন হত্যাকাণ্ড শুরু হতে পারে তার কোনো আভাস দিতে ব্যর্থ হন। জাতীয় নেতা শেখ মুজিব তার সাঙ্গপাঙ্গদের গোপনে সরে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েই ক্ষান্ত হন।

আগেই বলেছি, তরুণ শিক্ষক ও সিনিয়র ছাত্রদের মধ্যে চিন্তা-ভাবনার ক্ষেত্রে অমিলের চেয়ে মিলই ছিল বেশি। তাই ২৫ মার্চের রাত্রিতে আমরাও ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের নেতৃবৃন্দের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে জানতে চেয়েছি, কি হতে যাচ্ছে এরপর? কোন পথে চলতে হবে আমাদের? এসব প্রশ্নের উত্তরে তাদেরও কোনো জবাব ছিল না। নেতার কোনো নির্দেশ সম্পর্কেও তারা অবগত ছিল না। শাজাহান সিরাজ রাত্রি সাড়ে ৯টায় ৩২ নম্বর থেকে ফিরে এসেও কোনো কথা জানাতে পারেনি। হাজারও জিজ্ঞাসু নয়নের সামনে সেও ছিল রাত্রিতে নির্বাক। পরে জেনেছি, বেশ কিছুসংখ্যক নেতা, সংগ্রাম পরিষদের সদস্যবৃন্দ বুড়িগঙ্গা পার হয়ে সঙ্গোপনে এক নেতার বাসায় রাত্রিযাপন করেন। পরদিন অনেকটা ছদ্মবেশে ভারতীয় সীমান্তের দিকে পা বাড়ান। অসহযোগ আন্দোলনে যারা তাদের সাথে ছিল, যারা মাসব্যাপী মিছিলের অগ্রভাগে থেকেছে, উচ্চকণ্ঠে স্বাধীন বাংলাদেশের পক্ষে শ্লোগান উচ্চারণ করেছে তাদের খবর নেয়ার সময় তাদের ছিল না। যেসব তরুণ শিক্ষক তাদের সাহস যুগিয়েছিল, উৎসাহ দিয়েছিল, তাদের পাশে থেকে সব সময় তাদের ছোটখাটো ভুলগুলো শুধরে দেয়ার চেষ্টা করেছিল তাদের কথাও তখন তাদের মনে ছিল না। এভাবেই ২৫ মার্চের কালরাত্রি এ জাতির জীবনে অন্ধকারময়, বিষাদময় রাত্রি হিসেবে আবির্ভূত হয়। এই নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে, অপ্রত্যাশিতভাবে, দেশের পূর্বপ্রান্তে কিন্তু তখন এক আলোক দ্যুতির জন্ম হয়। ২৫ মার্চের রাত্রি সাড়ে ১০টা কি ১১টায় অষ্টম বেঙ্গলের এক মেজর – মেজর জিয়া – দলবলে পাকিস্তান সামরিক বাহিনী থেকে বিদ্রোহ করে বেরিয়ে এলেন স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা হাতে। পরে তিনি ঘোষণা দিয়েছিলেন বাংলাদেশের স্বাধীনতার। ভেবে অস্থির হয়েছি, কে সেই মেজর? এই সাহস এবং স্পর্ধা তিনি কোথা থেকে পেলেন? সবার অলক্ষ্যে কিন্তু তিনি হয়ে গেলেন সেই কালরাত্রির উজ্জ্বল নক্ষত্র।

www.pathagar.com

এক পাকিস্তানি জেনারেলের কিছু অর্ধ-সত্য

একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ যে এ জাতির ইতিহাসে সবচেয়ে গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায় এতে কেউ সন্দেহ পোষণ করলে তা যে শুধু ইতিহাস-বিকৃতি তাই নয়, তা সত্যের অপমৃত্যু ঘটানোর শামিল। দেশের অভ্যন্তরে কেউ তা করলে তা হবে দেশদ্রোহিতা ও রাষ্ট্রঘাতী অপরাধের সমতুল্য। ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ। শুধুই ঘৃণা উদ্রেককারী। কিন্তু দেশের বাইরে যদি কেউ এই অপপ্রয়াস চালায় তার যথার্থ উত্তর দেয়া প্রয়োজন। অন্তত জাতীয় জনসমাজকে সঠিক তথ্য অবগত করা অপরিহার্য। এই লক্ষ্যেই আজকের এই ছোট্ট লেখাটি।

আমাদের এক ছাত্র সাহাদাত হোসেন খান দীর্ঘদিন পরে লে. জে. এ এ কে নিয়াজীর (A.A.K Niazi) *The Betrayal of East Pakistan* বইটির, যা পাকিস্তানে প্রকাশিত হয় ১৯৯৮ সালে, ভাষান্তর করেছেন এবং প্রকাশ করেছেন ২০০৩ সালে। বইটি আমি ১৯৯৮ সালেই পাই এবং ওই বছর ১৪ ডিসেম্বরে তার মূল্যায়ন করে একটি নিবন্ধ লিখেছিলাম এক জাতীয় দৈনিকে। তা প্রকাশিত হয় ওই সময়েই। তার অনুরোধে এ সম্পর্কে আবারও লিখছি শুধু জেনারেল নিয়াজীর মূল বক্তব্য সম্পর্কে নয়, বাংলায় অনূদিত সংস্করণের সৌকর্য ও প্রকাশভঙ্গি সম্পর্কেও।

জেনারেল নিয়াজীর *The Bertayal of East Pakistan* হল এক পরাজিত সেনাপতির অসংলগ্ন কথামালা। তার পরাজয়কে হালকা করার এক ধরনের নিম্নস্তরের যুক্তি প্রদর্শনের অপপ্রয়াস। তার অভিযোগ, যুদ্ধ চলাকালে তিনি পাকিস্তানের শাসকদের কাছ থেকে কোনো সহায়তা পাননি। প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহিয়া খানের নির্দেশেই তিনি দলবলসহ আত্মসমর্পণ করেন। বন্দিদশা থেকে তাকে মুক্ত করার ক্ষেত্রেও পাকিস্তান তেমন সক্রিয় উদ্যোগ গ্রহণ করেনি।

এমনকি মুক্ত হয়ে পাকিস্তানে প্রত্যাবর্তন করার পরেও তাকে যোগ্য মর্যাদা দেয়া হয়নি। এমনি হাজারও অভিযোগ পোষণ করে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের কাহিনী বর্ণনা করলে তা কি বস্তুনিষ্ঠ হতে পারে? তাদের কাছে অবশ্য এটি মুক্তিযুদ্ধ ছিল না। তা ছিল পাকিস্তানের বিভক্তি বা বিচ্ছিন্নতা।

নিয়াজীর মতে, ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদে আওয়ামী লীগের সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনের পর থেকেই পশ্চিম পাকিস্তানে পূর্ব পাকিস্তানকে পরিত্যাগ করার ষড়যন্ত্র শুরু হয়। তখন থেকেই জুলফিকার আলী ভুট্টো এই ষড়যন্ত্রের মূল নেতা হিসেবে মাঠে নেমেছিলেন।

অর্থনীতি ডিভিশনের উপদেষ্টা এম এম আহমদ এবং পরিকল্পনা কমিশনের ডেপুটি চেয়ারম্যান কামরুল ইসলামকে ভুট্টো নির্দেশ দিয়েছিলেন এমন এক প্রতিবেদন তৈরি করতে যার ভিত্তিতে প্রমাণ করা সম্ভব হবে যে, পূর্ব পাকিস্তান বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলে পাকিস্তানের কোনো ক্ষতি তো হবেই না, বরং পাকিস্তান পূর্ব পাকিস্তানের দায়মুক্ত হয়ে আরও সমৃদ্ধ হবে। আরও বেশি শক্তিশালী হবে।

www.pathagar.com

তিনি আরও লেখেন, ১৯৭১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে মেজর জেনারেল ওমরের ওপর এই দায়িত্ব দেয়া হয় যে, পশ্চিম পাকিস্তান থেকে নির্বাচিত জাতীয় পরিষদের কোনো সদস্য পূর্ব পাকিস্তানের রাজধানী ঢাকায় যেন উপস্থিত না হন। ভুট্টোর কথায়, ঢাকা তখন এক আন্তর্জাতিক চক্রান্তের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়ে গেছে। ২৮ ফেব্রুয়ারি ভুট্টো নিজেই ঘোষণা করেন যে, জাতীয় পরিষদের ৩ মার্চে অনুষ্ঠেয় অধিবেশন স্থগিত করা না হলে সমগ্র পশ্চিম পাকিস্তানে এক গণআন্দোলন গড়ে তোলা হবে এবং তার দলের কোনো নির্বাচিত সদস্য ঢাকা অধিবেশনে যোগ দিতে গেলে তাকে নির্মূল করা হবে। ওই সময় ভুট্টো বলেছিলেন 'উধার তুম আর ইধার হাম' অর্থাৎ পূর্ব পাকিস্তানে তোমরা যা খুশি করোগে, পশ্চিম পাকিস্তান আমাদের। এখানে আমাদের বিষয় আমরাই দেখব। জেনারেল নিয়াজীর ভাষায়, এভাবেই পূর্ব পাকিস্তানের বাংলাদেশে রূপান্তরিত হবার ক্ষেত্র তৈরি হয়। নিয়াজী এখানেই থামেননি। তিনি আরও বলেন, পাকিস্তানকে দ্বিখণ্ডিত করার পরিকল্পনা চূড়ান্ত হয় ভুট্টোর নিজস্ব শহর লারকানায়। এই পরিকল্পনাকে তিনি 'এম এম আহমদ পরিকল্পনা' রূপে চিহ্নিত করেছেন। এর মূল কথা ছিল পূর্ব পাকিস্তানকে কোনো ধরনের সরকার ব্যতীত (এক ধরনের নৈরাজ্য সৃষ্টি করে) পরিত্যাগ করো। (Leave East Pakistan without any successor government)) যেন তা কোনোরূপ সংগঠিত সংগ্রামের উপযোগী না থাকে। এই পরিকল্পনাকে কার্যকর করার জন্য ভুট্টো জেনারেল ইয়াহিয়া খানের সঙ্গে ১১, ১৯ ও ২৯ ফেব্রুয়ারি গোপন বৈঠকে মিলিত হন। এ কারণেই পূর্ব পাকিস্তানের নেতাদের সঙ্গে আপোস-মীমাংসার কোনো সার্থক উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়নি। যে আলোচনার সূচনা হয় তাও ছিল লোক দেখানো। ১৯৭১ সালের ১৪ মার্চ জুলফিকার আলী ভুট্টো নিজেই সুপারিশ করেন পাকিস্তানের দুই অংশের জন্য দু'জন প্রধানমন্ত্রী নিয়োগের। অন্য কথায়, পশ্চিম পাকিস্তানের রাজনৈতিক নেতৃত্ব এবং পাকিস্তান সামরিক বাহিনী পাকিস্তানকে বিভক্ত করার সকল পদক্ষেপ ২৫ মার্চের পূর্বেই ঠিক করেছিলেন।

তাই ১৯৭১ সালের ২৫ ও ২৬ মার্চের রাতে যে হত্যাযজ্ঞ শুরু হয় তা যেমন নৃশংস, তেমনি কাপুরুষোচিত। নিয়াজীর নিজের কথায় "শান্তিপূর্ণ রাত্রি পরিণত হল ভয়ার্ত মানুষের আর্তচিৎকার, ক্রন্দন ও জ্বালাও-পোড়াও এর নির্মম কাল রাত্রিতে। ...এই সামরিক অভিযান নির্মমতা ও হৃদয়হীনতার নিরিখে চেঙ্গিস খান ও হালাকু খানের বোখারা ও বাগদাদের হত্যাকাণ্ড অথবা ব্রিটিশ জেনারেল ডায়ার কর্তৃক জালিয়ানওয়ালাবাগের নরহত্যার চেয়েও ছিল বেশি ভয়ঙ্কর, ছিল অনেক বেশি বিভীষিকাময়" ("Paceful night was turned into a time of wailing, crying and burning...The military action was a display of stark cruelty, more merciless than the massacre of Bukhara and Baghdad by Chengiz Khan and Halaku Khan, or at Jalianwalabagh by the British Genaral Dyer." (45-46) ২৫ মার্চের রাত্রিতেই ইয়াহিয়া খান ঢাকা থেকে সরে পড়েন। ঢাকা ত্যাগের প্রাক্কালে তিনি টিক্কা খানকে বলেন, 'তাদের বিরুদ্ধে যথোচিত ব্যবস্থা গ্রহণ করো' ["Sort them out."]

www.pathagar.com

যা নির্দেশিত হয়েছিল তা কেমনভাবে সম্পন্ন হচ্ছে সেটা দেখার জন্য ভুট্টো আরও কয়েক ঘণ্টা অপেক্ষা করেন এবং নিজের কানেই শুনতে পান সাধারণ মানুষের আকাশবিদারী করুণ ক্রন্দনরোল, দাহ্য দ্রব্যের আওয়াজ, গতিশীল ট্যাঙ্কের কর্কশ গোঙানি, মেশিনগানের মর্মভেদী ভীতিকর আওয়াজ। পরদিন ভোরে ভুট্টো ঢাকা ত্যাগের প্রাক্কালে টিক্কা, রাও ফরমান আলী এবং আরবাবকে তাদের পিঠ চাপড়ে অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, "যা দরকার ছিল তাই করা হয়েছে।" "In the morning Bhutto Patted Tikka, Farman ali and Arbab on the back, congratulated them for doing exactly what was needed."

এত দিন পরেও জেনারেল নিয়াজীর এসব উক্তি অনেকের মনকে উদাস করে তোলে। যে পাকিস্তান সৃষ্টিতে পূর্ব বাংলার সাধারণ মানুষদের ভূমিকা ছিল এত উজ্জ্বল, যাদের রায় ১৯৪৬ সালে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠাকে অপরিহার্য করে তোলে, মাত্র দু'দশকের মাথায় ওই পূর্ব বাংলার মানুষদের ওপর এমন নৃশংসতা? এমন পৈশাচিক আচরণ? এমন বর্বরতা?

নিয়াজীর কথায়, সেই নৃশংসতা চেঙ্গিস খান বা হালাকু খানের বর্বরতাকে ম্লান করে দিয়েছিল। অথচ মাত্র ক'দিন আগেও পূর্ব বাংলা ছিল পূর্ব পাকিস্তান। ইতিহাসে এমন নির্মম শাসকদের দোসর আর আছে কি? জেনারেল নিয়াজীর *The Betrayal of East Pakistan* বইটি পড়ে পাকিস্তানের পাঠকরা ১৯৭১ সালের ঘটনাচক্রকে কীভাবে দেখেছেন, কীভাবে মূল্যায়ন করেছেন তা জানার সুযোগ আমার হয়নি।

কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানের বৃহত্তর জনসমষ্টি একাত্তরের ওই মাসের সংগ্রামকে মুক্তিযুদ্ধের সংগ্রামরূপে গ্রহণ করে থাকেন। এই মুক্তিযুদ্ধে বিজয় অর্জনের লক্ষ্যে তারা সবকিছু ত্যাগ করে আত্মনিয়োগ করেন পাকিস্তানের বর্বর বাহিনীকে পর্যুদস্ত করতে। হাজারও ধারায় রক্ত ঝরিয়ে, দেশের হাজারও স্থানে শহীদ স্তম্ভ রচনা করে এগিয়ে গেছেন মৃত্যুপুরীতে নতুন প্রাণ প্রতিষ্ঠা করতে। জেনারেল নিয়াজী যা হারিয়ে গেছে বলে মনে কষ্ট পেয়েছেন যেমন কষ্ট পায় বিড়াল তার শিকার ছুটে গেলে, পূর্ব পাকিস্তানের অধিবাসীরা স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করে তেমনি আনন্দিত হয়েছেন নিজেদের পাড়া থেকে বন্য হায়েনাটাকে পিটিয়ে বের করে দিয়ে।

জেনারেল নিয়াজী ১৯৭১ সালের ফেব্রুয়ারির পরবর্তী ঘটনাবলি, বিশেষ করে ভুট্টোর ষড়যন্ত্র, ভুট্টো ও ইয়াহিয়ার ষড়যন্ত্রের বিবরণ দিয়েছেন বিস্তারিতভাবে, কিন্তু পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকে পূর্ব বাংলার মানুষের বিরুদ্ধে একটার পর একটা ষড়যন্ত্র তৈরি হয়েছিল–যা পাকিস্তানের প্রশাসনিক কার্যক্রমের ইতিহাসে 'প্রাসাদ ষড়যন্ত্র' (Palace Intrigue) নামে চিহ্নিত, সে সম্পর্কে নিয়াজীর গ্রন্থে একটি লাইনও নেই।

যে পূর্ব পাকিস্তানের কৃষি সম্পদের ওপর ভাগ বসিয়ে পাকিস্তানের কর্তাব্যক্তিরা পশ্চিম পাকিস্তানকে শিল্পসমৃদ্ধ রাষ্ট্রে পরিণত করেন, পূর্ব পাকিস্তানের ভাগের বৈদেশিক সহায়তা অতি সন্তর্পণে পশ্চিম পাকিস্তানে বিনিয়োগ করে অর্থনৈতিক অগ্রগতি অর্জনে সক্ষম হয়, বিশেষ করে পাকিস্তানের শতকরা ৫৪ ভাগ মানুষের ট্যাক্সের টাকায়

www.pathagar.com

প্রতিপালিত বিরাট সামরিক বাহিনীর একাংশকে পূর্ব পাকিস্তানে হালাকু খান বা জেনারেল ডায়ারের ভূমিকা পালনের জন্য পাঠানো হয়েছিল এবং তারাও চেঙ্গিস খানের বর্বর বাহিনীর ভূমিকা পালনে বিন্দুমাত্র সঙ্কোচবোধ করেনি, তাদেরই প্রতিনিধি, পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর ওই সময়ের ১২তম ব্যক্তি, জেনারেল নিয়াজীর লেখায় তারও কোনো ছায়া পড়েনি।

তিনি বুদ্ধিজীবী হলে হয়ত আরও কিছু প্রশ্ন উত্থাপন করতাম। গত ২৪ বছরে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক অনুসৃত নীতির ফলে, বিশেষ করে পাকিস্তানের দুই অঞ্চলের মধ্যে বৈষম্যমূলক নীতির ফলে, পূর্ব পাকিস্তানিদের মধ্যে যে জাতীয়তার দলগুলো একটার পর একটা বিকশিত হয়েছে এবং ১৯৭০ সালের নির্বাচনের পরে আওয়ামী লীগের অভূতপূর্ব বিজয়ের পরে জাতীয় পর্যায়ে যে আবহ সৃষ্টি হয় এবং যার ফলে জাতীয়তাবোধ যেভাবে ফুলে ফলে বিকশিত হয়ে ওঠে তারও কোনো নমুনা নেই তার লেখায়। নিজে তিনি পরাজিত এক সৈনিক। পরাজিত হয় পাকিস্তান। বন্দী হয় পাকিস্তানের প্রায় এক লাখ সৈনিক। অর্থহীন হয়ে পড়ে পাকিস্তানে অনুসৃত নীতিমালা। কিন্তু তমসার মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানে নতুন আলোর ঝর্ণাধারা সৃষ্টি হয়। পূর্ব পাকিস্তান হয় বাংলাদেশ। মৃত্যুর উপত্যকায় নতুনভাবে জীবন স্পন্দিত হয়। জেনারেল নিয়াজীর বইটিতে এসবের বিন্দুমাত্র নেই। এসব অনুধাবনের জন্য সাহাদাত হোসেন খানের বাংলা ভাষায় অনূদিত বইটি এদেশের মানুষের এক নজর দেখা দরকার।

www.pathagar.com

সাত নভেম্বর বিপ্লবের মূলে?

সাত নভেম্বর বিপ্লবের তাৎপর্য সম্পর্কে অনেক লেখাজোখা হয়েছে বটে, কিন্তু কোথায় এর মূল নিহিত রয়েছে, কীভাবে এক পা দু'পা করে এগিয়ে এসে ১৯৭৫ সালের ৭ নভেম্বরে এর বিস্ফোরণ ঘটেছে সে সম্পর্কে তেমন বেশি পর্যালোচনা এখনো হয়নি। এদেশের ইতিহাসবিদরাও এদিকে খুব বেশি দৃষ্টি দিয়েছেন বলে মনে হয় না। খালেদ মোশাররফের ৩ নভেম্বরের সামরিক অভ্যুত্থানের পরেই যেহেতু এর বিস্ফোরণ ঘটে তাই অধিকাংশ লেখক ও চিন্তাবিদ তাদের ভাবনার জ্যোতিকেন্দ্র ঐ অভ্যুত্থানেই নিবদ্ধ রেখেছেন। আসলে এর মূল অনুসন্ধান করতে হবে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট ছাড়িয়ে একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের গতিসূত্রে, এমনকি তারও পেছনে গিয়ে গত শতাব্দীর ষাটের দশকে শুধুমাত্র পূর্ব বাংলার রাজনীতিতে নয়, দক্ষিণ এশিয়ার উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপের সামগ্রিক প্রবাহে। কলকাতা থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক *The Frontier* (১৩ ডিসেম্বর ১৯৭৫)-এর সম্পাদকীয়তে লিখিত হয়েছিল : "নির্দেশদানকারী সামরিক কর্মকর্তাদের নির্দেশ অমান্য করে বাংলাদেশের সামরিক বাহিনীর জোয়ানরা শুধুমাত্র এজেন্ট খালেদ মোশাররফকে উৎখাত করার জন্যে এই বিপ্লব ঘটায়নি। তাদের বিপ্লব ছিল তাদেরই রচিত ১২ দফা দাবি আদায়ের লক্ষ্যে। দুপুরে বাড়তি এক কাপ চা এবং বাড়তি কিছু খাবারের জন্যে তাদের এসব দাবি রচিত হয়নি। তাদের দাবি ছিল অত্যন্ত বৈপ্লবিক–যা দক্ষিণ এশিয়ার কোনো নিয়মিত সামরিক বাহিনীতে অতীতে কখনো শোনা যায়নি। একটি নিয়মিত বা কনভেনশনাল সামরিক বাহিনী ১৯৭১ সালে গেরিলা বাহিনীতে রূপান্তরিত হয়েই নতুন ফসলের জন্ম দিয়েছে। চার বছর সময়কালে অতি সঙ্গোপনে তা পরিপূর্ণতা লাভ করে বিস্ফোরিত হয় ৭ নভেম্বরে। ["The Bangladesh Army rose in a generalized insurrection with rank and file jawans defying their officers and calling not only for overthrow of the agent Khaled Mosharraf, but also for the immediate implementation of their own twelve demands. They were not simple requests for a cup of tea at noon and a bigger bowl of rice, but constituted a radical expression never before seen in any regular army in South Asia. This was the fruit of a conventional army turned into a guerilla force in 1971 coming rife after four years of subterranean gestation."]

যে বারো-দফা দাবির ভিত্তিতে এই বিপ্লব, সেদিকে দৃষ্টি দিন, দেখবেন কত বিপ্লবাত্মক ছিল সৈনিকদের দাবি। প্রথম দফার প্রথম দুটি লাইনে লেখা হয়েছিল : "আমাদের বিপ্লব নেতৃত্বের পরিবর্তনের জন্যে নয়। এই বিপ্লব হলো দরিদ্র শ্রেণীর দারিদ্র্য মুক্তির

www.pathagar.com

লক্ষ্যে.....। দীর্ঘদিন ধরে আমরা ধনিক শ্রেণীর সৈনিক হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছি। ধনিক শ্রেণী আমাদের ব্যবহার করেছে তাদেরই স্বার্থে"। তৃতীয় দফায় বলা হয়েছিল, সকল দুর্নীতিপরায়ণ কর্মকর্তা ও ব্যক্তির সম্পদ বাজেয়াপ্ত করা হোক অবিলম্বে এবং বিদেশী ব্যাংকে তাদের গচ্ছিত সম্পদ দেশে ফিরিয়ে এনে সমাজের বৃহত্তর স্বার্থে বিনিয়োগ করা হোক। চতুর্থ দফায় সুপারিশ করা হয়েছিল, কর্মকর্তা এবং সাধারণ সৈনিকের মধ্যে সকল পার্থক্য মুছে ফেলে প্রত্যেকের কাজ ও যোগ্যতার ভিত্তিতে বেতন নির্ধারণ করা হোক। নয় ও দশ দফায় দেশময় বিপ্লবী সৈনিক সংস্থা (Revolutionary Shainik Shangstha) গঠনের কথা বলা হয়। এসব সংস্থাই সামরিক বাহিনীর মূলনীতিসহ দেশের প্রতিরক্ষা নীতি নির্ধারণ করবে। সুতরাং অনুধাবনে কোনো অসুবিধা হচ্ছে না যে, এই বারো-দফা দাবির ভিত্তিতে গড়ে ওঠা সাত নভেম্বরের বিপ্লবের লক্ষ্য ছিল সত্য সত্যই বৈপ্লবিক। পুরনো সমাজটাকে ভেঙে-চুরে, এতদিন যাবত যারা সামাজিক সুযোগ-সুবিধা উপভোগ করে এসেছে তাদের গুড়িয়ে দিয়ে, বঞ্চিত ও শোষিতের হাতে শাসন দায়িত্ব তুলে দিয়ে, নতুনভাবে সম্পূর্ণ নতুন আঙ্গিকে সমাজ গঠনের অঙ্গীকার ছিল সাত নভেম্বর বিপ্লবের লক্ষ্য।

এই অঙ্গীকার একদিনে জন্মলাভ করেনি। জন্মলাভ করেনি এক বছরেও। দীর্ঘদিন ধরে সমাজতান্ত্রিক আঙ্গিকে সমাজ গঠনের আন্দোলন অব্যাহত ছিল দক্ষিণ এশিয়ার উত্তর-পূর্বাঞ্চলে। অব্যাহত ছিল দক্ষিণ ভারতেও। বিশেষ করে ভারতের পশ্চিমবঙ্গে, ত্রিপুরা-আসাম এলাকায়, দক্ষিণের কেরালা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে। পূর্ব পাকিস্তানেও তার প্রবল ঢেউ আছাড় খায় ষাটের দশক থেকে। হাজারো বিভক্তি সত্ত্বেও পূর্ব পাকিস্তানে গড়ে ওঠে বেশকিছু বামপন্থী রাজনৈতিক দল। আইয়ুব-ইয়াহিয়ার স্বৈরতান্ত্রিক শাসনামলে কঠোর পেশীশক্তির প্রভাবে, বিশেষ করে বামপন্থী দলগুলি নিষিদ্ধ থাকার কারণে প্রকাশ্যে এসব দলের কার্যক্রম পরিচালিত না হলেও সমাজের একাংশে সমাজতান্ত্রিক চিন্তা-ভাবনার জনপ্রিয়তা ছিল বেশ উল্লেখযোগ্য। ভারতের বিভিন্ন অংশে কিন্তু বামপন্থীর আবেদন হয়ে ওঠে আকাশচুম্বি। তার সাথে সংযুক্ত হয় চারু মজুমদারের নক্সালপন্থী হঠকারিতা। সব মিলিয়ে ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের সমস্যা প্রকট হয়ে ওঠে।

অনেক বিশ্লেষকের অভিমত, বাংলাদেশে একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে ভারতের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণের লক্ষ্য ছিল দুটি : **এক.** ভারতের চির শত্রু পাকিস্তানের পূর্ব দিকের ডানাটা ছেঁটে ফেলা। **দুই.** এই সুযোগে ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে চীনপন্থী বামপন্থীদের উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাওয়া প্রভাবকে ঠাণ্ডা করে দেয়া, বিশেষ করে নক্সালপন্থীদের নির্মূল করা। ভারতের নিরাপত্তা বিশারদ সুব্রাহমানিয়ামের ঐ সময়ের বক্তব্যগুলি পর্যালোচনা করুন, দেখবেন, ভারতের সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীরা তখন কি ভাবতেন এবং কীভাবে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে প্রত্যক্ষভাবে জড়িয়ে পড়েন। ভারতের Indian Institute of Defense Studies and Analysis এর পরিচালক কে সুব্রাহমানিয়াম (K. Subramanyam) ১৯৭১ সালের ৩১ মার্চ দিল্লীর Indian Council of World Affairs এর এক সভায় বলেন : "পাকিস্তানের ভেঙে যাওয়া ভারতীয় স্বার্থের

www.pathagar.com

অনুকূল। তাই পূর্ব পাকিস্তান সংকট আমাদের জন্যে যে সুযোগ সৃষ্টি করেছে তা হাতছাড়া করা আমাদের উচিত নয়। এমন সুযোগ আর কোনোদিন আসবে না" ["What India must realise is the fact that break-up of Pakistan is in our interest, an opportunity the like of which will never come again."]

পাকিস্তানকে খণ্ডছিন্ন করার সুযোগ হাতছাড়া করতে চায়নি ভারত ঠিকই, কিন্তু তার পূর্বে নিশ্চিত হতে চেয়েছিল পূর্ব পাকিস্তানের নেতৃত্বের প্রকৃতি সম্পর্কে। ভারত যখন নিশ্চিত হয় যে, আওয়ামী লীগ বামপন্থী কোনো দল নয় এবং এই দলের নেতা শেখ মুজিবুর রহমান বামপন্থীদের বন্ধুও নন, তখনই এগিয়ে আসে ভারতে বাংলাদেশের প্রবাসী সরকার (Bangladesh Government -in-exile) গঠনে, ২৫ মার্চের প্রায় তিন সপ্তাহ পরে, ১৭ এপ্রিলে। সুব্রাহমানিয়াম তার "Bangladesh and India's National Security" শীর্ষক দীর্ঘ প্রবন্ধের এক জায়গায় লিখেছিলেন : "বিপ্লববাদী বামপন্থী কোনো নেতৃত্ব যেন বাংলাদেশে ক্ষমতাসীন না হতে পারে ভারত আগেভাগেই স্বীয় নিরাপত্তার স্বার্থে সামরিক ব্যবস্থা গ্রহণ করে তাও নিশ্চিত করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ" ["By such pre-emptory military moves India could ensure her security by preventing a radically left-oriented leadership from being installed in power in free Bangladesh."] ভারত এখানেই থামেনি। মুক্তিযুদ্ধে সব দল ও মতের তরুণ-তরুণীরা অংশগ্রহণ করলেও, বাম-বিরোধী আওয়ামী লীগের অবস্থানকে সুদৃঢ় করতে মুক্তি বাহিনীর (Mukti Bahini) বিপরীতে ভারতপন্থী মুজিব বাহিনীও (Mujib Bahini) গঠন করে, যদিও বাংলাদেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদ এই পরিকল্পনার বিরোধিতা করেছিলেন। মুজিব বাহিনীর সদস্যদের প্রশিক্ষণ ছিল উন্নতর। তাদের অস্ত্রশস্ত্র ছিল উন্নতমানের। ভারতের গোয়েন্দা সংস্থার [Research and Analysis Wing (RAW)] তত্ত্বাবধানে এই বাহিনী প্রবাসী সরকারকে এড়িয়েও কাজ করত। এই তো হল বামপন্থী সম্পর্কে ভারতের দৃষ্টিভঙ্গি ও কার্যক্রম। এ সময়ে পশ্চিমবঙ্গে প্রায় লক্ষাধিক নক্সালপন্থীর জীবনাবসান ঘটে। কংগ্রেস পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতাসীন হয়। ১৯৭৭ সাল পর্যন্ত বামপন্থীদের অগ্রগতি রুদ্ধ হয়।

সপ্তম দশকের প্রথম দিকে বাংলাদেশেও সমাজতন্ত্রের আবেদন ছিল অত্যন্ত আকর্ষণীয়। দেশের শিল্প-বাণিজ্যের শতকরা ৮৬ ভাগ জাতীয়করণ করা হয়। ব্যাংক-বীমা সরকারের নিয়ন্ত্রণে আসে। দেশের সংবিধানে সমাজতন্ত্রকে গ্রহণ করা হয় চারটি মৌল নীতির একটি রূপে। এ সময়ে রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেই শুধুমাত্র সমাজতন্ত্রের প্রভাব প্রাধান্য লাভ করেনি, দেশের সামরিক বাহিনীতেও এর গভীর প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। এজন্যে দায়ী ছিল প্রধানত মুক্তিযুদ্ধের গতিপ্রকৃতি, বিশেষ করে মুক্তিযুদ্ধে গেরিলা পদ্ধতির প্রভাব এবং কয়েকজন কৃতী মুক্তিযোদ্ধার বৈপ্লবিক চিন্তা-ভাবনা। বিশেষ ট্রাইবুনালে বিচারকালে প্রদত্ত এক ভাষণে কর্ণেল তাহের বলেছিলেন : " সৈনিক জীবনের অভিজ্ঞতায় আমি লক্ষ্য করেছি যে, উন্নয়নশীল ও অনগ্রসর দেশের

www.pathagar.com

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে একটি স্থায়ী প্রতিরক্ষা বাহিনী এক বোঝাস্বরূপ। এই ধরনের প্রতিরক্ষা বাহিনী সামাজিক অগ্রগতির পথে বিরাট প্রতিবন্ধকতা। জাতীয় উৎপাদনে তা কোনো অবদান রাখে না।" তাই সামরিক বাহিনীকে তিনি উৎপাদনমুখী এক বাহিনীতে রূপান্তরিত করতে কৃতসংকল্প ছিলেন।

আর একজন কৃতী মুক্তিযোদ্ধা কর্ণেল জিয়াউদ্দিনও বিশ্বাস করতেন যে, বাংলাদেশের মতো অনগ্রসর দেশে প্রতিরক্ষা বাহিনীর সাংগঠনিক কাঠামো হতে পারে দু'রকম। চিরাচরিত প্রথা অনুযায়ী প্রতিরক্ষা বাহিনী যদি শুধুমাত্র দেশরক্ষার কাজে নিয়োজিত থাকে তাহলে তা টিকে থাকবে রাষ্ট্রের ওপর দায়ভার রূপে। এর ব্যয় বহন করতে গিয়ে রাষ্ট্রের বিনিয়োগযোগ্য উদ্বৃত্ত নিঃশেষ হয়ে পড়বে। কোনো এক সময়ে এই বাহিনী বৈদেশিক সহায়তার উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়বে। এমনকি জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এক নির্যাতনমূলক সংস্থায় রূপ লাভ করবে। তাই প্রতিরক্ষা বাহিনীকে উৎপাদনশীল কাজের সাথে সংশ্লিষ্ট থেকে জনগণের কাছাকাছি অবস্থান করতে হবে।

এই মানসিকতা নিয়ে তাদের প্রতিরক্ষা বাহিনীতে অধিক দিন টিকে থাকা সম্ভব হয়নি। ১৯৭২ সালে দুজনই প্রতিরক্ষা বাহিনী থেকে অব্যাহতি লাভ করেন। কর্ণেল তাহের জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের (জাসদ) গোপন বাহিনী, গণবাহিনীর নেতৃত্ব গ্রহণ করেন এবং কর্ণেল জিয়াউদ্দিন বাংলাদেশ সর্বহারা পার্টিতে যোগদান করে তার সামরিক শাখা সংগঠন করেন।

কর্ণেল তাহের এবং কর্ণেল জিয়াউদ্দিন কীভাবে, কোন লক্ষ্যে, কখন বিপ্লববাদী রাজনৈতিক দলের সাথে সংশ্লিষ্ট হন তার বিবরণ অন্যত্র রয়েছে [*Military Rule and Myth of Democracy*, UPL, 1988] । তাদের সম্পর্কে, বিশেষ করে কর্ণেল তাহের সম্পর্কে এটুকু বলা যায়, তিনি সামাজিক শক্তিগুলোকে (Social Forces) এবং সকল প্রতিষ্ঠানকে গণমুখী করতে চেয়েছিলেন এবং বিপ্লবের মাধ্যমে সমাজ পরিবর্তনের লক্ষ্যে সামরিক বাহিনীকে পরিণত করতে চেয়েছিলেন এক শাণিত অস্ত্র রূপে। এইজন্যে তিনি খুব সম্ভব মার্ক্সীয় নীতি– "পুরোনা বাহিনীকে ভেঙে চুরমার করে দাও, তাকে গুঁড়িয়ে দাও এবং নতুনভাবে লক্ষ্য অর্জনের জন্যে বিনির্মাণ কর" ["Smash the old army, dissolve it and then build it anew"] অনুসরণ করতে চেয়েছিলেন। এই লক্ষ্যেই বাংলাদেশ সামরিক বাহিনীকে নতুনভাবে সংগঠন করতে প্রতিরক্ষা বাহিনীর বিভিন্ন শাখায় এবং স্তরে বিপ্লবী সৈনিক সংস্থা (Revolutionary Soldiers Sangstha) গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করেন ১৯৭৩ সালের ১ জানুয়ারি থেকে। তখনকার পরিস্থিতিও ছিল তার জন্যে সুবিধাজনক। **এক.** তখন বাংলাদেশ সেনা বাহিনীর আকার ছিল খুব ছোট। **দুই.** সামরিক বাহিনীর মধ্যে তেমন ঐক্য ছিল না। ছিল না নির্দেশ দানে ঐক্যবদ্ধ সূত্র, কেননা মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী ও পাকিস্তান থেকে প্রত্যাগতদের মধ্যে ছিল এক ধরনের দ্বন্দ্ব ও বৈরিতা। **তিন.** সামরিক বাহিনীকে ঐক্যবদ্ধ করার সরকারি প্রয়াস ছিল না বললেও চলে। একদিকে রক্ষীবাহিনীর সৃষ্টি এবং এই বাহিনীর প্রতি সরকারের দুর্বলতা, অন্যদিকে প্রতিরক্ষা বাহিনীর পুনর্গঠন ও উন্নয়নে সরকারের অনীহা দেশের সামরিক

www.pathagar.com

বাহিনীর অবস্থা অত্যন্ত নাজুক করে তোলে। **চার.** একজন কৃতী মুক্তিযোদ্ধারূপে কর্ণেল তাহেরের জনপ্রিয়তা এবং গ্রহণযোগ্যতা ছিল আকাশছোঁয়া। **পাঁচ.** জাসদের তরুণ নেতৃত্ব, বিশেষ করে জাসদের বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র (Scientific Socialism) প্রতিষ্ঠার সংকল্প এবং এই তরুণ নেতৃত্ব কর্তৃক ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগকে চ্যালেঞ্জের মানসিকতা, কর্ণেল তাহেরের পরিকল্পনা সামরিক বাহিনীর মধ্যে সৃষ্টি করে নতুন উন্মাদনা। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টে বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট শেখ মুজিবুর রহমানের নির্মম হত্যাকাণ্ড কর্ণেল তাহেরের পরিকল্পনাকে কিছুটা ব্যাহত করে। জাসদের নেতৃবৃন্দ এবং তাহের আওয়ামী লীগ সরকারের পরিবর্তনে খুশি হন বটে, কিন্তু সেই নির্মম হত্যাকাণ্ডকে কর্ণেল তাহের ভালো চোখে দেখেননি। তিনি বিশ্বাস করতেন, কোনো হত্যাকাণ্ড বা সামরিক অভ্যুত্থান জনগণের ভাগ্য পরিবর্তনে সহায়ক হবে না। তাহের শেখ মুজিবকে শ্রদ্ধা করতেন, কিন্তু তার সরকারের তীব্র সমালোচনা করতেন। " সমগ্র জনতার মধ্যে আমি প্রকাশিত" শীর্ষক তার আত্মপক্ষ সমর্থনমূলক বিবৃতির ২৯ পৃষ্ঠায় শেখ মুজিবের বাকশাল ব্যবস্থা সম্পর্কে লিখেছেন : "গণতন্ত্রকে নোংরাভাবে মাটি চাপা দেয়া হয়েছে। জনগণ হয়েছে পদদলিত এবং ফ্যাসিবাদী একনায়কতন্ত্র জাতির ওপর চাপিয়ে দেয়া হয়েছে। এটা অত্যন্ত করুণ এবং দুঃখজনক যে, শেখ মুজিবুর রহমানের মতো বাংলাদেশ রাষ্ট্রের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা একনায়করূপে দেখা দিয়েছেন"। কর্ণেল তাহের শেখ মুজিবকে শ্রদ্ধা করতেন বলে তিনি সেই হত্যাকাণ্ডকে নাপছন্দ করেছেন। যারা এ কাজে অংশগ্রহণ করেন তাদের কোনো মহৎ উদ্দেশ্য ছিল না বলে তিনি সেই হত্যাকাণ্ডের ঘৃণা করেছেন। তার কথায়, "সবচেয়ে উত্তম পন্থা হত জনগণকে প্রতারিত করার জন্যে বিপ্লবের মাধ্যমে শেখ মুজিবকে উৎখাত করা।" তার মতে, ১৫ আগস্টের পর যে সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়, সেই সরকারের কোনো উন্নততর বিকল্প চিন্তা-ভাবনা বা আদর্শ ছিল না। সরকার পরিবর্তনে যা হয়েছিল তা শুধু রুশ-ভারত সম্প্রসারণবাদের হাত থেকে বাংলাদেশকে আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদের হাতে তুলে দেয়া হয়েছিল। তিনি বলেন, ১৫ আগস্টের অভ্যুত্থানের ফলে, "দেশটিকে বে-সামরিক একনায়কত্ব থেকে তুলে এনে সামরিক আমলাতান্ত্রিক একনায়কত্বে নিমজ্জিত করা হয়।"

১৫ আগস্টের অভ্যুত্থানে শেখ মুজিবুর রহমানের মৃত্যুর খবর শুনে কর্ণেল তাহের নিজেই ঢাকা রেডিও স্টেশনে যান এবং রাষ্ট্রপতি খন্দকার মোস্তাক আহমেদের সাথে কথা বলে কয়েকটি সুপারিশ পেশ করেন। যেসব সুপারিশ তিনি পেশ করেন তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল : ১) চতুর্থ সংশোধনী আইনের তাৎক্ষণিক বাতিলকরণ। ২) সকল রাজবন্দিদের মুক্তিদান। ৩) বাকশাল ব্যতীত অন্যান্য সকল দলের নেতৃবৃন্দদের সমন্বয়ে একটি গণতান্ত্রিক জাতীয় সরকার গঠন। ৪) নতুন জাতীয় সংসদ গঠনের জন্য অবিলম্বে সাধারণ নির্বাচনের ব্যবস্থা করা। কর্ণেল তাহেরের এসব সুপারিশ তার সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনার সাথে ছিল সঙ্গতিপূর্ণ। রাজবন্দিদের মুক্তি দিলে তখন বন্দিদশা থেকে মুক্ত হতে পারতেন জাসদের কয়েক হাজার নেতাকর্মী। জাতীয় সরকার গঠিত হলে জাসদ তখন সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসেবে আবির্ভূত হতেও পারত। সর্বোপরি, সময়

www.pathagar.com

পেলে এবং প্রস্তুতি সম্পূর্ণ হলে যে আদর্শে কর্ণেল তাহের ও তখনকার জাসদ অনুপ্রাণিত ছিল তা বাস্তবায়নের পথ সুগম হত। ৩ নভেম্বর খালেদ মোশাররফদের সামরিক অভ্যুত্থান কর্ণেল তাহের ও জাসদের সেই পরিকল্পনায় বাধা সৃষ্টি করে। তাই ৩ নভেম্বরের অভ্যুত্থানকে প্রতিহত করার সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করেন কর্ণেল তাহের এবং জাসদের নেতৃবৃন্দ। খালেদ মোশাররফদের সামরিক অভ্যুত্থান ছিল জাসদ ও গণবাহিনীর কর্মপরিকল্পনা বানচাল করার লক্ষ্যে। খালেদ মোশাররফের সহযোগী ঢাকা ব্রিগেড কমান্ডার সাফায়াত জামিলের বক্তব্যের দিকে দৃষ্টি দিন, অনুধাবনে কোনো অসুবিধা হবে না কীভাবে সামরিক বাহিনীর বিভিন্ন শাখা ও স্তরে গঠিত বিপ্লবী সৈনিক সংস্থাসমূহ ও গণবাহিনী তৈরি হচ্ছিল একদিকে সমাজে শ্রেণী শত্রু খতম করতে এবং অন্যদিকে সামরিক বাহিনীকে নির্দেশ দানকারী অফিসারদের হত্যা করতে। ৩ নভেম্বর সামরিক অভ্যুত্থানের মূল নিহিত রয়েছে এখানে। এবং এ অভ্যুত্থানকে প্রতিহত করার অন্যতম লক্ষ্য ছিল ৭ নভেম্বর সিপাহী জনতার অভ্যুত্থান।

কর্ণেল তাহের এবং জাসদের নেতৃবৃন্দ তখনকার সামাজিক চেতনায় যে দুটি ধারা প্রবাহিত হচ্ছিল সে সম্পর্কে পুরোপুরি সচেতন ছিলেন না। সমাজতান্ত্রিক পুনর্গঠনের চেতনায় তারা এত বেশি উদ্দীপ্ত হয়েছিলেন যে তারই পাশাপাশি জাতীয়তাবাদী চিন্ত ভাবনা যেভাবে সমান্তরাল গতিতে প্রবাহিত হয়ে সাধারণ জনগণ, এমনকি যে সামরিক বাহিনীর ভেতর বিভিন্ন স্তরে বিপ্লবী সৈনিক সংস্থা রচিত হচ্ছিল সেই বাহিনীর মধ্যে সাধারণ সিপাহীদের মন-মানসিকতাকেও প্রভাবিত করেছিল গভীরভাবে সে সম্পর্কে সচেতন ছিলেন না। ভারত বা পাকিস্তানের জন্মকাহিনী যেভাবে রচিত হয়েছিল, সুতীক্ষ্ণ, বুদ্ধিদীপ্ত আলোচনা-পর্যালোচনা-সমালোচনার তীর ঘেঁষে, বাংলাদেশের জন্ম কিন্তু তেমনভাবে হয়নি। বাংলাদেশ প্রাণ পেয়েছে রক্তাক্ত যুদ্ধক্ষেত্রে। তাই স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে "আমার দেশ" "আমাদের জাতি" "আমাদের রাষ্ট্র", "আমাদের বাংলাদেশ" প্রমুখ শব্দরাজি উচ্চারিত হয়েছে নতুন ব্যঞ্জনায়, নতুন বোধিতে, নতুন দ্যোতনায়। যেহেতু এক গণযুদ্ধের ফসল হল বাংলাদেশের স্বাধীনতা, যেহেতু স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটেছে, তাই আন্তর্জাতিক সমাজতান্ত্রিক পুনর্গঠনের চেতনা যতই শক্তিশালী হোক না কেন, জাতীয়তাবাদী গণচেতনাও বিকশিত হয়েছে তেমনি প্রবল পরাক্রমে। সামরিক বাহিনীর মধ্যে ভারত বিরোধী চিন্তাভাবনা এই চেতনাকে আরো শক্তিশালী করে। রক্ষীবাহিনী সংগঠন, এই বাহিনী সংগঠনে ভারতের প্রত্যক্ষ মদদ, এই বাহিনীর বিজয়োল্লাস, পরাজিত পাকিস্তান বাহিনীর নিকট থেকে কেড়ে নেয়া সকল প্রকার অস্ত্রশস্ত্র ভারতে পাচার–এ সবই বাংলাদেশের সামরিক বাহিনীর বিভিন্ন স্তরে ভারতবিরোধী মানসিকতাকে ভীষণভাবে সঞ্জীবিত করে। সিপাহী-জনতার মধ্যে এই ভারতবিরোধী চেতনা চূড়ান্ত পর্যায়ে জাতীয়তাবাদী চেতনাকে জয়যুক্ত করে। ৩ নভেম্বরের অভ্যুত্থানকারী খালেদ মোশাররফ এই চেতনার মোকাবেলায় সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হন। প্রথম আঘাতেই সেই অভ্যুত্থানের নেতৃবৃন্দ ঘায়েল হয়ে পড়ে।

www.pathagar.com

এক্ষেত্রে এটিও উল্লেখযোগ্য যে, গণবাহিনী প্রধান কর্ণেল তাহের জিয়াউর রহমানের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে বা তার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে ৩ নভেম্বরে তিনি যেভাবে গৃহবন্দী হয়ে ছিলেন তাকে সেই গৃহ থেকে মুক্ত করতে অগ্রসর হননি। তিনি অগ্রসর হয়েছিলেন খালেদ মোশাররফের "প্রতিক্রিয়াশীল" উদ্যোগকে নস্যাৎ করতে। এজন্য যেসব শ্লোগান তখন বেশি কার্যকর হবার কথা, যেমন "ভারতের দালাল", "রুশ-ভারতের দালাল", "জয় বাংলার" পরিবর্তে "বাংলাদেশ জিন্দাবাদ"–সেই সব শ্লোগানই ব্যবহার করা হয়েছিল। তাছাড়া, তখন গণবাহিনীর জন্যে জিয়াউর রহমানের প্রয়োজন ছিল সবচেয়ে বেশি। একাত্তরের অনিশ্চিত দিনগুলোয় রাজনৈতিক নেতৃত্ব যখন বিভ্রান্ত ও সম্বিতহীন ঐ সময়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণাকারী জিয়া, একজন সার্থক মুক্তিযোদ্ধা জিয়া, একজন সেক্টর কমান্ডার জিয়ার প্রয়োজন ছিল তখন গণবাহিনীর নিকট সবচেয়ে বেশি। পরের ইতিহাস সবার জানা। আন্তর্জাতিক সমাজতন্ত্রের বাণী জাতীয়তাবাদী চেতনার নিকট ম্লান হয়ে আসে।

৭ নভেম্বর বিপ্লবের সঙ্গে জড়িত রয়েছে এদেশের তিনজন শ্রেষ্ঠ সন্তানের নাম– জিয়া, তাহের, খালেদ মোশাররফ। তিন জনই নিজ নিজ বৈশিষ্ট্যে বিশিষ্ট। মুক্তিযুদ্ধের অগ্নি পরীক্ষায় তিন জনই সফলভাবে উত্তীর্ণ মুক্তিযোদ্ধা। তিন জনই সচেতন, দেশপ্রেমিক, সাহসী এবং জাতীয় স্বার্থে নিবেদিতপ্রাণ। তিন জনের পথের ঠিকানা কিন্তু ভিন্ন। এই ভিন্ন পথের কারণেই জাতীয় জীবনে তাদের ভূমিকা হয়েছে ভিন্ন। তাদের গন্তব্য হয়ত একই ছিল এবং একই ছিল তাদের যাত্রার সূচনাক্রম। মাঝখানে পথগুলি বেঁকে গেছে। হয়েছে ভিন্ন ভিন্ন। এই ভিন্নতার মধ্যেই নিহিত রয়েছে ৭ নভেম্বর বিপ্লবের তাৎপর্য। তিন জনই আজ ইতিহাস। কোন পথ ঠিক আর কোনটি বেঠিক তার ব্যাখ্যা এই লেখার উদ্দেশ্য নয়। এর লক্ষ্য ৭ নভেম্বর বিপ্লবের মূল অনুসন্ধান।

www.pathagar.com

বুশ-ব্লেয়ারের নেতৃত্বে ইরাকে আগ্রাসন : বিশ্বব্যবস্থায় এর প্রভাব

বিশ্বের একমাত্র পরাশক্তি যুক্তরাষ্ট্র এবং অন্যতম বৃহৎ শক্তি যুক্তরাজ্য বিশ্ব জনমতকে প্রত্যাখ্যান করে, যে জাতিসংঘ রচনায় যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যের রাষ্ট্রনায়কদের ভূমিকা ছিল সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ তাকে অবহেলাভরে উপেক্ষা করে এবং আন্তর্জাতিক রীতিনীতি ও বিধি-বিধানকে পদদলিত করে যেভাবে ইরাকের মতো একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রের ওপর চড়াও হল ২০০৩ সালের ২০ মার্চে, তা চিহ্নিত হয়ে থাকবে এই শতাব্দীর সবচেয়ে অনৈতিক, অবৈধ এবং অন্যায় আগ্রাসনরূপে। এই আগ্রাসন বর্তমান বিশ্বব্যবস্থাকে বিপর্যস্ত করে তুলেছে। বিশ্বের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলির নিরাপত্তাবোধ নিশ্চিহ্ন হয়েছে। গত শতাব্দীর যেসব অর্জন মানব সভ্যতাকে সমৃদ্ধ করেছে তাদের অধিকাংশের মূল শিথিল হয়েছে। যে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার শ্রীবৃদ্ধিতে আটলান্টিকের দুই পারের দুই মহান সমাজব্যবস্থা – ব্রিটেন ও আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র স্থায়ী অবদান রেখেছে তাদেরই ক্ষমতাশ্রয়ী নেতৃবৃন্দের কল্যাণে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ অবিশ্বাসের কুয়াশায় আচ্ছন্ন হয়েছে। মানবাধিকারের প্রত্যয় হয়েছে পর্যুদস্ত। আইনের, বিশেষ করে আন্তর্জাতিক আইনের ভিত্তিমূল নড়ে উঠেছে। আন্তর্জাতিক ব্যবস্থায় ভারসাম্যহীনতা প্রকট হয়ে উঠেছে। দীর্ঘ তিন সপ্তাহের মধ্যে একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র আগ্রাসীদের কবলে চলে গেল, অথচ ১৯১ সদস্য বিশিষ্ট রাষ্ট্রসংঘে যুদ্ধবিরতির কোনো প্রস্তাব উত্থাপিত হল না। সবাই মিলে তাকিয়ে দেখল কীভাবে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র একটু একটু করে স্বাধীনতা হারিয়ে প্রচণ্ড শক্তিমত্তার বিষাক্ত ছোবলে ছোবলে নিস্তেজ হয়ে পড়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লিউ বুশ এবং যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী টনি ব্লেয়ার ভালোভাবে জানতেন যে, তাদের ইরাক আক্রমণ বৈধ নয়, নয় রীতিসিদ্ধ। তাছাড়া, তাদের ইরাক আগ্রাসনের বিরুদ্ধে বিশ্বজনমত সোচ্চার হয়ে উঠেছে। তারপরেও লাখো লাখো জনতার যুদ্ধবিরোধী আন্দোলনের মুখে কেন তাদের, বিশেষ করে জর্জ বুশের, এই ঔদ্ধত্য? কোন মন-মানসিকতায় তিনি এই পদক্ষেপ গ্রহণ করলেন? সত্যি বটে, জার্মানির একনায়ক এডোলফ হিটলারের (Adolf Hitler) মানসিক গঠনও ছিল প্রায় এমনি। তিনি তার *Mein Kampf* গ্রন্থের ১০৫ পৃষ্ঠায় লিখেছিলেন : "সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ কখনো একজন দক্ষ নেতার বিকল্প হতে পারে না। যেমন একশো জন নির্বোধ একজন জ্ঞানী লোক সৃষ্টি করতে পারে না, তেমনি একটি বীরোচিত সিদ্ধান্ত একশো জন কাপুরুষ কর্তৃক গৃহীত হতেও পারে না।" ["A majority can never replace the man....Just as a hundred fools do not make one wise man, an

www.pathagar.com

heroic decision is not likely to come from a hundred cowards."] গত শতাব্দীর তৃতীয় দশকের জার্মান একনায়ক যেভাবে লক্ষ লক্ষ নির্বোধকে পদদলিত করে, নিজেকে একজন দক্ষ নেতার আসনে বসিয়ে এক প্রাজ্ঞ ব্যক্তিত্বরূপে সমগ্র ইউরোপকে দখল করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন, জর্জ বুশও তেমনি ইরাক দখল করে সমগ্র মধ্যপ্রাচ্য দখল করার বীরোচিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন হিটলারের আদলে। হিটলার যেমন তার সেই নিন্দিত গ্রন্থের ৫৩ পৃষ্ঠায় লিখেছিলেন : "যুক্তির উপর সহজ বিজয় অর্জনের প্রকৃষ্ট পন্থা ভীতির পরিবেশ তৈরি এবং শক্তিমত্তা প্রদর্শন" ["The one means that wins the easiest victory over reason : terror and force."] জর্জ বুশও তেমনি সকল ন্যায়বোধ এবং গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের কণ্ঠ স্তব্ধ করে ইরাকের তেল সম্পদকে কুক্ষিগত করার লক্ষ্যে পরাশক্তিসুলভ প্রচণ্ড মারণাস্ত্র প্রয়োগের মাধ্যমে সমগ্র ইরাকে এক "ভীতির রাজত্ব" (reign of terror) প্রয়োগ করতে উদ্যোগী হন।

কেন তার এই উদ্যোগ তার উত্তরও নিহিত রয়েছে হিটলারের *Mein Kampf* গ্রন্থে। তিনি সেই গ্রন্থের ২০৮ পৃষ্ঠায় লিখেছিলেন : "যে কারণে আমাদের যুদ্ধ করতে হবে তা হল আমাদের জাতি বা কুলের অস্তিত্ব রক্ষার জন্যে, আমাদের জনসমূহের বৃদ্ধির লক্ষ্যে, আমাদের সন্তানদের প্রবৃদ্ধির কারণে, আমাদের রক্তের বিশুদ্ধতা সংরক্ষণের জন্যে এবং আমাদের পিতৃভূমির স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে, যেন বিশ্বের সৃষ্টিকর্তা আমাদের উপর যে পবিত্র দায়িত্ব অর্পণ করেছেন তা যথাযথরূপে পালন করা সম্ভব হয়।" ['What we have to fight for is the security of the existence and the increase of our race and our people, the nourishment of its children and the preservation of the purity of the blood, the freedom and independence of the fatherland in order to enable our people to mature for the fulfillment of the mission which the Creator of the universe has allotted also to them."]

জর্জ বুশের এই মন-মানসিকতা লক্ষ্য করে এবং হিটলারের সাথে বুশের কার্যক্রমের এই মিল স্মরণে রেখে আধুনিক জার্মানির অন্যতম সুসন্তান গুন্টার গ্রাস (Gunter Grass) বুশকে চিহ্নিত করেছেন আধুনিক বিশ্বের হিটলাররূপে, বর্তমান সভ্যতার অন্যতম ত্রাস হিসেবে।

কিন্তু কেন তিনি এই উদ্যোগ গ্রহণে কৃতসংকল্প হলেন? কেন বিশ্বের কোটি কোটি যুদ্ধবিরোধী নির্বোধদের কোনো চিৎকার কানে তুললেন না? কোন ঔদ্ধত্যে তিনি ইরাকের প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেনের নিকট ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে পুত্র ও অন্যান্য পরিজনসহ ইরাক পরিত্যাগ করে নির্বাসনে যাবার নির্দেশ-সম্বলিত চরমপত্র প্রেরণ করলেন? তার লক্ষ্য কি ছিল? জর্জ ডব্লিউ বুশ ও টনি ব্লেয়ারের এই অনৈতিক ও অবৈধ আগ্রাসনের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় বিশ্ব পরিস্থিতি কোন দিকে মোড় নিচ্ছে? এই ছোট নিবন্ধে এসব প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা করা হয়েছে।

সত্যি বটে, যুক্তরাষ্ট্রের এই আগ্রাসন নতুন নয়, নয় সবচেয়ে বীভৎস আক্রমণও। ১৯৪৫-২০০০ সালের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র ২৮টি বড়োসড়ো এবং প্রায় অর্ধশত ছোটখাটো

www.pathagar.com

যুদ্ধে হাত পাকিয়েছে। কোরিয়া, গোয়াতেমালা, কঙ্গো, লাওস, পেরু, ভিয়েতনাম, কম্বোডিয়া, এল সালভাদোর, নিকারাগুয়া, যুগোশ্লাভিয়া, ইরাক এবং আফগানিস্তান যুক্তরাষ্ট্রের মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্রের শিকার হয়েছে। একমাত্র ভিয়েতনাম যুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্র হত্যা করেছে দশ লক্ষাধিক মানব সন্তানকে। যুক্তরাষ্ট্রের সর্বশেষ যুদ্ধে আফগানিস্তানে নিহত হয়েছে ৭০ হাজার অসহায় নরনারী, শিশু-বৃদ্ধ-বৃদ্ধা। শুধু জনপদ কেন, জাতীয় স্বার্থ সংরক্ষণকারী জননেতারাও যুক্তরাষ্ট্রের চক্রান্তের নির্মম শিকার হয়েছেন। ইরানের তেল সম্পদ লুণ্ঠনকারী Standard Oil কোম্পানিকে প্রতিহত করতে গিয়ে ইরানের জননায়ক মোহাম্মদ মোসাদ্দেককে হারিয়ে যেতে হয়েছিল। ইন্দোনেশিয়ার জাতীয় নেতা আহমদ সুকর্ণকে ক্ষমতাচ্যুত হতে হয় এক পৈশাচিক হত্যাকাণ্ডের মধ্যদিয়ে। তখন প্রায় আট লক্ষ ব্যক্তিকে প্রাণ দিতে হয়। আরব বিশ্বের সর্বজন শ্রদ্ধেয় নেতা ইজিপ্টের জামাল আব্দুল নাসেরকে নিঃশেষ করার প্রচেষ্টা গ্রহণ করে যুক্তরাষ্ট্রের সহায়তায় যুক্তরাজ্যের নেতৃত্ব। তবে এসব যুদ্ধ এবং অভিযান ২০০৩ সালের ২০ মার্চের ইরাক আগ্রাসন থেকে একটু ভিন্ন এবং ভিন্নতা গুণগত। **এক.** গত অর্ধ শতাব্দীব্যাপী শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্বে নিয়োজিত জাতিসংঘ আজকের ইরাক আক্রমণে যেভাবে কার্যত অসহায় ও অকার্যকর হয়ে পড়েছে, অতীতে তেমনটি ঘটেনি। **দুই.** যে অজুহাতে ইরাকে আগ্রাসন পরিচালিত হল অর্থাৎ ইরাকী প্রশাসনের নিয়ন্ত্রণে ব্যাপক গণবিধ্বংসী মারণাস্ত্র (Weapons of Mass Destruction- WMD) রয়েছে যা মানবসভ্যতার ধ্বংস সাধনে সক্ষম তা মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে। **তিন.** কোনো যুক্তির বিচারে না গিয়ে শুধুমাত্র অপছন্দের শাসকদের অপসারণের জন্যে, নিছক regime change এর লক্ষ্যে, একটি স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে আগ্রাসন পরিচালনায় আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যে অবাঞ্ছিত এবং অগ্রহণযোগ্য আক্রমণের দৃষ্টান্ত স্থাপন করা হল তাও অতীতে দেখা যায়নি। **চার.** এই আগ্রাসনের ফলে বিশ্বব্যবস্থায় যে ভারসাম্যহীনতা সৃষ্টি হয়েছে তাও মধ্যযুগীয় "জোর যার মুল্লুক তার" নীতির পুনরুজ্জীবন ঘটিয়েছে।

জর্জ বুশের লক্ষ্য কি?

১৯৯১ সালের উপসাগরীয় যুদ্ধে (Gulf War of 1991) সাদ্দাম হোসেনের বিরুদ্ধে আজকের যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জর্জ ওয়াকার বুশের পিতা জর্জ উইলিয়াম বুশ জয়লাভ করে ঘোষণা করেছিলেন, একটা নতুন বিশ্বব্যবস্থার (A New World Order) সৃষ্টি হল। সেই বিশ্বে, তার মতে, যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত। যুক্তরাষ্ট্রকে ঘিরেই এখন থেকে বিশ্ব রাজনীতি ও অর্থনীতি আবর্তিত হবে। এ লক্ষ্যে বিশ্বের বৃহৎ শক্তিগুলোর (Great Powers) মধ্যে এক ধরনের ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশের (সিনিয়র বুশ) এই বিশ্বাসের মূলে ছিল তখনকার অন্য পরাশক্তি সোভিয়েট ইউনিয়নের খণ্ডছিন্ন অবস্থার প্রেক্ষাপট। সামরিক দিক থেকে তখনো সোভিয়েট ইউনিয়নের উত্তরাধিকারে রাশিয়া পরাশক্তির পর্যায়ে থাকলেও

www.pathagar.com

সামরিক প্রস্তুতির ভারে রাশিয়ার অর্থনীতি ভেঙে পড়ে এবং এক পর্যায়ে ঋণের জন্যে যুক্তরাষ্ট্রের নিকট হাত পাততে হয়। সেই প্রেক্ষাপটে জর্জ বুশের (সিনিয়র) নতুন বিশ্বব্যবস্থার ধারণা ছিল বিশ্বময় যুক্তরাষ্ট্রের একাধিপত্য প্রতিষ্ঠার ধারণা। কোনো প্রতিদ্বন্দ্বীবিহীন প্রতিবন্ধকতাহীন যুক্তরাষ্ট্রের প্রাধান্যের ধারণা। এরই ফলো-আপ (Follow-up) এ্যাকশন হিসেবে কীভাবে এই নতুন বিশ্বব্যবস্থাকে অব্যাহত রাখা যায় তার পথ নির্দেশ করলেন যুক্তরাষ্ট্রের এক রাষ্ট্রবিজ্ঞানী স্যামুয়েল হান্টিংটন (Samuel Huntington) ১৯৯৩ সালে তার লিখিত *Clash of Civilization and the Re-making of World Order* শীর্ষক ৩২০ পৃষ্ঠার একটি গ্রন্থে। তার বক্তব্য হল, ১৯৯০ সাল থেকে সমাজতন্ত্রের পতনের পরে, তথ্য প্রযুক্তির অভাবিত অগ্রগতির ফলে এবং বিশ্বময় বাজার অর্থনীতি ও উদারনৈতিক গণতন্ত্রের একালে জাতিরাষ্ট্রের প্রভাব হ্রাস পাবে। অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক অবাধ আদান-প্রদানের ফলে জাতিরাষ্ট্রের ভূমিকা ক্রমে ক্রমে ম্লান হতে থাকবে এবং বিশ্ব ক্রমাগতভাবে পশ্চিমাভিমুখী হবে। এক সময় জাতিরাষ্ট্র তার গৌরবময় ভূমিকা হারিয়ে ফেলবে। ফলে তখন সংঘাত দেখা দেবে সভ্যতার মধ্যে, জাতি রাষ্ট্রের মধ্যে নয়। প্রত্যেক সভ্যতার অভ্যন্তরে ছোটখাটো সংঘর্ষ ঘটবে বটে, কিন্তু বড় আকারের সংঘাত ঘটবে পাশ্চাত্য সভ্যতা ও প্রাচ্য সভ্যতার মধ্যে, বিশেষ করে ইসলামী বিশ্ব ও পাশ্চাত্য সভ্যতার মধ্যে। কোনো এক পর্যায়ে চাইনিজ ও জাপানি সভ্যতাও হাত মিলাতে পারে ইসলামী বিশ্বের সাথে। এভাবে হান্টিংটন "সাংঘর্ষিক ইসলামকে" (Militant Islam) ইউরোকেন্দ্রিক সভ্যতা, বিশেষ করে ইউরোপের বর্ধিতাংশ যে আমেরিকা তার প্রতিপক্ষরূপে দাঁড় করিয়ে ছাড়লেন। তারই ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার চেইন-ইভেন্টরূপে দেখা দেয় পশ্চিম এশিয়ায় যুদ্ধের মহড়া, মুসলিম অধ্যুষিত জনপদসমূহে তালেবান ও মৌলবাদী মুসলিম সন্ত্রাসীদের চিহ্নিতকরণ প্রক্রিয়া। তখন থেকেই বিশ্বব্যাংক, আই এম এফ, এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক প্রভৃতি যুক্তরাষ্ট্র প্রভাবিত আন্তর্জাতিক সংস্থার মাধ্যমে পরোক্ষভাবে মুসলিম রাষ্ট্রগুলির ওপর প্রচণ্ড চাপ প্রয়োগের রাজনীতি শুরু হয়। শুরু হয় তার শক্তিশালী মিডিয়ার মাধ্যমে বিশ্ব পর্যায়ে ইসলামবিরোধী জনমত সংগঠনের বিশাল আয়োজন। এক্ষেত্রে উল্লেখ্য যে, আমরা বিশ্বের যে অঞ্চলে বসবাস করছি অর্থাৎ দক্ষিণ এশিয়ায় মৌলবাদ, তালেবান অথবা কট্টর মৌলবাদী মুসলমানরূপে কিছু ব্যক্তিকে চিহ্নিত করার প্রক্রিয়ার সূচনা হয় ১৯৯৯ সালে যখন যুক্তরাষ্ট্রের ডেপুটি সেক্রেটারী অব স্টেট স্ট্রবে ট্যালবট (Strobe Talbot) ভারতের বিজেপি নেতা পররাষ্ট্রমন্ত্রী যশোবন্ত সিং এর সাথে মিলিত হন তার পর থেকে। তখন থেকেই মুসলিম প্রধান বাংলাদেশকে চিত্রিত করার এক অপচেষ্টার সূচনা হয় তালেবান ও সন্ত্রাসীদের কেন্দ্রভূমিরূপে, বিশেষ করে মাদ্রাসায় প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থাকে কেন্দ্র করে। ভারতের পশ্চিম বঙ্গে বাংলাদেশের কয়েকজন যুবককে তারপরই আটক করা হয় হরকাতুল জেহাদ নামক সংগঠনের সদস্যরূপে। এর পরে বাংলাদেশের কয়েকজন মসজিদের ইমামকে আটক করা হয়। এক্ষেত্রে এটিও উল্লেখযোগ্য যে, তখন একদিকে যেমন ভারতের জম্মু ও কাশ্মীরে স্বাধীনতাকামীদের আন্দোলন শক্তিশালী হয়েছিল, অন্যদিকে ভারত সরকারের সাথে যুক্তরাষ্ট্রের সহযোগিতার সূত্রও দৃঢ় হচ্ছিল।

www.pathagar.com

এই সময়ে অর্থাৎ ২০০০ সাল নাগাদ যুক্তরাষ্ট্রের অনুসৃত পররাষ্ট্র নীতি পর্যালোচনা করলে দেখা যায় তার তিনটি সুস্পষ্ট ধারা। **এক.** মুসলিম বিশ্ব সম্পর্কে এক ধরনের অনীহা, ঔদাসীন্য, নিস্পৃহা অথবা উৎসাহের অভাব। সউদী আরবের মতো যেসব মুসলিম রাষ্ট্র যুক্তরাষ্ট্রের একান্ত অনুগত ছিল সেক্ষেত্রেও যুক্তরাষ্ট্রের নিস্পৃহা সুস্পষ্ট হয়। **দুই.** এই সময় থেকে এশিয়া, বিশেষ করে মধ্য এশিয়া, দক্ষিণ এশিয়া, পূর্ব ও দক্ষিণ এশিয়া যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতির কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়। তার প্রমাণরূপে বলা যায় এসব অঞ্চলে যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান প্রধান নীতি-নির্ধারকদের প্রায় সবাই, এমনকি পররাষ্ট্রমন্ত্রী মেডেলিন অলব্রাইট ও প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটন সফর করেছেন, কোনো কোনো ক্ষেত্রে একাধিকবার। এর কারণ হিসেবে বলা যায়, যুক্তরাষ্ট্রের নীতি-নির্ধারকদের থিঙ্কট্যাঙ্ক (Think Tank) হিসাব কষে দেখিয়ে দেন যে, আগামী দু'দশকের মধ্যে বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী চারটি অর্থনীতির মধ্যে তিনটি মাথা উঁচু করবে এশিয়া থেকে। ২০২০ সাল নাগাদ চীন যুক্তরাষ্ট্রকে ছাড়িয়ে যেতে পারে বিশ্বের এক নম্বর অর্থনৈতিক শক্তিরূপে। অন্য দুটি হবে জাপান এবং পাকিস্তানের সাথে যুদ্ধে জড়িয়ে না পড়লে, ভারত। শুধু তাই নয়, বিশ্বের যে দশটি অর্থনীতি অত্যন্ত প্রভাবশালী হয়ে উঠবে তার ৭টি হবে এশিয়া থেকে–চীন, জাপান, ভারত, ইন্দোনেশিয়া, থাইল্যান্ড, তাইওয়ান এবং দক্ষিণ কোরিয়া। অন্য তিনটির একটি যুক্তরাষ্ট্র এবং অপর দু'টি জার্মানি ও ফ্রান্স। কোনো দেশ অর্থনীতি ক্ষেত্রে প্রবল হয়ে উঠলে তার সামরিক পেশী এমনিতেই শক্তিশালী হয়ে ওঠে। সুতরাং যুক্তরাষ্ট্রের দৃষ্টিতে এশিয়া যে প্রধান হয়ে উঠবে তাতে সন্দেহ কি? **তিন.** গত শতাব্দীর শেষ দশক থেকে যুক্তরাষ্ট্রের আর এক অগ্রাধিকার হয়ে ওঠে বর্তমান সভ্যতার চালিকা শক্তি যে ফসিল ফুয়েল (Fossil Fuel) পেট্রোলিয়াম, তার ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা এবং এর প্রধান উৎস মধ্যপ্রাচ্য ও মধ্য এশিয়া। তেলের সরবরাহ নিশ্চিত করতেই হবে, তা যেকোনো প্রকারে হোক। বিল ক্লিনটনের আমল পর্যন্ত এই তেলের জন্যে সহযোগিতার সূত্রই ছিল মুখ্য। মধ্যপ্রাচ্যে সহযোগিতার সূত্রকে সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে বিল ক্লিনটন ইসরাইলের সাথে ফিলিস্তিন সমস্যার সমাধানের জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন। প্রথমে পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সাটল ডিপ্লোমেসি (Shuttle Diplomacy), পরে তিনি নিজেও উপস্থিত হয়েছেন মধ্যপ্রাচ্যে। কথা বলেছেন ফিলিস্তিন পার্লামেন্টে, ইসরাইলি আইন পরিষদে (Knesset)। অন্যদিকে তিনি একাধিকবার পাঠিয়েছেন তার পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে মধ্য এশিয়ায়। সোভিয়েট ইউনিয়ন থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া ৬টি মুসলিম প্রধান রাষ্ট্রে রয়েছে অফুরন্ত তেল। উজবেকিস্তান ও আজারবাইজানই সাবেক সোভিয়েট ইউনিয়নের তেলের শতকরা ৭০ ভাগ মিটিয়েছে। তুর্কমেনিস্তান, তাজিকিস্তান, কাজাকিস্তান, কিরগিজস্তানেও রয়েছে তেলের বিশাল মজুদ। সহযোগিতার মাধ্যমেই অবশ্য সেই তেল সরবরাহের কথা তখন পর্যন্ত ভাবা হয়েছে। ভাবা হয়েছে বিভিন্ন কারণে। **এক.** তেল প্রয়োজন যুক্তরাষ্ট্রের আধিপত্য সংরক্ষণের জন্যে। **দুই.** প্রয়োজন মিত্র রাষ্ট্রগুলির স্বার্থে, এবং **তিন.** প্রয়োজন প্রতিযোগী বা প্রতিদ্বন্দ্বীকে নিয়ন্ত্রণে রাখার লক্ষ্যে। যুক্তরাষ্ট্রে বিল ক্লিনটনের মতো প্রেসিডেন্ট থাকলে হয়ত সহযোগিতার মাধ্যমেই এসব সমস্যার সমাধান হত। কিন্তু ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারে এবং পেন্টাগনে যা ঘটে তা যুক্তরাষ্ট্রের নীতি-নির্ধারকদের হতচকিত করে তোলে। বৈপ্লবিক পরিবর্তন আসে যুক্তরাষ্ট্রের নীতিনির্ধারকদের দৃষ্টিভঙ্গিতে।

www.pathagar.com

জার্মান দার্শনিক নীটসের (Friedrich Wilhelm Nietzsche) কথায় "অসুস্থ ব্যক্তি সুস্থদের জন্য সবচেয়ে বেশি বিপজ্জনক। সবচেয়ে বেশি শক্তিমানের পক্ষ থেকে শক্তিশালীর নিকট কোনো বিপদ আসে না। বিপদ আসে সবচেয়ে দুর্বলের নিকট থেকে" ["The sick are the greatest danger for the healthy ; it is not from the strongest that harm comes to the strong, but from the weakest"- *Genealogy of Morals' Aphorism.* 14]" জর্জ ডব্লিউ বুশকে সরাসরি অসুস্থ বলতে এখনো আমরা দ্বিধাগ্রস্ত, কিন্তু তাকে জর্জ ওয়াশিংটন, জেফারসন, ম্যাডিসন, আব্রাহাম লিঙ্কন, উইলসন বা রুজভেল্ট বা কেনেডীর উত্তরাধিকারী ভাবতেও আমরা দ্বিধান্বিত হই। সত্যি বটে, ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বরের দুর্ঘটনা যুক্তরাষ্ট্রের শক্তিমত্তার কতকগুলি বৈশিষ্ট্য উন্মোচিত করেছে। **এক.** বর্তমান বিশ্বের একমাত্র পরাশক্তি যুক্তরাষ্ট্র ঐ ঘটনার পরে আর কোনো দুর্ভেদ্য দুর্গ হিসেবে চিহ্নিত হচ্ছে না। একদিকে প্রশান্ত মহাসাগর, অন্যদিকে আটলান্টিক মহাসাগর পরিবেষ্টিত যুক্তরাষ্ট্র, উত্তর ও দক্ষিণে দুর্বল ও নির্ভরশীল রাষ্ট্রবেষ্টিত যুক্তরাষ্ট্র দীর্ঘদিন ধরে যেভাবে নিজেকে বিশ্বময় চিত্রিত করে এসেছে, যেভাবে নিজেকে দুর্ভেদ্য, অজেয় এবং চিরঞ্জীব বলে চিহ্নিত করে আত্মপ্রসাদ লাভ করেছে, ১১ সেপ্টেম্বরের ঘটনা তার বেশ খানিকটা ধসিয়ে দিয়েছে। **দুই.** ১৯৪১ সালের ডিসেম্বরে যুক্তরাষ্ট্রের প্রান্তসীমায় পার্ল হারবারে আক্রমণের পরে যুক্তরাষ্ট্রের হার্টল্যান্ডে সেদিনের হামলা, বিশেষ করে বিশ্বের সবচেয়ে সুরক্ষিত পেন্টাগনে সরাসরি আক্রমণ যুক্তরাষ্ট্রের নীতি-নির্ধারকদের অক্ষমতা ও ব্যর্থতা বিভিন্নভাবে প্রকাশিত হল। যে মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থাগুলি বিশ্বময় মোড়লি করে ফিরেছে এতদিন, বিশ্বের ছোট-বড় অসংখ্য জনপদের তথ্যসম্ভারে সুসজ্জিত হয়ে অনেক জনপদের নেতানেত্রীর ত্রাস হিসেবে মাঝে মাঝেই আবির্ভূত হয়েছে, তাদের ব্যর্থতা প্রকট হয়ে ওঠে। নিজের ঘর সামলাতেই যারা ব্যর্থ কীসের দক্ষতা তাদের? সমগ্র ঘটনাটি যুক্তরাষ্ট্রের গোয়েন্দা সংস্থাসমূহের ভাবমূর্তি ধূলায় মিশিয়ে দিয়েছে। হামলাকারীরা যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থান করেই, যুক্তরাষ্ট্রের বিমান ছিনতাই করে নিখুঁতভাবে সুনির্দিষ্ট টার্গেটে আঘাত করল। আঘাত করল বিশ্বের সবচেয়ে সুরক্ষিত কার্যালয় পেন্টাগনে এবং তাও বেশকিছু সময় নিয়ে। এসব কীসের লক্ষণ? এ তো পরাশক্তিসুলভ দক্ষতার পরিচায়ক নয়। **তিন.** আজকের প্রযুক্তি যে পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে এবং তা যতটুকু বিশ্বজনীন হয়ে উঠেছে, সে প্রেক্ষিতে যুক্তরাষ্ট্র বিশ্ব জনমতের প্রত্যাশার সঙ্গে সমন্বয় সাধনে ব্যর্থ হলে আজকের বিশ্বে একক পরাশক্তিরূপে যুক্তরাষ্ট্রের যে ভূমিকা তা ম্লান হতে বাধ্য। ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু থেকে সরে আসারও সম্ভাবনা সৃষ্টি হবে অদূর ভবিষ্যতে।

যুক্তরাষ্ট্রের জীবনে এই দুর্ঘটনা এক ধরনের ওয়াটারশেডের (Watershed) মতোই। অত্যন্ত জটিল প্রক্রিয়ায় যুক্তরাষ্ট্রের নীতি-নির্ধারকদের এই চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করার কথা ছিল। জেফারসন অথবা লিঙ্কন, এমনকি কেনেডী এই অবস্থায় পড়লে সমস্যার

www.pathagar.com

সমাধান হত অন্য পন্থায়। জর্জ বুশ কিন্তু বুশই। কোনো সৃজনশীল প্রতিভা বুশ নন। অমর নাট্যকার শেকসপিয়ার (William Shakespeare) তার অত্যন্ত নামকরা নাটক *Twelfth-Night* এর চতুর্থ অঙ্কের ১৫৯ লাইনে লিখেছেন : "কেউ বড় হয়ে জন্ম গ্রহণ করে। কেউ বা বড়ত্ব অর্জন করে, এবং কারো কারো উপর বড়ত্ব চাপিয়ে দেয়া হয়" ["Some are born great, some achieve greatness, and some have greatness thrust upon them"] জর্জ বুশ শেকপিয়ারের তৃতীয় পর্যায়ের নেতা–বিশ্বের একমাত্র পরাশক্তির তৃতীয় মানের জননায়ক। তাই কোনো উন্নত ভাবনায় উদ্দীপ্ত না হয়ে, ওয়াশিংটনকেন্দ্রিক সমমনাদের সমন্বয়ে সংগঠিত লিঙ্ক টাঙ্কের মাধ্যমে রচনা করেছেন নতুন আমেরিকান শতাব্দী প্রকল্প (Project for the New American Century- PNAC) । এই প্রকল্পে একুশ শতকে যুক্তরাষ্ট্রের জন্যে এক সাম্রাজ্য তৈরির কথা বলা হয়েছে। ঐ সাম্রাজ্যে ভেটো ক্ষমতার অধিকারী একমাত্র যুক্তরাষ্ট্র। শুধু যুক্তরাষ্ট্রই চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের অধিকারী। কোনো উন্নত শিল্পায়িত জাতিরও আঞ্চলিক অথবা বিশ্ব পর্যায়ে ক্ষমতা প্রয়োগের সুযোগ থাকবে না। এই PNAC এর কর্তাব্যক্তিদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন ভাইস প্রেসিডেন্ট ডিক চেনি, ডোনাল্ড রামসফিল্ড, রিচার্ড পার্ল, পল উলফোউইজ, জর্জ বুশের ভ্রাতা জেব বুশ প্রমুখ। ২০ মার্চে ইরাক আক্রমণের পরের দিন ২১ মার্চে রিচার্ড পার্ল আমেরিকার Enterprise Institute-এ এক ব্রিফিং সেশনে বলেছেন, ইরাক দখলের পরে যুদ্ধোত্তর স্বল্পকালীন কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে জাতিসংঘের বৈপ্লবিক সংস্কার, ইরান ও সিরিয়ার শাসকগোষ্ঠীর পরিবর্তন (regime change) এবং ফ্রান্স ও জার্মানির প্রতিবাদী ডানাগুলি ছেঁটে ফেলা। দীর্ঘকালীন কর্মসূচির কোনো অবয়ব প্রকাশিত না হলেও অনুধাবনে কোনো অসুবিধা হয় না, যুক্তরাষ্ট্র কোন দিকে ছড়ি ঘোরাতে চাইছে অদূর ভবিষ্যতে।

প্রথমে দেখা যাক, যুদ্ধোত্তর পর্যায়ে যুক্তরাষ্ট্রের স্বল্পকালীন পরিকল্পনা কি। PNAC এর সদস্যদের দিকে তাকিয়ে বলতে কোনো দ্বিধা নেই যে, তারা যেসব স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করছেন তা বাস্তবায়িত না করে ছাড়বেন না। ইরাকের মতো একটি যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ কি বিশ্বের একমাত্র পরাশক্তি যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিদ্বন্দ্বী হতে পারে? ব্রিটেনের মতো একটি বৃহৎশক্তির প্রতিদ্বন্দ্বী ইরাক হয় কীভাবে? বাস্তবে কিন্তু তাই হয়েছে, কেননা সমগ্র মধ্যপ্রাচ্য সম্পর্কে–পশ্চিম এশিয়া ও উত্তর আফ্রিকা সম্পর্কে যুক্তরাষ্ট্রের এক সুদূরপ্রসারী মতলব রয়েছে। রয়েছে এক ধরনের দূরবর্তী লক্ষ্য। এই লক্ষ্য অর্জনের ক্ষেত্রে কোনো বৈধতার প্রশ্ন অথবা নীতি-নৈতিকতার কোনো জটিলতাকে যুক্তরাষ্ট্রের নীতি-নির্ধারকরা মোটেই আমলে আনতে চান না। অন্তত PNAC তে তার কোনো নমুনা নেই। বরাবরের মতো এবারও মেকিয়েভেলি হয়েছেন তাদের প্রথম এবং প্রধান গুরু।

বিশ্বের একমাত্র পরাশক্তিরূপে চিরকাল যুক্তরাষ্ট্রকে টিকে থাকতে হবে। বর্তমান সভ্যতার কর্ণধাররূপে তাদের স্থায়িত্ব পেতেই হবে। এজন্যে আধুনিক সভ্যতার চালিকাশক্তি যে ফসিল ফুয়েল তার ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতেই হবে। রিপাবলিকান পার্টির অয়েল লবির অন্যতম মুখপাত্র হিসেবে মধ্যপ্রাচ্যের তেলের প্রতি তাই জর্জ

www.pathagar.com

বুশের দৃষ্টি পড়বেই। তার শীর্ষস্থানীয় অর্থনৈতিক উপদেষ্টা ল্যারি লীন্ডসে (Larry Lindsay) বলেছেন, উপসাগরীয় যুদ্ধের আগে (১৯৯১) ইরাক প্রতিদিন ৩৫ লাখ ব্যারেল তেল উৎপাদন করত। এখন আভাস দেয়া হচ্ছে, যুক্তরাষ্ট্রের সহায়তায় ইরাকে প্রতিদিন ৫০ লাখ ব্যারেল তেল উৎপাদিত হতে পারে। খ্যাতনামা সাময়িকী *The Economist* ৮ এপ্রিলের সংখ্যায় এই ইঙ্গিত দিয়েই লিখেছে, "যত তাড়াতাড়ি ইরাকে তেলের উৎপাদন পরিপূর্ণভাবে শুরু হবে বিশ্ব অর্থনীতিতে তত তাড়াতাড়ি এর শুভ প্রভাব পড়বে।" ইরাকী তেলের দিকে দৃষ্টি রেখেই আগ্রাসনের সময় ইরাকের সর্বত্র নির্বিচারে বোমা বর্ষণ করা হয়েছে, কিন্তু ইরাকের তেল মন্ত্রণালয় রয়েছে অক্ষত। দক্ষিণ ইরাকের বিভিন্ন শহরে ব্রিটিশ ও যুক্তরাষ্ট্র বাহিনী সবকিছু তছনছ করেছে, কিন্তু তেল ক্ষেত্রগুলি প্রায় অক্ষত। ইরাকের যেসব স্থানে তেলক্ষেত্র রয়েছে সেগুলির দখলই যুক্তরাষ্ট্রের মেরিনদের প্রধানতম লক্ষ্য।

তেল সম্পদকে কুক্ষিগত করার লক্ষ্যে বুশ-ব্লেয়াররা সমগ্র মধ্যপ্রাচ্যের মানচিত্রে ব্যাপক পরিবর্তনেও উদ্যোগী হতে পারেন। সাদ্দাম হোসেনের মতো কোনো "অবাধ্য" অথবা "বেয়াড়া" নেতা যেন আর মুখোমুখি হতে না পারে তাও নিশ্চিত করতে তারা বদ্ধপরিকর। সবকিছুকে কেটে ছেঁটে সমগ্র অঞ্চলব্যাপী যেন বিদ্যমান থাকে কুয়েত বা কাতার বা বাহরাইনের মতো ছোট ছোট জনপদ। প্রয়োজনবোধে একটি মাত্র ধমকেই যেন সব ঠাণ্ডা হয়ে যায়। এর সাথে জড়িয়ে রয়েছে মধ্যপ্রাচ্যের অভিসম্পাতস্বরূপ যে ইসরাইল তার স্বার্থ। ইসরাইলও ইরাক থেকে তেল চায়। বিশেষ করে ইরাকের উত্তরাঞ্চলে মসুল থেকে তেলের প্রবাহ যেন হাইফা পর্যন্ত অব্যাহত থাকে তাও যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম লক্ষ্য। বর্তমানে ক্ষমতাসীন জেনারেল গার্নারকে সেই লক্ষ্যেই ইরাকে বসানো হয়েছে। PNAC-এর সদস্যবৃন্দের দিকে দৃষ্টি দিন, অনুধাবনে বিন্দুমাত্র অসুবিধা হবে না যে, একদিকে তারা যুক্তরাষ্ট্রের তেল লবির প্রতিনিধিত্ব করছেন, অন্যদিকে তেমনি ইহুদী লবিরও মুখপাত্র। ইসরাইলকে মধ্যপ্রাচ্যে একটি আঞ্চলিক শক্তিতে রূপান্তরিত করতে পারলে কোনো আরব রাষ্ট্রের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রকে আর প্রত্যক্ষ সমরে অবতীর্ণ হতে হবে না। এতদিন যে ইসরাইল মধ্যপ্রাচ্যে যুক্তরাষ্ট্রের প্রক্সি দিয়ে এসেছে তখন ইসরাইলই সব দিক সামলাবে। ১৯৯১ সালের উপসাগরীয় যুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত ইসরাইলই মধ্যপ্রাচ্যে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধিত্ব করেছে। ১৯৯১ সালে বেশ কয়েকটি আরব রাষ্ট্রের আমন্ত্রণে যুক্তরাষ্ট্র সশরীরে উপস্থিত হয় মধ্যপ্রাচ্যে। ২০০৩ সালের ইরাক আগ্রাসনের পরে যুক্তরাষ্ট্র মধ্যপ্রাচ্যে প্রত্যক্ষভাবে আধিপত্য বিস্তারে মনোযোগী হতে পারে। সউদী আরব সম্পর্কেও রয়েছে তাদের এক অশুভ পরিকল্পনা। ১১ সেপ্টেম্বরের দুর্ঘটনায় যেসব বৈমানিক অংশগ্রহণ করেন তাদের তিন-চতুর্থাংশই এক সময়ে সউদী আরবের নাগরিক ছিলেন। একথা জর্জ বুশ কখনো ভোলেন না। তাছাড়া, গত হজ্জের সময় প্রায় ২৬ লক্ষ দেশ-বিদেশের হজ্জ পালনকারীদের উদ্দেশ্যে যে খুতবা দেয়া হয় তাও শুনেছেন জর্জ বুশ। বিদেশী চক্রান্তকারীরা কীভাবে আরবের সম্পদে ভাগ বসাতে চাচ্ছে এবং কীভাবে ঈমানী শক্তিতে তা মোকাবেলা করা সম্ভব তাই ছিল সেই খুতবার মূল কথা। সুতরাং, ইউরোপে যেমন

www.pathagar.com

পোপকে আটকে রাখা হয়েছে শুধুমাত্র পবিত্র ভ্যাটিকান সিটিতে, তেমনি শুধু মক্কা ও মদিনা সমন্বয়ে একটি রাষ্ট্র গঠন করে ঐসব খুতবা দানকারীকে আটকাতে চান তারা। তেলসমৃদ্ধ আরবের অন্যান্য অংশের সমন্বয়ে আর একটি রাষ্ট্র গঠনের পরিকল্পনাও অবান্ত র নয়। ইরান সম্পর্কেও রয়েছে তাদের চিন্তাভাবনা। আফগানিস্তানে এরই মধ্যে যে হামিদ কারজাই মডেল কার্যকর করেছে যুক্তরাষ্ট্র, মধ্যপ্রাচ্যে তার অনুকরণ বিশ্ববাসী দেখতে পারে।

PNAC-এর অন্যতম লক্ষ্য হল জাতিসংঘের বৈপ্লবিক সংস্কার (radical reform) সাধন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে জাতিসংঘের সৃষ্টি হয়েছিল। তাতে শক্তির নিরিখে তখনকার বাস্তবতা প্রতিফলিত হয়। মিত্র বাহিনী (Allied Forces)-বিজয়ী হবার পরে জাতিসংঘে যে সিন্ডিকেট তৈরি হয় তাতে স্বাভাবিকভাবেই ভেটো দানের ক্ষমতা নিয়ে তদানীন্তন বিশ্বের বৃহৎ পাঁচ শক্তি – যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েট ইউনিয়ন, যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স এবং চীন (জাতীয়তাবাদী)-এই আন্তর্জাতিক সংস্থার স্থায়ী সদস্য হয়। জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠিত হবার পূর্বে বিশ্বের প্রভাবশালী রাষ্ট্রগুলির দিকে তাকিয়ে দেখুন। ক্ষমতার মদে মত্ত জার্মানি বিভক্ত, বিধ্বস্ত, পদানত। ফ্যাসিস্ট ইতালি ধ্বংসপ্রাপ্ত, মিত্র শক্তির অনুকম্পার পাত্র। পূর্ব প্রান্তের জাপান পদদলিত, সার্বভৌমত্ববিহীন, দখলীকৃত এক জনপদ। ফ্রান্স, যুক্তরাজ্য ক্লান্ত, শ্রান্ত বটে, কিন্তু বিজয়ী মিত্রশক্তির গর্বিত অংশীদার। চীন খণ্ডছিন্ন, শতধা বিভক্ত হলেও মিত্রশক্তির অংশ। কিংবদন্তির ফিনিক্সের (Phoeniex) মতো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভস্মস্তূপ থেকে নতুন বিক্রমে পরম পরাক্রমশালীরূপে বেরিয়ে এল পূর্বে সোভিয়েট ইউনিয়ন ও পশ্চিমে যুক্তরাষ্ট্র, বিশ্বের দুই পরাশক্তিরূপে। স্বাভাবিকভাবেই যুদ্ধোত্তর বিশ্বে মিত্রশক্তির উদ্যোগে রচিত জাতিসংঘের কাঠামো কেমন হবে তা সহজেই অনুমান করা যায়। ৫টি বৃহৎ শক্তির হাতে নাকচ করা (Veto) ক্ষমতা অর্পণ করা হয়। বৃহৎ শক্তিগুলির হাতে এই ভেটো ক্ষমতা প্রদানের ভিত্তি ছিল দুটি : **এক.** এই বিশ্বাস যে বিশ্বশক্তি রক্ষায় বা নিরাপত্তা বিধানে মুখ্য ভূমিকা পালন করতে পারে এই পাঁচটি শক্তি। **দুই.** বিশ্বময় বৃহৎ শক্তিরূপে এই পঞ্চ শক্তির স্বীকৃতি। জাতিসংঘ গঠিত হয় ৫১টি রাষ্ট্রের সমন্বয়ে। এদের মধ্যে কয়েকটি তখনো স্বাধীনতা লাভ করেনি, যেমন ভারত। আজ এই সংস্থার সদস্য সংখ্যা হয়েছে ১৯১। তখন নিরাপত্তা পরিষদের সদস্য সংখ্যা ছিল ১১। এখন হয়েছে ১৫। এর মধ্যে ৫ জন স্থায়ী সদস্য। ৫ জনের একজনের অর্থাৎ চীনের প্রতিনিধিত্ব করেছে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত তাইওয়ান এবং তাও যুক্তরাষ্ট্রের জেদের কারণে। সোভিয়েট ইউনিয়নের পতনের পরে স্থায়ী আসনটি লাভ করেছে রাশিয়া, ১৯৯১ সালে।

এসব ছোটখাটো পরিবর্তন ছাড়াও বিশ্বময় রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। রাশিয়া এখন আর পরাশক্তিরূপে বিবেচিত হচ্ছে না, যদিও জাপান মাথা উঁচু করেছে অর্থনৈতিক পরাশক্তিরূপে, যদিও এখনো তা যুক্তরাষ্ট্রের শতকরা ৪০ ভাগের মতো। ধ্বংসস্তূপ থেকে উঠে আসে জার্মানি অমিত তেজে। যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে একদিন সূর্য অস্ত যেত না, তার দিন শেষ হয়েছে। যুক্তরাজ্য এখন বৃহৎ শক্তি বটে, কিন্তু প্রথম কাতারের নয়। আগামী দুই দশকে চীন যুক্তরাষ্ট্রকে ছাড়িয়ে

www.pathagar.com

যেতে পারে। ভারত অগ্রসর হচ্ছে দ্রুতগতিতে। অন্যকথায়, যুক্তরাষ্ট্রই বর্তমান বিশ্বের একমাত্র পরাশক্তি। রাশিয়ার অস্ত্রসম্ভার রয়েছে বটে, কিন্তু তার অর্থনৈতিক পেশী দুর্বল হয়েছে। ফ্রান্স একটি বৃহৎ শক্তি, কিন্তু তার বেশি কিছু নয়। জার্মানিতে এখনও রয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের মেরিন। অস্ত্রশস্ত্রের নিরিখে জাপান প্রায় শূন্যহস্ত। যুক্তরাজ্য যুক্তরাষ্ট্রের অনুগত হিসেবে শুধু দয়ার পাত্র। এই অবস্থায় যুক্তরাষ্ট্র চায় জাতিসংঘের কাঠামো এমন হোক যেক্ষেত্রে ভেটো দেবার ক্ষমতা শুধু তারই থাকে। ইরাকে আগ্রাসনের সময় যে পাঁচটি বৃহৎ শক্তির ভেটো ক্ষমতা রয়েছে তাদের তিনটিই এর বিরোধিতা করেছিল। জাতিসংঘের যে প্রস্তাব অর্থাৎ ১৪৪১ নং প্রস্তাব বাস্তবায়নের জন্যে যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্য ইরাক আক্রমণ করেছে, বিধি মোতাবেক তা বাস্তবায়িত করার কথা ছিল জাতিসংঘেরই। জাতিসংঘকে অবহেলাভরে প্রত্যাখ্যান করে অগ্রসর হয়েছে যুক্তরাষ্ট্র এবং ভবিষ্যতেও তার জাতীয় স্বার্থ সংরক্ষণের জন্যে এমনি পদক্ষেপ গ্রহণ করতে চায়। জাতিসংঘ যেন কোনো বাধা হয়ে না দাঁড়ায় তাই তার ডানাগুলি ছেঁটে দিতেও যুক্তরাষ্ট্র তৈরি। আর একটি লক্ষ্য অর্জনে এই মুহূর্তে বদ্ধপরিকর বলে মনে হয় এবং তা হল মধ্যপ্রাচ্যসহ সমগ্র বিশ্বে অস্ত্রের বাজারকে চাঙ্গা করতে। ইরাকে আগ্রাসন শুরু করার পূর্বে যেভাবে জর্জ বুশ ৪৮ ঘণ্টার চরমপত্র পাঠিয়েছিল ইরাকের প্রেসিডেন্টের নিকট, তা পর্যালোচনা করুন, বলতে কোনো দ্বিধা নেই, ভীষণ মারাত্মক এই বক্তব্য। মধ্যযুগে এবং প্রাচীনকালে যেভাবে might is right তত্ত্বের প্রয়োগ ঘটত, একুশ শতকে উন্নততর বিশ্বসভ্যতার একালে, ক্ষমতাদর্পী জর্জ বুশ ঠিক তেমনটি করেছেন। চরমপত্রে বলা হয়, একটি স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট যেন তার সন্তান-সন্ততিসহ দেশের বাইরে চলে যান। তা না হলে যুদ্ধ অনিবার্য। কত অনৈতিক এবং অগণতান্ত্রিক, কত স্বেচ্ছাচারি ও ক্ষমতাশ্রয়ী এই উচ্চারণ। একটি স্বাধীন দেশের প্রেসিডেন্ট তার কথায় দেশ ছেড়ে চলে যাবেন ভিন দেশে। ইরাকী আক্রমণকে বুশ-ব্লেয়াররা চিহ্নিত করেছেন "ইরাক ফ্রিডম অপারেশন" রূপে। আবির্ভূত হতে চেয়েছেন ইরাকীদের ত্রাতা হিসেবে। বুশ-ব্লেয়ারের এই ঔদ্ধত্যপূর্ণ উচ্চারণ বিশ্ব ব্যবস্থায় মারাত্মক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে। বৃহৎ কোনো রাষ্ট্রের পাশে ছোট ছোট রাষ্ট্রগুলির অবস্থানকে অনিশ্চিত করে তুলেছে। জাতিসংঘ ঠুঁটো জগন্নাথে রূপান্তরিত হয়েছে। ছোট ছোট রাষ্ট্র নিছক আত্মরক্ষার্থে অস্ত্র সংগ্রহের দিকে তাদের দুর্মূল্য সম্পদ বিনিয়োগে আগ্রহী হয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রের জোরপূর্বক এই regime change প্রক্রিয়া অনেকটা ইচ্ছাকৃত। জেনেশুনেই তারা এ পথে পা চালিয়েছে। এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তাদের মতে "সন্ত্রাসী রাষ্ট্র" (rogue state) বা স্বাধীনচেতা রাষ্ট্রের সামনে যেমন যুক্তরাষ্ট্রের অমিতবিক্রমের প্রদর্শনী সুস্পষ্ট হয়েছে, অন্যদিকে তেমনি তার মন্দা অর্থনীতিতে নতুন প্রাণ সঞ্চারের পথ প্রশস্ত হয়েছে। গত শতাব্দীর শেষ দিক থেকে বিশ্ব অর্থনীতিতে যে প্রচ্ছন্ন মন্দাভাব চলে আসছে তা যুক্তরাষ্ট্রের নীতি-নির্ধারকদের উদ্বেগ বাড়িয়ে দিয়েছে। এখনো তারা স্মরণ করছেন কীভাবে ১৯৩০ সময়কালের মহামন্দার হাত থেকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মাধ্যমে অব্যাহতি পেয়েছিলেন। আমেরিকার সমাজ এক অর্থে কনজুমার্স সোসাইটি

www.pathagar.com

(Consumer's Society)। এ সমাজ বিশ্বের সবচেয়ে ঋণগ্রস্ত সমাজ। প্রতিবছর এই ঋণের জন্যে প্রায় ২০০ বিলিয়ন ডলার পরিশোধ করতে হয় সুদ হিসেবে এবং তা যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় উৎপাদনের প্রায় শতকরা ১০ ভাগ। এভাবে বাণিজ্য ঘাটতি চলতে থাকলে আগামী দশ বছরে ঋণের সুদ হিসেবে মোট জাতীয় উৎপাদনের প্রায় অর্ধেক তুলে দিতে হবে। এই অবস্থায় ইরাকের মতো তেলসমৃদ্ধ দেশ দখল এবং এর সম্পদ লুট করা ছাড়া এবং সাথে সাথে বিশ্বময় অস্ত্রের বাজারকে প্রাণবন্ত করা ছাড়া অন্য পথ তাদের সামনে ছিল না। এই আগ্রাসনের ফলে বিশ্বের ছোট ছোট দেশে অস্ত্রের রফতানি বৃদ্ধি পাবে। বিজিত এলাকায় বিজিত দেশের সম্পদের ওপর নির্ভর করে যুক্তরাষ্ট্রের কয়েক লক্ষ সৈনিকের বিলাসী জীবন অতিবাহিত হতে থাকবে। ইরাকের পুনর্গঠনের নামে যুক্তরাষ্ট্রের বেশকিছু বহুজাতিক কর্পোরেশন ফেঁপে ফুলে উঠবে। যুদ্ধের ব্যয় পরিশোধের নামে ইরাকী তেলের বিক্রয়মূল্য দিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের অর্থভাণ্ডার সমৃদ্ধ হবে। এসব তথ্য আমেরিকার জনগণকে বুঝিয়ে জর্জ বুশ দেশের প্রায় ৭০ ভাগ জনসমষ্টির সমর্থন আদায় করেছেন।

এ তো গেল PNAC এর স্বল্পকালীন লক্ষ্য। এর দীর্ঘকালীন লক্ষ্য অত্যন্ত সুদূরপ্রসারী। এ বিষয়েও যুক্তরাষ্ট্রের Think Tank সুস্পষ্ট করেছে কয়েকটি লক্ষ্য। **এক.** আমেরিকায় (উল্টর-দক্ষিণ) কুইন্সি অ্যাডামস (John Quincy Adams) কর্তৃক ১৮২৩ সালে প্রণীত মনরো ডকট্রিনের (Monroe Doctrine) আওতায় অন্য কোনো শক্তি যেন কোনোরূপ হস্তক্ষেপ করতে না পারে তা নিশ্চিত করতে হবে। **দুই.** যুক্তরাষ্ট্রের প্রাইওরিটি জোন (Priority Zone) ইউরোপে যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাবকে আরো গভীর করতে হবে। অতি সম্প্রতি ফ্রান্স ও জার্মানি যেভাবে ইরাকে যুক্তরাষ্ট্রের আগ্রাসনের বিরোধিতা করেছে তা স্মরণে রেখে ফ্রান্সকে সম্ভব হলে নিয়ন্ত্রণে আনতে হবে, তা না হলে শিক্ষা দিতে হবে। জার্মানিতে যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাবকে আরো দৃঢ় করতে হবে। **তিন.** যেসব অঞ্চলে ফসিল ফুয়েলের উৎস, সেই সব অঞ্চলকে শক্ত হাতে নিয়ন্ত্রণে আনতে হবে এবং প্রয়োজনবোধে ঐসব অঞ্চলে আমেরিকান মেরিনদের স্থায়ী ঘাঁটির ব্যবস্থা করতে হবে। এই লক্ষ্যেই যুদ্ধবিধ্বস্ত অর্ধমৃত আফগানিস্তানে যুক্তরাষ্ট্র আক্রমণ পরিচালনা করে তার সামরিক বাহিনীর জন্যে স্থায়ী অবস্থানের ব্যবস্থা করে ২০০১ সালে। একদিকে রাশিয়া, অন্যদিকে চীন এবং অপরদিকে পাকিস্তান-ভারত, মধ্য এশিয়ার প্রবেশদ্বার আফগানিস্তানে যুক্তরাষ্ট্রের আক্রমণের লক্ষ্য শুধুমাত্র ওসামা বিন লাদেন বা তার আশ্রয়দাতা মোল্লা ওমরকে খুঁজে বের করাই ছিল না, মধ্য এশিয়ার কৌশলগত অবস্থানের আফগানিস্তানকে দখল করাই ছিল মুখ্য, কেননা মধ্য এশিয়ার তেল তার প্রয়োজন সবচেয়ে বেশি। ইরাক থেকে সাদ্দাম হোসেনকে বিতাড়িত করার পেছনে যুক্তরাষ্ট্রের প্রধানতম উদ্দেশ্য ইরাকের তেল সম্পদের দখলদারিত্ব। যে যাই বলুক, ইরাক ছেড়ে যুক্তরাষ্ট্র সহজে যাচ্ছে না যে তা একরকম নিশ্চিত। **চার.** প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে চিহ্নিত চীনের পশ্চিম প্রান্তে (পাকিস্তান, উত্তর ভারত, নেপাল, ভুটান, বাংলাদেশ) এবং চীনের কাছাকাছি কোনো এক স্থানেও স্থায়ী অবস্থান যুক্তরাষ্ট্রের জন্যে অপরিহার্য। প্রয়োজনবোধে দক্ষিণ এশিয়ার ভারতের সাথে প্রভাব বলয় ভাগাভাগি

www.pathagar.com

করে, তা না হলে প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টির মাধ্যমে। এই অঞ্চলেও চায় যুক্তরাষ্ট্রের স্থায়ী ফুটহোল্ড (foothold)। **পাঁচ.** দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় যুক্তরাষ্ট্রের স্থায়ী অবস্থান প্রয়োজন। দক্ষিণ কোরিয়ার মাধ্যমেই হোক অথবা জাপানের সাথে যোগসাজশের মাধ্যমেই হোক উত্তর কোরিয়াকে বশে আনতে হবে এবং এই অঞ্চলে যেন কোনো নতুন উপদ্রবের সৃষ্টি না হয় সেজন্যে আমেরিকান মেরিনের প্রহরা অপরিহার্য। **ছয়.** ভারত মহাসাগর এবং পূর্ব প্রশান্ত মহাসাগরীয় রুট যেন অবাধ ও নিরুপদ্রব হয় তাও যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম অগ্রাধিকার। দিয়েগো গার্সিয়া থেকে পূর্ব প্রশান্ত মহাসাগরের দীর্ঘ পথে কেউ যেন কোনো প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি না করতে পারে তা নিশ্চিত করা যুক্তরাষ্ট্রের এই সময়ের হাই প্রাইওরিটি।

এসব পর্যালোচনা করলে অনুধাবনে কোনো অসুবিধা হয় না যে, ২০০৩ সালে ইরাকে যে আগ্রাসন চালানো হল যুক্তরাষ্ট্রের অভিসন্ধির দীর্ঘ চেইনে তা একটি লিংক মাত্র, যুক্তরাষ্ট্রের নগ্ন শক্তি প্রদর্শনের দীর্ঘ নাটকের একটি অঙ্ক মাত্র। ২০০১ সালের শেষ দিকে "Infinite Justice" শিরোনামে যার সূচনা, "Iraq Freedom Operation" যে তার সমাপ্তি পর্ব, তা নয়। আগামী বছরগুলিতে যুক্তরাষ্ট্রের পরাশক্তিসুলভ শক্তিমত্তার এমনি নমুনা বিশ্ববাসী দেখবে বহুবার।

কি এই ইরাক?

নিউইয়র্কের অধিবাসী বব ব্রিগস (Joe Bob Briggs) যুক্তরাষ্ট্রের অধিবাসীদের জন্যে ইরাক কি, মানব সভ্যতায় ইরাকের অবদান কি তা নিখুঁতভাবে তুলে ধরেছেন। যখন বুশ-ব্লেয়ারের পূর্ব পুরুষরা আদিম অন্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল, সভ্যতার ছিটেফোঁটাও যখন তাদের স্পর্শ করেনি তখন প্রায় ১২ হাজার বছর পূর্বে, ইরাকে প্রচলিত হয় পানিসেচের মাধ্যমে কৃষি কাজ। ইরাকেই মানুষ প্রথমে লিখতে শেখে। সময় নির্ধারণ প্রক্রিয়ার সূচনা হয়। ব্যাবিলনের সভ্যতার পাদপীঠই ইরাক। আমরাও ছেলেবেলায় মুখস্থ করেছি পৃথিবীর সপ্তাশ্চর্যের অন্যতম ব্যাবিলনের শূন্য উদ্যানের কাহিনী। ১৭৯২ খৃষ্ট পূর্বাব্দে ব্যাবিলনের রাজা হাম্মারাবি (Hammurabi) আইনকে সুনির্দিষ্ট করে সর্বপ্রথম লিখিত আকারে প্রচার করেন। গত শতাব্দীতেও জনৈক প্রত্নতাত্ত্বিক খুঁজে পেয়েছিলেন একটি কালো পাথর-যাতে এসব অনুশাসন লিখিত ছিল। লিখিত ছিল দুর্বল, অসহায়, বিধবা এবং অনাথদের রক্ষা করার কথা। এই ইরাকের দার্শনিকরা পিথাগোরাসের জন্মের প্রায় ১৭০০ বছর পূর্বেই জানতেন তার তত্ত্ব সম্পর্কে। আধুনিক অঙ্ক শাস্ত্রের জন্মভূমি ছিল এই ইরাক। ইরাকের অধিবাসীরা সর্বপ্রথম নগর তৈরি করেন এবং একত্রে নাগরিক জীবনযাপন করেছেন। যুদ্ধে তারাই সর্বপ্রথম অশ্বারোহী বাহিনী সৃষ্টি করেন। সেখান থেকেই রোমানরা তাদের অশ্বারোহী লিজিয়ান (Legion) সৃষ্টি করেন। ইরাকেই সর্বপ্রথম জ্যোতির্বিজ্ঞানের পাঠ শুরু হয়। বাইবেলের সেই "জ্ঞানী ব্যক্তিরা" নক্ষত্র অনুসরণ করে পৌঁছে গিয়েছিলেন সদ্যজাত শিশু যীশুর কাছে। বর্বর হালাকু খানের বাগদাদ লুণ্ঠনের পূর্ব পর্যন্ত বাগদাদে ছিল বেশ কয়েকটি বিশ্ববিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়-যেখানে সভ্য দুনিয়ার বিভিন্ন স্থান থেকে এসে খ্যাতনামা অধ্যাপকগণ

www.pathagar.com

অধ্যাপনা করেছেন। তখন ঐসব শিক্ষায়তনে পঠিতব্য বিষয় ছিল অঙ্ক শাস্ত্র, দর্শন, চিকিৎসা বিদ্যা, সাহিত্য, ধর্মতত্ত্ব প্রভৃতি। এটিও উল্লেখযোগ্য যে, যে রেনেসাঁসের মাধ্যমে ইউরোপে সভ্যতার সূচনা হয় তার মূলেও ছিল বাগদাদের গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত গ্রীক-রোমান দর্শন ও ইতিহাসের মণিমুক্তা।

আজকের ইরাকের নাম তখন ইরাক ছিল না বটে, কিন্তু ইরাকই ইউফ্রেটিস ও টাইগ্রিস নদীর মাঝামাঝি অবস্থানের মেসোপোটেমিয়া ছিল প্রায় আট হাজার বছর পূর্বে। ইরাকই যে খৃষ্টপূর্ব অষ্টম-সপ্তম শতকের আসিরিয়া ছিল, ইরাকই যে খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ-পঞ্চম শতকে সুমেরিয়া ছিল তাতে কোনো সন্দেহ নেই। মুসলিম আমলে আব্বাসীয় খলিফাদের আমলে সহস্র আরব্য রজনীর বাগদাদ তো কিংবদন্তির বাগদাদ। প্রায় হাজার বছর ধরে বাগদাদ ছিল আরব বিশ্বে সাংস্কৃতিক রাজধানী।

এই ইরাক দখলের মধ্যদিয়ে বুশ-ব্লেয়ার আধুনিক কালের ইতিহাসে সৃষ্টি করলেন শুধুমাত্র মানবিক ও আদর্শিক ক্ষেত্রেই নয়, সাংস্কৃতিক ও সভ্যতার ক্ষেত্রেও নজিরবিহীন এক কলঙ্কিত ইতিহাস। ইরাকের প্রত্নসম্পদ লুট চিহ্নিত হয়ে থাকবে এই শতাব্দীর জঘন্যতম অপরাধরূপে। গোল্ডেন হেরোড নামে পরিচিত দুর্দমনীয় অশ্বারোহী বাহিনীর অধিকারী মঙ্গোলরা এককালে ছিলেন অদম্য পরাশক্তি। চেঙ্গিস খান মঙ্গোলদের এই পর্যায়ে উন্নীত করেন। চেঙ্গিস খানের পৌত্র হালাকু খান ১২৫৮ সালে ইরাক আক্রমণ করে বাগদাদে এক নির্মম হত্যাকাণ্ড চালিয়েছিলেন। ৩৭তম আব্বাসীয় খলিফা মোস্ত াকিমকে হত্যা করে আব্বাসীয় খিলাফতের অবসান ঘটালেন। নির্বিচারে হত্যা করলেন নারী-শিশু ও অসহায় মানুষদের, এক হিসেবে প্রায় ১৬ লক্ষ মানব সন্তানকে। আর ধ্বংস করলেন বাগদাদের গ্রন্থাগারের অসংখ্য বই-পুস্তক, হস্তলিপি এবং প্রাচীনকালের সব নিদর্শন। এ প্রসঙ্গে ব্রিটেনের *The Independent* পত্রিকার যুদ্ধক্ষেত্র থেকে তথ্য সংগ্রাহক রবার্ট ফিস্ক তার প্রতিবেদনে বলেছেন, "চেঙ্গিস খানের পৌত্র তেরো শতকে বাগদাদ নগরী জ্বালিয়ে পুড়িয়ে শেষ করেছিল। পোড়া বই এর ধ্বংসাবশেষে টাইগ্রিস নদীর পানি কালো হয়ে গিয়েছিল।" কিন্তু ২০০৩ সালের ১৪ এপ্রিলে আধুনিক সভ্যতার বরপুত্র বুশ-ব্লেয়াররা বাগদাদ দখল করার পরে মূল্যবান গ্রন্থরাজি, দলিল পত্র পোড়ানোর যে মহোৎসব অনুষ্ঠান করে সেই পোড়ানোর ছাইয়ে ইরাকের আকাশ কালো হয়ে গিয়েছিল। আধুনিককালে হিটলার-মুসোলিনের পরে বুশ ও ব্লেয়ার চক্রই বই পোড়ানোর মহোৎসব করেন। ইরাকের ন্যাশনাল লাইব্রেরি ও ন্যাশনাল আর্কাইভস (Archives) ছিল অটোম্যান সম্রাটদের ঐতিহাসিক দলিলপত্রের অমূল্য সম্পদ। সবকিছুকে পুড়িয়ে ছাই করে দেয়া হল। ১ লক্ষ ৭০ হাজার প্রত্ন সমৃদ্ধ এই আর্কাইভসের ৯০ ভাগ সম্পদ বিনষ্ট হয়। তারপর ধর্ম মন্ত্রণালয়ের লাইব্রেরিতে আগুন লাগানো হল। জাতীয় গ্রন্থাগার ও আরকাইভসের সাবেক মহাপরিচালক ড. জুনায়েদ সাইদ আলদায়েজী এই ঘটনাকে মঙ্গোলদের বাগদাদ আক্রমণ থেকেও হিংস্র বলে আখ্যায়িত করে বলেন, এটি ছিল বিশ্বের চতুর্থ যাদুঘর যেখানে প্রস্তর যুগ থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত মানব সভ্যতার নিদর্শনসমূহ স্তর পরম্পরায় ধারাবাহিকভাবে সংরক্ষিত ছিল।

www.pathagar.com

আফগানিস্তানে তালেবান শাসনামলে বামিয়ান প্রদেশের বৌদ্ধমূর্তি ধ্বংস করা হলে এর প্রতিবাদে যারা সবচেয়ে বেশি প্রতিবাদে সোচ্চার হয়েছিলেন, বর্তমান সভ্যতার শীর্ষে অবস্থান গ্রহণকারী বলে যারা নিজেদের সব সময় জাহির করে থাকেন, তাদের দ্বারা এমন জঘন্যতম কাজকে কীভাবে মূল্যায়ন করবেন? বিন লাদেন বা মোল্লা ওমররা ধর্মান্ধ। মুক্তজ্ঞানের চর্চায় তাদের তীব্র অনীহা। কিন্তু বুশ-ব্লেয়ারদের সাঙ্গপাঙ্গরা? অনেকের বিশ্বাস, এই জঘন্যতম ঘটনা ঘটানো হয়েছে পরিকল্পিতভাবে। তা না হলে লুটেরারা যাদুঘরের ভল্ট এর চাবি পায় কীভাবে? বিশ্বের বিজ্ঞ ইতিহাসবিদদের ধারণা, জেনে-শুনেই তারা এ কাজ করেছে। কোনো জাতিকে অধীনতার নাগপাশে বেঁধে ফেলার পূর্বে সেই জাতিকে তার সাহিত্য, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ভুলিয়ে দেবার প্রক্রিয়া সাম্রাজ্যবাদীদের প্রিয় প্রক্রিয়া। যা লুট হয়ে গেছে তা হয়ত দেখা যাবে যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স অথবা জেরুজালেমের বিভিন্ন যাদুঘরের অত্যন্ত মূল্যবান সামগ্রী হিসেবে। যেকোনো যুদ্ধে মানুষ প্রাণ হারায় এবং সাধারণত অসহায়, নারী, শিশু, বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা। দেশের সম্পদও বিধ্বস্ত হয়, বিধ্বস্ত হয় ঐ জাতির প্রতীক তুল্য ঘর-দালান, অট্টালিকা, রাস্তাঘাট ও অন্যান্য সম্পদ। বুশ-ব্লেয়ারদের হাতে ইরাকের ইতিহাস-ঐতিহ্য পর্যন্ত লুণ্ঠিত হল। বিধ্বস্ত হল আট হাজার বছরের অতীত স্মৃতিও। এক্ষেত্রে হেগ কনভেনশন অসহায়।। অসহায় জাতিসংঘ, ইউনেস্কো এবং আইকমের (Intenational Council of Museums-I Com) বিধি- বিধান। অসহায় Interpole-ও। যে মোল্লা ওমরকে বুশরা তীব্র ঘৃণায় দূর দূর করেছেন, সেই মোল্লাই বুশ-ব্লেয়ারের গুরু।

ইরাকের জাতীয় যাদুঘরে সংরক্ষিত ১০ হাজার বছরের পুরনো প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনসমূহ লুট হবার ব্যাপারটি এতই জঘন্য এবং ঘৃণ্য যে এসব রক্ষা করতে ব্যর্থ হবার দায়িত্ব গ্রহণ করে প্রেসিডেন্ট বুশের সংস্কৃতি বিষয়ক উপদেষ্টা কমিটির প্রধান মার্টিন সুলিভানসহ তিনজন উপদেষ্টা পদত্যাগ করেন।

নিষিদ্ধ গণবিধ্বংসী অস্ত্রগুলি গেল কোথায়?

ইরাকের গণবিধ্বংসী অস্ত্রসম্ভার ধ্বংস করার প্রত্যয় ঘোষণা করে যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যের শাসকরা বিশ্বজনমতকে উপেক্ষা করে ইরাকে আগ্রাসন চালায়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেনের অভিযোগ ছিল, ইরাক আন্তর্জাতিক শান্তির প্রতি হুমকি, কারণ তাদের হাতে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে রাসায়নিক ও জীবাণু অস্ত্র। তারা এই অস্ত্র ব্যবহারে সক্ষম এবং প্রয়োজন হলে আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসীদের নিকট পাচার করে দিতেও পারে। যুক্তরাষ্ট্রে এই প্রচারণা যুদ্ধের পক্ষে জনমত সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়। এ প্রসঙ্গে আমেরিকান বিশ্লেষক নোয়াম চমস্কির বক্তব্যও উল্লেখযোগ্য। তার মতে, ইরাকের নিকট যে মারণাস্ত্র রয়েছে এ প্রচারণার মূল হোতা ছিলেন বুশ প্রশাসনের নির্বাচনী প্রচার ম্যানেজার কার্ল রোভ। রিপাবলিকানদের জাতীয় নিরাপত্তার ইস্যু হিসেবে সারা দেশে

www.pathagar.com

তিনিই এই মিথ্যা তথ্য ছড়িয়ে দেন। এটি যে নিছক প্রচারণা ছিল তাতে কোনো সন্দেহ নেই, কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের জনগণ জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থে চাকরি, পেনশন, অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার কথা বাদ দিয়ে প্রেসিডেন্টের নির্বাচনী অভিযানেই শামিল হয় এবং তাই বিশ্বাস করে। ফলে দেখা যায়, ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বরের ঘটনার সময় ইরাক-বিরোধীদের সংখ্যা যুক্তরাষ্ট্রে ছিল শতকরা ৩ ভাগ। ২০০৩ সালের প্রথম দিকে সেই ৩ শতাংশই বেড়ে হয় প্রায় ৬০ কি ৭০ শতাংশ। সমগ্র বিষয়টি ছিল এক প্রচারণা স্টান্ট। কিন্তু এটি এতই শক্তিশালী হয়ে ওঠে যে, যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান নীতি-নির্ধারকদের প্রায় সবাই এটিকে ইরাকের বিরুদ্ধে মারাত্মক মারণাস্ত্ররূপে ব্যবহার করতে থাকেন। পররাষ্ট্রমন্ত্রী কলিন পাওয়েল যুদ্ধের ব্যাপারে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সমর্থন না পেয়ে জাতিসংঘে বলেন, ইরাকে যে এই ধরনের অস্ত্র রয়েছে তার প্রমাণ মার্কিন গোয়েন্দা দপ্তরের হাতেই রয়েছে। জাতিসংঘের প্রধান অস্ত্র পরিদর্শক হ্যান্স ব্লিক্স (Hans Blix) অবশ্য যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেনের কড়া সমালোচনা করে বলেন, তারা অস্ত্র পরিদর্শনের আগেই ইরাকের বিরুদ্ধে যুদ্ধের পরিকল্পনা করেছিল। ইরাকের বিরুদ্ধে আরো একটি অভিযোগ ছিল, আফ্রিকান একটি দেশ থেকে ইরাক ইউরেনিয়াম সংগ্রহ করার চেষ্টা করেছিল। আন্তর্জাতিক এটোমিক এনার্জি কমিশন এই অভিযোগও উড়িয়ে দিয়ে বলেছে, ইরাকের কোনো পরমাণু কর্মসূচি ছিল না। ইরাকের হাতে ১২ থেকে ২০ টি স্কাড (Scud) ক্ষেপণাস্ত্র রয়ে গেছে বলে যে অভিযোগ উত্থাপন করা হয় তারও কোনো সত্যতা মিলেনি। যেসব ভ্রাম্যমাণ জীবাণু অস্ত্রের পরীক্ষাগারের কথা কলিন পাওয়েল বলেছিলেন তারও কোনো প্রমাণ মিলেনি। সবকিছু পর্যালোচনা করে মনে হয়, ইরাক আক্রমণকে যৌক্তিক প্রমাণ করার জন্যে যুক্তরাষ্ট্রের নীতি-নির্ধারকরা যে নাটকের অবতারণা করেছিল তা অনেকটা গ্রাহাম গ্রীনের উপন্যাস *Our Man in Havana* এর মতোই নাটকীয়। ইরাক দখল করে যখন সিরিয়ার দিকে যুক্তরাষ্ট্রের দৃষ্টি পড়েছে তখন তারা সুর পাল্টেছে। বলা শুরু করেছে, ইরাকের মানব বিধ্বংসী অস্ত্রশস্ত্র সিরিয়ায় পাচার হয়ে গেছে। পরে হয়ত বিশ্ববাসী শুনবে, ঐসব অস্ত্রশস্ত্র ইরান বা লিবিয়ায় চলে গেছে। বিশ্বের একমাত্র পরাশক্তি যুক্তরাষ্ট্রের নীতি-নির্ধারকদের এই প্রবঞ্চণামূলক প্রচারণা বিশ্ববাসীকে স্তম্ভিত করেছে। হয়ত এমনও শোনা যাবে কদিন পরে যে, যুক্তরাষ্ট্র থেকে মাত্র ক'দিনের মধ্যে আমদানি করা ঐ ধরনের অস্ত্রশস্ত্র ইরাকে এতদিন পরে আবিষ্কৃ ত হয়েছে। তারা যে সব সময় সত্য কথা বলে থাকে তা প্রমাণিত হতে হবে তো।

এই আগ্রাসনকে মুসলিম বিরোধী বা ইসলাম বিরোধী বলবেন কি?

২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বরের পরবর্তী পর্যায়ে যুক্তরাষ্ট্র যেসব পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে তার অধিকাংশের লক্ষ্যবস্তু মুসলিম জনপদ। ১১ সেপ্টেম্বরের সন্ত্রাসীদের শাস্তি দেবার অঙ্গীকারের সময় জর্জ বুশ নিজেই "ক্রুসেড" (Crusade) শব্দটি উচ্চারণ করেছিলেন,

www.pathagar.com

যদিও পরে তিনি তা প্রত্যাহার করে নিয়েছিলেন। ১১ সেপ্টেম্বরের দুর্ঘটনার সার্বিক এবং তথ্য-নির্ভর প্রমাণ ছাড়াই, শুধুমাত্র সন্দেহের বশবর্তী হয়ে গত দুই দশকে যুদ্ধের আঘাতে আঘাতে জর্জরিত অর্ধমৃত আফগানিস্তানে যুক্তরাষ্ট্র তার সহযোগীদের সাথে নিয়ে অসংখ্য মৃত্যুবাণ নিক্ষেপ করে। যে আফগানিস্তান উগ্র সাম্রাজ্যবাদের আমলেও গত কয়েকশো বছর ধরে স্বাধীন সত্তা বজায় রেখেছিল তা হারায় তার স্বাতন্ত্র্য, তার স্বাধীনতা। আধিপত্যবাদীদের অনুগত প্রতিভূ হামিদ কারজাই-এর নেতৃত্বে সবকিছু জড়োসড়ো জবুথবু হয়ে পড়েছে। "সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধের" (War against Terrorism) এই জিগিরে শামিল হয়েছিল সকল মুসলিম রাষ্ট্র এবং প্রত্যক্ষভাবে সহায়তা করেছিল পাকিস্তান, ইরান, তুরস্ক, উজবেকিস্তান, আজারবাইজান এবং আরো কয়েকটি মুসলিম রাষ্ট্র। আফগানিস্তান দখল করার পরে Terror-Risk Country হিসেবে সন্দেহজনক যে ২৪টি রাষ্ট্রের তালিকা তৈরি হয় তার মধ্যে একমাত্র উত্তর কোরিয়া ব্যতীত সব ক'টি মুসলিম রাষ্ট্র। অত্যন্ত আবেগ-বিহ্বল হয়ে জর্জ ডব্লিউ বুশ "শয়তানের আখড়া" (Axis of Evil) রূপে যে তিনটি রাষ্ট্রের নাম উল্লেখ করেছিলেন তার মধ্যেও একটি বাদ দিয়ে দুটি ছিল মুসলিম রাষ্ট্র–ইরাক এবং ইরান। তার পরেই এই ইরাকী আগ্রাসন।

এই আগ্রাসনে যারা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অংশগ্রহণ করে তাদের দিকে দৃষ্টি দিন, দেখবেন ইরাকের অধিকাংশ প্রতিবেশী এর সাথে সংশ্লিষ্ট ছিল। কুয়েতে সম্মিলিত হয় যুক্তরাষ্ট্রের লক্ষাধিক সৈনিক। কাতার ছিল যৌথবাহিনীর হেড কোয়ার্টার। সেখান থেকে টমি ফ্রাঙ্কস তার বাহিনীগুলিকে নির্দেশ দিতেন। সউদী আরবে জমায়েত হয়েছিল যুক্তরাষ্ট্রের সমরাস্ত্রের বিরাট এক অংশ। উত্তর ইরাকে হামলা চালাবার লক্ষ্যে তুরস্কে অবস্থান গ্রহণ করে প্রায় ৬০,০০০ সৈনিক। ইরাকে যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে যে আগ্রাসন পরিচালিত হয় তার বিরুদ্ধে বিশ্বের সকল জনপদে প্রতিবাদ মিছিল হয়। ধর্ম-বিশ্বাস-রাজনৈতিক মতবাদ নির্বিশেষে বুশ-ব্লেয়ারের এই অভিযানের নিন্দায় কোটি কোটি জনতা মুখর হয়ে ওঠে। মক্কা-মদিনার শ্রদ্ধেয় ইমামগণ এর প্রতিবাদের জন্যে জনতাকে উদ্বুদ্ধ করেন। মাননীয় পোপ পলও এই আগ্রাসনকে সভ্যতা বিরোধী বলে এর নিন্দা করেন। কুসফুসিয়ান চীন, বৌদ্ধ অধ্যুষিত থাইল্যান্ড, জাপান, কোরিয়া, হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ ভারত, এমনকি যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, স্পেন, অষ্ট্রেলিয়াতেও এর তীব্র প্রতিবাদ হয়। কিন্তু মুসলিম রাষ্ট্র ইউএই, আবুধাবী ও অন্যান্য কয়েকটি স্থানে এই আগ্রাসনের বিরুদ্ধে কোনো প্রতিবাদ সভা বা মিছিল সংগঠিত হয়নি। তারপরেও বলবেন এই আগ্রাসন সভ্যতা বিরোধী বা ইসলাম বিরোধী? যেকোনো সংজ্ঞায় এটিকে বলা যেতে পারে মানবতাবিরোধী আগ্রাসন। সভ্যতা বিরোধী আগ্রাসন। আমার নিকট মনে হয়েছে, এই আগ্রাসন হল হাজারো প্রতিবন্ধকতায় ক্লিষ্ট, ভীত, সন্ত্রস্ত যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্বময় একাধিপত্য প্রতিষ্ঠায় কৃত সংকল্প, বেপরোয়া, অনৈতিক এক অভিযান।

বিশ্ব ব্যবস্থায় এই আগ্রাসনের প্রভাব

যুক্তরাষ্ট্র এবং ব্রিটেনের নেতৃত্বে ইরাকে আগ্রাসন বর্তমান বিশ্বব্যবস্থাকে বিপর্যস্ত করে তুলেছে বিভিন্ন দিক থেকে।

www.pathagar.com

প্রথম. জাতিসংঘের অসহায় অবস্থা

গত ৫০ বছর ধরে যে জাতিসংঘ বিশ্বে শান্তি রক্ষা করে এসেছে, বুশ-ব্লেয়ারের দৌলতে তা পরিণত হয়েছে এক ঠুঁটো জগন্নাথে–দন্ত-নখরহীন, নির্বাক, নিষ্প্রভ, এক সম্ভ্রমহীন সংস্থায়। জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে ১৪৪১ নং প্রস্তাব গৃহীত হয় ইরাককে গণবিধ্বংসী মারণাস্ত্র (Weapons of Mass Destruction- WMD) পরিহারে বাধ্য করতে। যেহেতু এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় নিরাপত্তা পরিষদে, এই সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের দায়িত্ব ছিল নিরাপত্তা পরিষদের অথবা নিরাপত্তা পরিষদের অনুমোদন লাভ করে যৌথ বাহিনীর। ১৯৯১ সালের উপসাগরীয় যুদ্ধে ইরাকের হাত থেকে কুয়েতের সার্বভৌমত্ব পুনরুদ্ধারে এই প্রক্রিয়া কার্যকর হয়েছিল। যুক্তরাষ্ট্র জাতিসংঘের অনুমোদন লাভ করার জন্যে অহেতুক চাপ সৃষ্টি করেছে। নিরাপত্তা পরিষদে বিভিন্ন কৌশলে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভের চেষ্টা করেছে। নিরাপত্তা পরিষদের অস্থায়ী সদস্যদের আর্থিক সহায়তা দান, যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে প্রবেশাধিকার দেবার প্রতিশ্রুতি, প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগ প্রভৃতির আশ্বাস দিয়ে তাদের প্রলোভিত করেছে। জাতিসংঘের প্রধান অস্ত্র পরিদর্শকের রিপোর্টকে অগ্রাহ্য করেছে। পররাষ্ট্রমন্ত্রী কলিন পাওয়েল নিরাপত্তা পরিষদে অসত্য ভাষণ দিয়ে সদস্যদের প্রভাবিত করেছে। কিন্তু নিরাপত্তা পরিষদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের অনুমোদন লাভে ব্যর্থ হয়ে নিরাপত্তা পরিষদকে পাশ কাটিয়ে ইরাক আক্রমণ করেছে। ইরাক দখলের পরেও কিন্তু ইরাকে কোনো গণবিধ্বংসী মারণাস্ত্রের খোঁজ মেলেনি। অতীতে দেখা গেছে, জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্রের মধ্যে কোনো যুদ্ধ বা সংঘাত সৃষ্টি হলে নিরাপত্তা পরিষদ যুদ্ধবিরতি প্রস্তাব উত্থাপন করত। নিরাপত্তা পরিষদে কোনো প্রস্তাব গৃহীত না হলে সাধারণ পরিষদ আহ্বান করে বিশ্ব শান্তি হুমকির মোকাবেলার ব্যবস্থা রয়েছে। ইরাকের ক্ষেত্রে কোনোটি সম্ভব হয়নি শুধুমাত্র একমাত্র পরাশক্তির সংশ্লিষ্টতার জন্যে। জাতিসংঘ সাক্ষী গোপালরূপে দাঁড়িয়ে রয়েছে বটে, কিন্তু এর কার্যকারিতা এসব ক্ষেত্রে শূন্যের কোঠায়।

তাছাড়া, আন্তর্জাতিক আইনে দেশ জয় অথবা "আগে ভাগে আক্রমণের" (Pre-emptive attack) কোনো সুযোগ নেই। ১৯৪৬ সালে নুরেমবার্গ ট্রাইব্যুনাল (Nuremberg Tribunal) জার্মানির "প্রয়োজনীয়তা" ('Necessity') যুক্তি খণ্ডন করে " আগেভাগের আক্রমণকে" আন্তর্জাতিক অপরাধ বলে রায় দিয়েছিলেন। ট্রাইব্যুনালের কথায়, "কোনো আগ্রাসন শুরু করা শুধু একটি আন্তর্জাতিক অপরাধ নয়, এটি সবচেয়ে বড়ো আন্তর্জাতিক অপরাধ।" [" To initiate a war of aggression is not only an international crime: it is the supreme international crime....."] এই অপরাধ ঠেকাতে ব্যর্থ জাতিসংঘ এখন অসহায়, যুক্তরাষ্ট্র-নির্ভর এক সংস্থায় রূপান্তরিত হয়েছে।

দ্বিতীয়. শক্তি প্রদর্শনের উচ্চ মাত্রা

যুক্তরাষ্ট্র এবং ব্রিটেনের ইরাক দখল বিশ্বময় শক্তি প্রদর্শনের প্রবণতা ভীষণভাবে বৃদ্ধি করবে। যুক্তরাষ্ট্র প্রথমে ইরাক থেকে গণবিধ্বংসী মারণাস্ত্র আবিষ্কার, গণবিধ্বংসী

www.pathagar.com

মারণাস্ত্রের অনুপস্থিতি সম্পর্কে নিশ্চিত হবার পরে "সরকার পরিবর্তনের" (Regime Change) অজুহাত খাড়া করে এবং সমগ্র অভিযানকে "ইরাককে মুক্তকরণ যুদ্ধ" (Iraq Liberation War) নামে ঝাঁপিয়ে পড়ে গত ১২ বছর ব্যাপী নিরস্ত্রীকরণ প্রক্রিয়ায় অস্ত্রশূন্য ইরাকের উপর। বিশ্বজনমত তাকে নিরস্ত করতে পারেনি। নিরস্ত করতে সক্ষম হয়নি জাতিসংঘের মতো শ্রদ্ধেয় আন্তর্জাতিক সংস্থা। পারেনি থামাতে আরব লীগের মতো সংগঠন বা ইসলামী সংহতি সম্মেলন বা ইউরোপীয় ইউনিয়নের মতো রাষ্ট্রমণ্ডল। ইরাক আগ্রাসনের ক্ষমতার প্রচণ্ডতাই মুখ্য হয়ে ওঠে। ক্ষমতার ঔদ্ধত্যই প্রাধান্য লাভ করে। আগ্রাসনের পরেও আক্রমণকারীদের নিয়ন্ত্রণ অথবা নিরস্ত করার জন্যে কোনো আনুষ্ঠানিক প্রক্রিয়া গৃহীত হল না অথবা কোনো সংস্থা এগিয়ে এল না। ফলে ক্ষমতার ঔদ্ধত্য এখন আন্তঃরাষ্ট্র সমস্যা সমাধানের পন্থারূপে স্বীকৃতি লাভ করল। কে জানে, যুক্তরাষ্ট্রই সর্বাগ্রে এই দৃষ্টান্ত আবারো অনুসরণ করবে। মধ্যপ্রাচ্যে ইজরাইলের নিকট এই দৃষ্টান্ত অনুসরণের পথ প্রশস্ত হল। ফিলিস্তিন ও লেবাননের ভাগ্যে কি আছে কে জানে? দক্ষিণ এশিয়ায় কাশ্মীর সমস্যা, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় উত্তর কোরিয়ার পারমাণবিক স্ট্যাটাস, আফ্রিকার রুয়ান্ডা, সোমালিয়া বা জিম্বাবুয়ের সমস্যা, কে জানে শক্তিমত্তার প্রদর্শনের মাধ্যমেই এসপার ওসপার হতে পারে ভবিষ্যতে।

তৃতীয়. আইনের শাসনের প্রাধান্য হ্রাস

আমাদের দুর্ভাগ্য, যে একুশ শতককে আমরা ন্যায়নীতির শতক বলে চিহ্নিত করার চেষ্টা করেছি, আইনের শাসনের সময়-কাল বলে চিত্রিত করা শুরু করেছি, সেই শতকের প্রভাতে বিশ্বের একমাত্র পরাশক্তি এবং বিশ্বের অন্যতম বৃহৎশক্তি এমন ঘটনা ঘটিয়েছে যার ফলে বিশ্বময় আইনের প্রভাব হ্রাস পেতে পারে এবং সেস্থলে নিছক শক্তির রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হবার সম্ভাবনাই বেশি। কোনো দেশের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হলে আত্মরক্ষার চাবিকাঠিরূপে আন্তর্জাতিক আইনের আশ্রয় সেই দেশ গ্রহণ করতে পারত। "আগে ভাগে আক্রমণ" (Pre-Emptive attack) একবার স্বীকৃত হলে এবং এর দৃষ্টান্ত এরই মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে, কোনো আইন বা যৌক্তিকতা তখন অর্থহীন হয়ে পড়ে। সরকার পরিবর্তনে (regime change) আগ্রহী হতে পারেন দেশের অভ্যন্তরে, বিরোধী দল বা দলসমূহ অথবা দেশের বাইরের কোন শক্তি যারা কোনো নীতিকে অগ্রহণযোগ্য মনে করে। যুক্তরাষ্ট্র এবং ব্রিটেনের সরকার পরিবর্তনের দৃষ্টান্ত এই প্রক্রিয়াকে আরো প্রকট করে তুলবে। ভারসাম্যহীন আজকের এককেন্দ্রিক বিশ্বে দ্বি-কেন্দ্রিকতার সূচনা হয়ত হয়ে যাবে অদূর ভবিষ্যতেই, কিন্তু তার পূর্ব পর্যন্ত বিশ্বে যে বিভিন্ন আঞ্চলিক শক্তি কেন্দ্রগুলি বিদ্যমান রয়েছে সেই সব কেন্দ্রের প্রধান প্রভাবশালী রাষ্ট্রগুলি তাদের ছোট ছোট প্রতিবেশীদের নিরাপত্তা অনিশ্চিত করে ফেলতে পারে।

চতুর্থ. বিশ্বে গণতন্ত্রায়নের গতি রুদ্ধ হতে পারে

স্নায়ুযুদ্ধের অবসানে বিশ্বে গণতন্ত্রায়নের যে তৃতীয় তরঙ্গের সূত্রপাত হয় তার ফলে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় বসবাসকারীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পায় আশাতীতরূপে। যুক্তরাষ্ট্রের ফ্রিডম হাউসের (Freedom House) ২০০০ সালের রিপোর্টে বলা হয়, চীনকে বাদ

www.pathagar.com

দিলে বিশ্বের মোট জনসংখ্যার প্রায় চার-পঞ্চমাংশের বাস এখন গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায়। দক্ষিণ আমেরিকায় গণতন্ত্রের বিজয় সূচিত হয়েছে। এককালের সমাজতান্ত্রিক পূর্ব ইউরোপেও গণতন্ত্রের হাওয়া প্রবল হয়েছে। চীন, উত্তর কোরিয়া, কিউবা বা মঙ্গোলিয়ায় এখনো গণতন্ত্রের স্রোত প্রবল হয়নি বটে, কিন্তু ঐসব দেশেও গণতান্ত্রিক নীতি শ্রদ্ধার সাথে গৃহীত হচ্ছে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় গণতন্ত্রের প্রভাব অত্যন্ত দ্রুতগতিতে বাড়ছে। এমনকি মধ্যপ্রাচ্যেও গণতান্ত্রিক রীতিনীতির জনপ্রিয়তা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে, বিশেষ করে কুয়েত, বাইরাইন প্রভৃতি রাষ্ট্রে। গণতন্ত্রের প্রসারের অর্থ জনগণের ইচ্ছার সুস্পষ্ট প্রকাশ। কিন্তু ইরাক আগ্রাসনে অংশগ্রহণকারী দেশগুলির দিকে তাকান, দেখবেন ব্রিটেনে শতকরা ৭০ ভাগ জনতার মতের বিরুদ্ধে, স্পেনে শতকরা ৯০ ভাগ জনগণের বিপক্ষে দাঁড়িয়ে, বুলগেরিয়ায় ১০ লক্ষ লোকের স্বাক্ষরকে নাকচ করে শাসকবৃন্দ ইরাক আক্রমণে ঝাঁপিয়ে পড়ে। তাছাড়া, আফ্রিকায় জনসমূহের বিরাট অংশ ছিল এই যুদ্ধের বিরুদ্ধে। দক্ষিণ এশিয়া, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, পূর্ব এশিয়া, এমনকি অষ্ট্রেলিয়া, জাপান, নিউজিল্যান্ডের জনসংখ্যার এক বিরাট অংশ ছিলেন এই যুদ্ধের বিরোধী। তারপরেও আধুনিক গণতান্ত্রিক বিশ্বের দুই দিকপাল–যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেনের শাসকবৃন্দ বিশ্বজনমতকে পদদলিত করে ইরাক আক্রমণ করেন। এতে গণতন্ত্র আহত হয়েছে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের "স্বাধীনতা", "সার্বভৌমত্ব", আন্তঃরাষ্ট্র সম্পর্কে "সম-সার্বভৌমত্ব", "অন্য রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে হস্তক্ষেপ না করার" যেসব আধুনিক প্রত্যয় নতুন সভ্যতাকে সমৃদ্ধ করেছিল তাদের মৃত্যু হয়েছে। অবশ্য একথাও এক্ষেত্রে স্মরণযোগ্য যে, যুক্তরাষ্ট্রের অর্থ জর্জ ডব্লিউ বুশ নয়, ব্রিটিশ ব্যবস্থার অর্থ নয় টনি ব্লেয়ার। তারপরেও প্রশ্ন থাকে–গণতান্ত্রিক দেশের নেতাদের এই আচরণ? এমন কার্যক্রম? পলে পলে আটলান্টিকের দুই পারের বেলাভূমিতে স্বর্ণরেণুর মতো সঞ্চিত হাজার হাজার বছরের সম্পদের রঙ ফিকে করে ফেলেছে আজকের আমেরিকান ও ব্রিটিশ নেতৃবৃন্দ, অথচ ঐ দুই দেশেই উচ্চারিত হয় "জনতার কণ্ঠই হল ঈশ্বরের কণ্ঠ" *['Vox populi Vox Dei']* বুশ-ব্লেয়ারের অগ্রহণযোগ্য পদক্ষেপ এ জাতির অবদানকে মলিন করে তুলেছে।

পঞ্চম. বিশ্ব এই মুহূর্তে বিভক্ত

বুশ-ব্লেয়ারের ক্ষমতাশ্রয়ী এবং স্বৈরাচারী পদক্ষেপ বিশ্বকে বিভক্ত করে ছেড়েছে। একদিকে উচ্চারিত হচ্ছে "যুদ্ধ নয়, শান্তি" শ্লোগান, অন্যদিকে বীভৎসরূপ ধারণ করেছে যুদ্ধবাদীদের আস্ফালন, ক্ষমতালিপ্সু ষড়যন্ত্রকারীদের ঔদ্ধত্য। তারা নিজের দেশকেও বিভক্ত করে ছেড়েছেন। পুরনো প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রসমূহ এই ধাক্কা সামলাতে পারলেও বিভিন্ন এথনিক গ্রুপে বিভক্ত, গোত্র-গোষ্ঠীতে শতধা বিভক্ত নতুন রাষ্ট্রগুলিতে এর প্রভাব মারাত্মক হয়ে উঠতে পারে। বিশেষ করে মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলিতে এই ধারা প্রবল হয়ে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় এক দীর্ঘস্থায়ী অস্থিতিশীলতার সৃষ্টি হতে পারে।

www.pathagar.com

ষষ্ঠ. সন্ত্রাসী কার্যকলাপের পরিধি বিস্তৃত হতে পারে

জর্জ বুশ ও তার Think Tank এর ব্যক্তিবর্গ যে সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে অবচেতন মনে ক্রুসেডের কথা উচ্চারণ করেছিলেন তা ইরাক আগ্রাসনের ফলে সেই সন্ত্রাসের বৃদ্ধি ঘটতে পারে শতগুণ। যে ইসলামী মৌলবাদকে তিনি এত ভয় করতেন, সেই মৌলবাদের বিস্তার ঘটবে প্রায় প্রতিটি মুসলিম রাষ্ট্রে। মডারেশনকে যারা লালন করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন তাদের অসহায়ত্ব সুস্পষ্ট হবে। কালক্রমে কে জানে বুশ-ব্লেয়ারের ক্ষমতাদর্পী পদক্ষেপ, যে ক্রুসেডকে সভ্য মানব সম্প্রদায় ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেছে, তার ক্ষেত্রও তৈরি হতে পারে। বিশ্ব তখন কি বাসের যোগ্য থাকবে?

মধ্যপ্রাচ্যের অন্যতম সুসন্তান এবং মধ্যপ্রাচ্যের রাজনীতির দক্ষ বিশেষজ্ঞ এডওয়ার্ড সাইদ (Edwrd W Said) কীভাবে এই আগ্রাসনকে দেখেছেন তা উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেন, "এটি হল আধুনিককালের সবচেয়ে অর্বাচীন ও সবচেয়ে বেপরোয়া এক যুদ্ধ। এটি হল বাস্তবতা সম্পর্কে অজ্ঞতমদের অপরিশীলিত ও অনিয়ন্ত্রিত দক্ষতা বা রাজকীয় ঔদ্ধত্য। ইতিহাসের জ্ঞান বিবর্জিত, মানবিক গুণাবলি রহিত। এই আগ্রাসনে রয়েছে শুধুমাত্র বীভৎস নারকীয় এবং নির্মম ইলেক্ট্রনিক প্রযুক্তির ধ্বংসলীলা।" ('This is the stupidest and most recklessly undertaken war in modern times. It is all about imperial arrogance, unschooled in worldliness, unfettered either by competence or experience, undeterred by history or human complexity, unrepentent in brutal violence and cruel electronic gadgetry.'] এর পরে এ সম্পর্কে অন্যকোনো বিবরণের আর প্রয়োজন নেই। শুধু এর মটিফ (Motif) সম্পর্কে কিছু বলে এর সমাপ্তি টানতে চাই এবং এজন্যে এই অঞ্চলের শ্রেষ্ঠতম কবি রবীন্দ্রনাথের বক্তব্যই যথার্থ বলে মনে করি। তিনি হিংস্র বর্বর সাম্রাজ্যবাদী লুটেরাদের লক্ষ্য করে আফ্রিকার উদ্দেশ্যে যা লিখেছিলেন তার ক'টি লাইন নিম্নরূপ :

এল ওরা লোহার হাতকড়ি নিয়ে
নখ যাদের তীক্ষ্ম তোমার নেকড়ের চেয়ে।
এল মানুষ ধরার দল
গর্বে যারা অন্ধ তোমার সূর্যহারা অরণ্যের চেয়ে।
সভ্যের বর্বর লোভ
নগ্ন করল আপন নির্লজ্জ অমানুষতা।

এই চিত্র কিন্তু নব্য-সাম্রাজ্যবাদীদের (neo-imperialists) নয়। এই ছবি আদি, অকৃত্রিম, নিরাবরণ, দখলদারিত্বে কৃতসংকল্প, অপরের সম্পদ লুটপাটে দক্ষ, নির্লজ্জ সাম্রাজ্যবাদীদের। এক্ষেত্রে কোনো সংশয় বা সন্দেহ মানব জাতির অর্জনকে নিঃশেষ করে দেবে।

www.pathagar.com

জর্জ ডব্লিউ বুশ এবং টনি ব্লেয়াররা কেমন আছেন?

বিশ্বের একমাত্র পরাশক্তি এবং অন্যতম শক্তিশালী রাষ্ট্র যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান নির্বাহী জর্জ ডব্লিউ বুশ এবং টনি ব্লেয়ারের উদ্যোগে ইরাকের ওপর আগ্রাসন পরিচালনার পরে ইরাকের মতো একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রের রাষ্ট্রত্বকে শুধু পেশীশক্তি বলে গুঁড়িয়ে দিয়ে এখন তারা কেমন আছেন? দেশের ভেতরে তাদের অবস্থা কেমন? দেশের বাইরেই বা কেমন তাদের মর্যাদা বা ভাবমূর্তি? তার পূর্বে আর একটি বিষয় ভেবে দেখুন তো, একটি দুর্ঘটনা ঘটে যাবার পরে দায়িত্বশীল ব্যক্তিরাও কত নির্বিকারভাবে মহাজ্ঞানীর মতো বড় বড় কথা বলে থাকেন–যা পূর্বে প্রকাশ করলে হয়ত দুর্ঘটনাটি এড়ানো যেতে পারত। হ্যান্স ব্লিক্সের (Hans Blix) কথাই ধরুন।

ক'দিন আগে অস্ট্রেলিয়ায় তিনি কপালে হাত দিয়ে গম্ভীর মুখে চোখ বড় বড় করে, হাত-পা লম্বা করে বললেন, সাদ্দাম হোসেন দশ বছর আগেই তার গণবিধ্বংসী অস্ত্রশস্ত্র (Weapons of Mass Destruction-WMD) ধ্বংস করেছিলেন। তাই সাদ্দাম হোসেন যুক্তরাষ্ট্র বা যুক্তরাজ্য অথবা ইসরাইলের জন্য কোনোক্রমেই বিপজ্জনক ছিলেন না। গণবিধ্বংসী অস্ত্রশস্ত্র ধ্বংস করে সাদ্দাম হোসেন এক আত্মম্ভরী অর্বাচীন বালকের মতো ভয়ঙ্কর শক্তিমান বলে ভাব দেখাতেন।

এখন দেখুন, হ্যান্স ব্লিক্স এসব কথা যদি এ বছরের মার্চে বলতেন অথবা তার পূর্বে বলতেন, এখন যেমন মহাজ্ঞানীর মতো, কোনোভাবে দুর্জ্ঞেয় না হয়ে সহজ-সরলভাবে বললেন ঠিক তেমনিভাবে, তাহলে কী হত কে জানে! তিনি তখন একথা বললেন না। এখন বলছেন কেন? মধ্যপ্রাচ্যে যে হত্যাযজ্ঞ ঘটে গেল এবং এখনও ঘটে যাচ্ছে প্রতিদিন সেজন্য তার কি কোনো দায়িত্ব নেই?

জর্জ বুশ এবং টনি ব্লেয়ার যে জাতিসংঘকে পাশ কাটিয়ে ইরাকে জবরদখল কায়েম করলেন সেই জাতিসংঘের প্রধান নির্বাহী (Secretary General) কফি আনান ৫৮তম সাধারণ পরিষদের অধিবেশন উদ্বোধনকালে প্রচ্ছন্নভাবে যুক্তরাষ্ট্রকে অভিযুক্ত করে বলেন, সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে সংগ্রামে সকল রাষ্ট্রকে একযোগে কাজ করতে হবে। শুধু সন্দেহের বশে কোনো স্বাধীন রাষ্ট্রের ওপর আগেভাগে আক্রমণ পরিচালনা (Pre-emptive attack) যুক্তিযুক্ত নয়। কথাগুলি ঠিক এবং জাতিসংঘের সেক্রেটারী জেনারেলের মতোই বটে।

কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের ইরাক হামলা ঠেকাতে বিশ্ব জনমত যখন উত্তাল হয়ে ওঠে, বিশ্বের উত্তর-দক্ষিণ এবং পূর্ব-পশ্চিম যখন আগ্রাসনের বিরুদ্ধে উচ্চকণ্ঠ হয়েছিল, তখন কফি

www.pathagar.com

আনান কেন মুখ খুললেন না? আজকে ব্রহ্মাণ্ডের সকল প্রজ্ঞা কি তার ভাণ্ডারে হঠাৎ করেই জমা পড়ল? তিনি যদি এই উক্তি তখন করতেন অথবা জাতিসংঘকে পাশ কাটিয়ে যখন বুশ-ব্লেয়ার দুর্দম গতিতে অগ্রসর হচ্ছিলেন তখন জাতিসংঘের মর্যাদা রক্ষার্থে যদি তিনি পদত্যাগের হুমকি দিতেন, তাহলেও হয়ত এই দুর্ঘটনা এড়ানো যেত। কিন্তু যখন ঘটনা অথবা দুর্ঘটনা ঘটে যাবার পরে, সবকিছু দেখেশুনে মহাজ্ঞানী হওয়াটা এক ধরনের মানবিক বিচ্যুতি বা প্রবণতা। সাধারণ মানুষের কিন্তু তেমন ভুল হয় না। বুশ-ব্লেয়ারের ইরাক আক্রমণ যে অন্যায় ও অগ্রহণযোগ্য তা বিশ্বজনতা চিৎকার করে বলেছে। বলেছে শ'য়ে শ'য়ে বা হাজারে হাজারে নয়, লাখো লাখো জনতা, এমনকি তাদের নিজের দেশেও। তাদের সঙ্গে যারা জোটবদ্ধ হয়েছিল সেসব ক্ষেত্রেও জনগণ ক্রোধে-আক্রোশে ফেটে পড়ে গলা ফাটিয়েছেন। দক্ষিণ, দক্ষিণ-পূর্ব ও পূর্ব এশিয়ায় বুশ-ব্লেয়ারের কুশপুত্তলিকা পদদলিত হয়েছে। পশ্চিম-এশিয়া, মধ্য-এশিয়ায় জনগণ বিক্ষোভের মাধ্যমে সত্য প্রকাশ করেছেন। ইউরোপ, আমেরিকায় তাদের অভিশাপ দেয়া হয়েছে। অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, ইন্দোনেশিয়া ও পূর্ব প্রশান্ত মহাসাগরীয় এলাকায় তাদের বিরুদ্ধে জনগণ ক্রোধান্ধ হয়ে ধিক্কার জানিয়েছেন। দক্ষিণ-আমেরিকায় প্রতিবাদের ঢেউ আছড়ে পড়েছে। তখনও হ্যান্স ব্লিক্স অথবা আনানরা এমনভাবে কথা বলেছেন যাতে বুশ-ব্লেয়াররা উৎসাহিত হতে পারেন।

অন্যদিকে, যুক্তরাষ্ট্রের গোয়েন্দা সংস্থা সেন্ট্রাল ইনটেলিজেন্স এজেন্সির (Central Intelligence Agency-CIA) রিপোর্টের সত্যতা সম্পর্কেও প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে বিভিন্ন মহল থেকে। যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেসের এক কমিটিতেও এসব প্রশ্নের গ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কেও সন্দেহ প্রকাশ করা হয়েছে। প্রেসিডেন্ট বুশের উপদেষ্টারা সিআইএ রিপোর্টকে গ্রহণযোগ্য বলে চালাতে চাইলেও তা আরও সন্দেহের সৃষ্টিই করেছে। যেসব তথ্যের ওপর ভিত্তি করে জর্জ বুশ যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন তার কোনোটিই ধোপে টেকেনি। ইরাক আগ্রাসনের সময় তো বটেই, ইরাক দখলের সাড়ে পাঁচ মাসের মধ্যেও ইরাকের কোথাও গণবিধ্বংসী অস্ত্রের সন্ধান মেলেনি।

১১ সেপ্টেম্বরে টুইন টাওয়ার ধ্বংসের সঙ্গেও সাদ্দাম হোসেনের কোনো সংশ্লিষ্টতার প্রমাণ নেই। প্রমাণ নেই ওসামা বিন লাদেনের আল-কায়দা নেটওয়ার্কের সঙ্গে সাদ্দাম হোসেনের কোনো যোগসূত্রের। ইরাক যে আফ্রিকার নাইজার থেকে হেভি ওয়াটার আমদানি করে পারমাণবিক অস্ত্র তৈরিতে মনোযোগী ছিল তাও মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে। ইরাক যুদ্ধের সূচনালগ্নে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা সচিব রামসফেল্ড টেলিভিশনে বক্তৃতার মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্রের অধিবাসীদের যা বলেছিলেন এবং তাও সিআইএর রিপোর্টের ওপর ভিত্তি করে, তাও মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে।

তিনি বলেছিলেন, 'যুদ্ধ শুরু হলেই সাদ্দাম হোসেনের পতন ঘটবে, কেননা ইরাকের জনগণ, বিশেষ করে ইরাকের শিয়া সম্প্রদায় ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনীকে মুক্তিদাতারূপে সাদরে অভ্যর্থনা জানাবে'। সিআইএ রিপোর্টে আরও বলা হয়েছিল, কুর্দী সম্প্রদায়ও সাদ্দাম হোসেনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবে; যুক্তরাষ্ট্রের গোয়েন্দা সংস্থার রিপোর্ট যে সঠিক ছিল না এবং সেসব অসত্য তথ্যের ভিত্তিতে ইরাক দখল যে বৈধ নয়, তা জর্জ

www.pathagar.com

বুশ এবং তার অনুগত টনি ব্লেয়ার প্রতিমুহূর্তে অনুভব করেন বটে, কিন্তু তারপরেও নিজের ভুল স্বীকার করার সৎসাহস তারা অর্জন করেননি। জর্জ বুশের ইরাক আগ্রাসন ও জবর দখলে তার যতটুকু ক্ষতি হয়েছে তার চেয়ে অনেক বেশি ক্ষতি হয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের বিশাল ভাবমূর্তির। যুক্তরাষ্ট্রে এখন অনেকেই বলাবলি করছেন যে, 'আমরা এমন একখানা প্রেসিডেন্ট পেয়েছি যার তুলনায় হাবাগোবা জেরাল্ড ফোর্ডকেও মনে হত তীক্ষ্ণ ধী সম্পন্ন এবং নির্বাক ড্যান কোয়েলকে মনে হত বিরাট বাগ্মী।' বাবা হোয়াইট হাউজে ছিলেন বলেই জর্জ বুশ হোয়াইট হাউজে গেছেন–এটিও অনেকের কথা। সত্যি বটে জর্জ বুশ বাবার ছেলে। বাবা যা করতে ব্যর্থ হয়েছেন তাই তিনি করে দেখাতে চেয়েছেন। সিনিয়র বুশ ইরাক আক্রমণ করেছিলেন ১৯৯১ সালে, কিন্তু পারেননি সাদ্দাম হোসেনকে অপসারণ করতে।

কথিত আছে, সাদ্দাম হোসেন একবার সিনিয়র বুশকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করেছিলেন। তার পুত্র জর্জ বুশ জুনিয়ার প্রতিশোধ নেয়ার লক্ষ্যে ইরাক দখল করেই ছাড়লেন এক প্রি-এমটিভ অ্যাটাকের (Pre-emptive Attack) মাধ্যমে। প্রকৃত প্রস্তাবে যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে এটাই এ ধরনের প্রথম কাজ। এ কাজ করতে হবে এই সংকল্প গ্রহণ করে বুশ এগিয়ে গেছেন এবং সব অসত্য তথ্যের ভিত্তিতে যুক্তরাষ্ট্রের জনগণকে বোঝাবার চেষ্টা করেছেন যে, সাদ্দাম হোসেন যুক্তরাষ্ট্রের জন্য মারাত্মক এক ব্যক্তি। এ বছরের ১৮ সেপ্টেম্বরে সশস্ত্র বাহিনী সংক্রান্ত কমিটিতে সিনেটর এডওয়ার্ড কেনেডি বলেন, 'কোনো আসন্ন ভীতি ছিল না। এর (ইরাক আক্রমণের) পরিকল্পনা তৈরি হয় টেক্সাসে। জানুয়ারিতে রিপাবলিকান নেতৃত্ব থেকে ঘোষণা আসে যে যুদ্ধ আসন্ন এবং তা রাজনৈতিক দিক থেকে লাভজনক হবে।' ['There was no imminent threat, This was made up in Texas, announced in January to Republican leadership that war was going to take place and was doing politically good.'] *The Atlantic Monthly* পত্রিকার সম্পাদক মাইকেল কেলি (Michael Kelly) ২০০২ সালের সেপ্টেম্বরে প্রকাশিত প্রবন্ধে- 'What Now? Developments, Encouraging and Otherwise'- লিখেছিলেন : 'বর্তমান বিশ্বের সবচেয়ে বড় সন্ত্রাসী রাষ্ট্র হল যুক্তরাষ্ট্র।' [The USA is now the world's leading rogue state.'] অথচ এমন হবার তো কথা ছিল না।

বিশ্বের একমাত্র পরাশক্তি যুক্তরাষ্ট্রে যখন ১১ সেপ্টেম্বরের দুর্ঘটনা ঘটে, তখন সমগ্র বিশ্ব সমবেদনার ডালা সাজিয়ে, সন্ত্রাসীদের প্রতি সীমাহীন ঘৃণা নিয়ে একাত্মতা প্রকাশ করেছিল যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি। সৃজনশীল নেতৃত্বের বদৌলতে তারপর যুক্তরাষ্ট্র সমগ্র বিশ্বে তার ভাবমূর্তি উজ্জ্বলতম করতে পারত। জর্জ বুশের তিন বছরের শাসনামল কিন্তু বিশ্বকে বিভক্ত করেছে। যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্বাসযোগ্যতাকে (credibility) ধূলিমলিন করেছে। আটলান্টিকের উভয় পারে পুরনো বিশ্বস্ত সাথী ও সহযোগীদের মধ্যে বিভাজন সৃষ্টি করেছে। ফ্রান্স ভিন্ন কথা বলেছে বলে যুক্তরাষ্ট্রে ফেঞ্চ ফ্রাই-এর নাম পাল্টে রেখেছে ফ্রিডম ফ্রাই। জার্মানি ও কানাডাকে অপদস্ত করেছে। রাশিয়াকে দূরে সরিয়েছে এবং সবচেয়ে দুভার্গ্যজনক বিষয় হল, হাজারও হত্যাকাণ্ডে রক্তরঞ্জিত ইসরাইলি

www.pathagar.com

প্রধানমন্ত্রী এরিয়েল শ্যারনকে জর্জ বুশ নিজেই আখ্যায়িত করেছেন 'শান্তির দূত' ('A man of peace:) হিসেবে। অনেকের ধারণা, হোয়াইট হাউজ বিশ্বময় যুক্তরাষ্ট্রের আধিপত্য বিস্তারের প্রতীক (A symbol of pax-American in the world) হয়ে পড়েছে। এই অবস্থা কোনোক্রমেই কাঙ্ক্ষিত নয় এবং এসবের জন্য দায়ী বৃহত্তম শক্তির নেতৃত্বদানকারী অত্যন্ত স্বল্প উচ্চতাসম্পন্ন জর্জ ডব্লিউ বুশের নেতৃত্ব। তাকে সামনে রেখে ডিক চেনির মতো বাণিজ্যিক স্বার্থ, ডোনাল্ড রামসফেল্ডের মতো যুদ্ধবাজ এবং পল উলফউইজের মতো ইহুদীবাদ যুক্তরাষ্ট্রের ভাবমূর্তিকে ধূলিধূসরিত করে চলেছে।

আমাদের প্রত্যাশা, এ অবস্থার পরিবর্তন অপরিহার্য। যুক্তরাষ্ট্র শুধুমাত্র সামরিক ক্ষেত্রে নয়, বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চায়, সৃজনশীল, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির নব নব আবিষ্কারে, মানবিক বোধের এবং বলিষ্ঠ জীবন চেতনা উদ্ভাবনেও গত পঞ্চাশ-ষাট বছর ধরে নেতৃত্ব দিয়ে আসছে। সচেতন নাগরিকরাও যুক্তরাষ্ট্রের একটা মস্ত বড় সম্পদ। তারা বুশ নেতৃত্বের সম্মোহনী প্রভাব থেকে ক্রমে ক্রমে মুক্ত হচ্ছে। ইরাক আক্রমণের পূর্বে যুক্তরাষ্ট্রের জনগণের শতকরা ৭০ ভাগ বুশের এই অভিযানকে সমর্থন করেন। যুদ্ধ চলাকালে যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকদের শতকরা ৯৫ ভাগ সমর্থন যুগিয়েছিল বাড়ির সামনে গাছে হলুদ রিবন (Yellow Ribbon) জড়িয়ে। আজকে বুশের যুদ্ধনীতির সমর্থকদের সংখ্যা হ্রাস পেয়ে হয়েছে শতকরা ৪৬ ভাগ। তার অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার সমর্থকদের সংখ্যা আরও হ্রাস পেয়ে হয়েছে শতকরা ৩৮ ভাগ।

অনেকের মতে, তার বাবা বিল ক্লিনটনের হাতে পর্যুদস্ত হয়ে প্রেসিডেন্ট হিসেবে দ্বিতীয় টার্মের জন্য প্রত্যাখ্যাত হয়েছিলেন। তার পরামর্শদাতারা ভেবেছিলেন সাদ্দাম হোসেনের অপসারণ হয়ে উঠবে তার সেই সহজ-সরল রাজপথ, হোয়াইট হাউসে দ্বিতীয়বার প্রবেশের জন্য। সেক্ষেত্রেও মনে হয়, বাবার মতো তাকে ফিরে যেতে হতে পারে। সিনেটের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের নেতা টম ড্যাশলে (Tom Daschle) *Washington Post* পত্রিকার সঙ্গে সাক্ষাতকারে ক'দিন আগে বললেন, 'অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে প্রায় প্রত্যেকটি বিষয়ে তিনি (জর্জ ডব্লিউ বুশ) হয়ে রয়েছেন বিরাট হতাশার উৎস' ['Almost on every one of the issues involving domestic policy, he has been a source of great disappointmen.'] ইরাক ইস্যুতে তিনি হয়ে পড়েছেন উগ্র জাতীয়তাবাদীর (Jingoism) এবং সাম্রাজ্যবাদীর প্রতিচ্ছবি। যুক্তরাষ্ট্রের বৃহত্তম জনসমষ্টির কাছে এই দু'টিই অগ্রহণযোগ্য।

যুক্তরাষ্ট্রে জর্জ ডব্লিউ বুশের নেতৃত্বের উচ্চতা এবং ওজন যেমন দ্রুতগতিতে হ্রাস পাচ্ছে ব্রিটেনে টনি ব্লেয়ারের ভাবমূর্তিও তেমনি দ্রুতগতিতে মলিন হয়ে আসছে। জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে জর্জ বুশ বক্তৃতা করে এলেন বটে, কিন্তু বক্তৃতার পরে যে ধরনের হাততালি পেতে তিনি অভ্যস্ত তার দশভাগের একভাগও তিনি এবার পেলেন না। টনি ব্লেয়ার এবার আর ওমুখোই হলেন না, কেননা তার মতো তুখোড় বক্তার সামনে নতুন কোনো কথা আর আসবে না। গেলেন তো সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি জার্মানির রাজধানী বার্লিনে। লক্ষ্য ছিল ইউরোপের প্রধান নেতা জ্যাক শিরাক

www.pathagar.com

(Jacques Chirac) এবং গেরহার্ড শ্রোয়েডারের (Gerhard Shroeder) পুরনো ঝামেলার একটা সুরাহা করা। তারা কিন্তু টনি ব্লেয়ারকে তেমন গুরুত্বের সঙ্গে গ্রহণ করেননি। বরং জর্জ বুশের দূত হিসেবে দেখেছেন।

অনেকটা উপেক্ষা করেছেন তার উপস্থিতিকে। অথচ এককালের মেধাবী ব্লেয়ার, তীক্ষ্মধী, চমৎকারভাবে কথা বলে চারদিকে সম্মোহনের এক পরিবেশ সৃষ্টিকারী ব্লেয়ার এখন তার অতীতের ছায়ামাত্র। শুধু বিদেশে কেন, দেশের ভেতরেও টনি ব্লেয়ার হারিয়েছেন তার ভাবমূর্তির অনেকখানি এবং ইরাক দখলে তার অতি উৎসাহ এজন্য দায়ী। ব্রেন্ট ইস্টের (Brent East) যে সংসদীয় আসনটি দীর্ঘদিন ধরে লেবার পার্টির দখলে ছিল ক'দিন আগে সেই আসনে অনুষ্ঠিত উপনির্বাচনে তা শ্রমিক দলের হাতছাড়া হয়েছে।

এই আসনে বিপর্যয়ের প্রধান কারণ হল জন কেলি সংক্রান্ত তদন্তে টনি ব্লেয়ার ইরাক যুদ্ধে যেসব অসত্য তথ্যের ভিত্তিতে সমগ্র জাতি ও জাতীয় পার্লামেন্টকে প্রতারিত করেছেন তার অশুভ প্রভাব। এই তদন্তে তিনি বলেছেন, হোক তথ্য-উপাত্ত অসত্য। নাই বা থাকল সাদ্দামের তুণে গণবিধ্বংসী বাণ, কাজটা কিন্তু ভালো হয়েছে এবং এজন্য নেই তার কোনো অনুশোচনা। ভবিষ্যতেও এমনি পরিস্থিতিতে তিনি এমন কাজই করবেন। টনি ব্লেয়ারের আজকের কথাগুলো অনেকটা আঠারো শতকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্মকর্তা, ভারতের গভর্নর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংসের বক্তব্যের মতো। হেস্টিংসের নির্মম নির্যাতন, অত্যাচার, প্রতারণা ও ভণ্ডামির জন্য যখন তার বিরুদ্ধে অভিশংসন শুরু হয় ব্রিটিশ পার্লামেন্টে, তখন অভিশংসন কমিটির কাছে তিনি বলেছিলেন, 'আমার নির্মমতা ও প্রতারণা বিচার করুন আপত্তি নেই, কিন্তু আমি যা করেছি তা ব্রিটিশ জাতির মঙ্গলের জন্যই করেছি।' টনি ব্লেয়ার আগামী নির্বাচনেও জয়ী হয়ে ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী হতে পারেন। কিন্তু এটাও ঠিক যে ব্লেয়ারকে ব্রিটিশ জাতি চিনত আজকের টনি ব্লেয়ার তা থেকে স্বতন্ত্র। আজকের টনি ব্লেয়ার প্রতারণার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, স্বেচ্ছাচারে নিমজ্জিত এবং পরাশক্তি যুক্তরাষ্ট্রের একান্ত অনুগত ভৃত্যতুল্য।

জর্জ বুশের অবস্থাও তেমনি। তিনিও বলেন, সাদ্দাম হোসেনের অনুপস্থিতিতে বিশ্ব অনেকটা নিরাপদ হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র হয়েছে অনেক বেশি নিরাপদ। অসত্য তথ্যের ভিত্তিতে ইরাক দখলের পরে তারও নেই কোনো অনুশোচনা। ১৬২০ খ্রিষ্টাব্দে ব্রিটেন থেকে May Flower অভিযানে Pilgrim Fathers গণ ধর্মীয়বোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে, সনাতন খ্রিস্টীয় নীতিকে ধারণ করে, সৃষ্টিকর্তার আশীর্বাদ মাথায় নিয়ে এক হাতে বাইবেল ও অন্য হাতে তরবারী নিয়ে যেমন আজকের যুক্তরাষ্ট্রের New England-এ উপনীত হন এবং মাত্র পঞ্চাশ বছরের মধ্যে সমগ্র New England আদিবাসী মুক্ত করে বলেছিলেন, ঈশ্বরের আশীর্বাদে New England আজ নিরাপদ। ঠিক তেমনি জর্জ বুশও এখন ভীষণ নিরাপত্তাবোধের অধিকারী।

আজকের বিশ্ব কিন্তু সেই বিশ্ব থেকে পুরোপুরি ভিন্ন। তখন শক্তির সীমারেখা ছিল না। আজকে মারাত্মক শক্তিও শক্তির বিষক্রিয়ার প্রভাবে সীমিত হয়ে আসে। অতীতে শক্তির কোনো ভারসাম্য ছিল না। এখন কিন্তু শক্তি আপনা আপনি তার ভারসাম্য অর্জন করে ফেলে। বিশ্বায়ন, বিশেষ করে তথ্য প্রযুক্তির বৈপ্লবিক পরিবর্তনে, এটি সম্ভব হয়েছে।

www.pathagar.com

তাই বিশ্বের একমাত্র পরাশক্তি যুক্তরাষ্ট্রের সীমাহীন শক্তিও সীমিত হয়েছে বিশ্বজনমতের প্রভাবে। অনেকে এই বিশ্বজনমতকে আর একটি পরাশক্তিরূপে চিহ্নিত করতে আগ্রহী। ইরাক দখলের পূর্বে এর বিরুদ্ধে যেভাবে জনমতের প্রকাশ ঘটেছিল, আজও তার প্রকাশ লক্ষ্য করা যায় বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে। তখন জনমতের দাবি ছিল ইরাক আগ্রাসন ন্যায়নীতি বিরোধী এবং অগ্রহণযোগ্য। এখনকার দাবি কিন্তু অন্যরকম। ইরাককে ইরাকি জনগণের হাতে ফিরিয়ে দাও অবিলম্বে। ইরাক থেকে আগ্রাসী শক্তি হাত গুটিয়ে নাও।

ইরাকি জনগণের বিক্ষোভ, প্রতিরোধ, এমনকি প্রতিশোধের মাত্রা যত বৃদ্ধি পাবে, দখলকারী বাহিনীর লাশ যত বেশি দেশে ফিরবে, বিশ্বজনমতের ঘৃণাও তত প্রবল হয়ে উঠবে। প্রবল হবে খোদ জর্জ বুশের নিজের দেশে। টনি ব্লেয়ারের আপন ঘরে। ক্রমে ক্রমে বিশ্বজনমত পরাশক্তির মতো ভেতর থেকে বুশ-ব্লেয়ারকে ঘায়েল করবে। অতীতেও এমন ঘটনা ঘটেছে। ইরাক যদি যুক্তরাষ্ট্র এবং যুক্তরাজ্যের জন্য আরও একটি ভিয়েতনাম হয়ে ওঠে তাহলে বুশ-ব্লেয়ারের মুখে 'নিরাপদ পৃথিবীর' দাবি আর হালে পানি পাবে না। দেখা যাক, সময় কীভাবে তাদের কাজকে মূল্যায়ন করে। নির্মম স্বৈরাচারিতার দৃষ্টান্ত তুলে ধরার জন্য অর্ধশতাব্দী পরেও প্রায় সব জায়গায় হিটলারের নামটি উচ্চারিত হয়। বুশ-ব্লেয়ারের নাম কত দিন উচ্চারিত হবে কে জানে!

www.pathagar.com

এ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের প্রতিবেদন কীসের পরিচায়ক

কোনো জনপদ সুযোগ্য নেতৃত্বের আশীর্বাদ লাভ করলে শুধুমাত্র সেই জনপদেই নয়, এর চারপাশেও ছড়িয়ে পড়ে শান্তি-সমৃদ্ধির আবহ, নিশ্চয়তা-নিরাপত্তার সুখদ পরিবেশ এবং স্বাধীনতা-স্বাতন্ত্র্যের অনুরণন। সেই জনপদ যদি শক্তি-সামর্থে দশটির একটি হয়, প্রভাব-বৈভবে উল্লেখযোগ্য হয়ে থাকে তাহলে বিশ্বের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে শান্তির সুবাতাস প্রবাহিত হয়। সামাজিক জীবনে সার্থকতার উজ্জ্বল আলোয় ঝলমলিয়ে ওঠে। জাতীয় জীবন ছাড়িয়ে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে তা বিস্তৃত হয়। কিন্তু সুযোগ্য নেতৃত্বের পরিবর্তে যদি সেই জনপদের ভাগ্যে জোটে সংকীর্ণ, ক্ষমতাবাদী, প্রতিহিংসাপরায়ণ এবং হঠকারি নেতৃত্ব তাহলে শুধু সেই জনপদই নয়, তার চারপাশের সবকিছুই হিংসার আগুনে ঝলসে যায়। ক্ষমতার দাপটে সবকিছুই ছিন্নভিন্ন হয়ে পড়ে। বিশ্বের একমাত্র পরাশক্তি যুক্তরাষ্ট্রের নীতি-নির্ধারকদের চেহারার প্রতি একবার দৃষ্টি দিন এবং মানবাধিকার সংগঠন এ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের ২০০৩ সালের বার্ষিক প্রতিবেদনের প্রথম কয়েকটি পৃষ্ঠা উল্টান, দেখবেন নেতৃত্বের প্রকৃতি কীভাবে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নতুন নতুন সঙ্কটের জন্ম দিয়ে থাকে।

এ্যামনেস্টি প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে পরিচালিত সন্ত্রাসবাদ বিরোধী যুদ্ধ বিশ্বকে নিরাপদ স্থানে পরিণত করার পরিবর্তে করে তুলেছে অনেকটা বাসের অযোগ্য। মানবাধিকার লঙ্ঘন এবং আন্তর্জাতিক আইনের ভিত্তিমূল শিথিল করে বিশ্বকে বসবাসের জন্যে আরো বিপজ্জনক করে তুলেছে। বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে সৃষ্টি হয়েছে 'ধমানবিক' ও 'অবমাননাকর' অবস্থা। যে যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে দীর্ঘ চার দশকব্যাপী স্নায়ুযুদ্ধের সময়কালে এবং স্নায়ুযুদ্ধোত্তরকালে মানবাধিকার লঙ্ঘন, নির্যাতন, বিনা বিচারে আটক, পক্ষপাতিত্বমূলক বিচার, বিরোধীদল বা গ্রুপের পীড়নের বিরুদ্ধে বিশ্বব্যাপী এক আন্দোলনের সৃষ্টি হয় তার পরিবর্তে বুশ–ব্লেয়ারের ইরাক দখলের পরে, এমনকি তার পূর্বে আফগানিস্তান দখলের পরে সৃষ্টি হয়েছে ভিন্ন এক অবস্থা। এই অবস্থা দুভার্গ্যজনক। এই অবস্থা অনাকাঙ্ক্ষিত। এই অবস্থা সভ্যতা বিরোধী। এই অবস্থা মানবতা বিরোধী।

গত শতকের দ্বিতীয় দশকে যুক্তরাষ্ট্রের কৃতী প্রেসিডেন্ট উড্রো উইলসন (Woodrow Wilson) প্রথম মহাযুদ্ধের শেষ লগ্নে যুক্তরাষ্ট্রের যোগদানের পূর্বে কংগ্রেসে যে বক্তৃতা দিয়ে সমগ্র জাতিকে এজন্যে তৈরি করেন তার ক'টি লাইন ছিল নিম্নরূপ : "আমরা চূড়ান্ত পর্যায়ে বিশ্ব শান্তি ও জনগণের মুক্তির জন্যে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়ে খুশি হয়েছি। আমরা যুদ্ধ করছি ছোট ও বড় সকল জাতির অধিকারের জন্যে। আমরা যুদ্ধ করছি সর্বস্থানের জনগণের নিজস্ব জীবন ব্যবস্থা বাছাই-এর সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করতে।

www.pathagar.com

গণতন্ত্রের জন্যে বিশ্বকে নিরাপদ করতে হবে। রাজনৈতিক স্বাধীনতার পরীক্ষিত ভিত্তির উপর শান্তিকে প্রোথিত করতে হবে।" ["We are glad to fight thus for the ultimate peace of the world and for the liberation of its peoples; for the right of nations, great and small and the privilege of men everywhere to choose their way of life and of obedience. The world must be made safe for democracy, Its peace must be planted upoon the tested foundations of political liberty."] উড্রো উইলসনের বক্তব্যের সাথে সেই যুক্তরাষ্ট্রের বর্তমান প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লিউ বুশের আফগানিস্তানে তালেবান ও আল-কায়দা সংগঠনের নেতৃবৃন্দের প্রতি মৃত্যুবাণ নিক্ষেপের পূর্বে Justice Infinite-এর কর্মসূচির তুলনামূলক পর্যালোচনা করুন অথবা ইরাক আগ্রাসনের পূর্বে যুক্তরাষ্ট্রের চরমপত্রের মূল বক্তব্যের তুলনা করুন। দেখবেন জর্জ ওয়াশিংটন, ম্যাডিসন, জেফারসন, আব্রাহাম লিংকন বা উইলসনরা যুক্তরাষ্ট্রে নেতৃত্বের যে উচ্চমাত্রা বিনির্মাণ করেছিলেন জর্জ বুশের নেতৃত্বের মান সে তুলনায় কত নিম্ন পর্যায়ের।

উড্রো উইলসন কংগ্রেসে প্রদত্ত সেই বক্তৃতায় আরো বলেছিলেন "আমাদের নিজস্ব কোনো স্বার্থ নেই। আমরা কোনো আগ্রাসন বা আধিপত্য কামনা করি না। আমাদের জন্যে কোনো দায়মুক্তিও কামনা করি না। যুদ্ধের জন্যে কোনো পার্থিব ক্ষতিপূরণও চাই না। আমরা হতে চাই শুধুমাত্র মানবিক অধিকারের অন্যতম চ্যাম্পিয়ন।" ["We have no selfish ends to serve. We desire no conquest, no dominion. We seek no indemnities for ourselves, no material compensation for the sacrifices. We shall freely make. We are but one of the champions of the rights of mankind."] পারবেন কি জর্জ বুশ অথবা তার সঙ্গী-সাথীরা এমন কথা বলতে? যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রবিন্দু নিউইয়র্ক অথবা ওয়াশিংটনে ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বরে যে ধ্বংসলীলা সংঘটিত হয় সেজন্যে কে বা কারা দায়ী তা সঠিকভাবে এখনো উদঘাটিত হয়নি, কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে আফগানিস্তানে হাজার হাজার নিরপরাধ নর-নারী ও শিশুকে কীট-পতঙ্গের মতো প্রাণ দিতে হল বিশ্বের একমাত্র পরাশক্তির আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রের আঘাতে। ইরাকে আগ্রাসন পরিচালনার পূর্বে একটি স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি সাদ্দাম হোসেনকে যেভাবে ইরাক ছেড়ে চলে যেতে বলা হল অথবা যেভাবে ইরাকী জনগণকে অমানবিক নির্যাতন করা হল অথবা প্রাচীন সভ্যতার অন্যতম পীঠস্থান ইরাকের ইতিহাস-ঐতিহ্যের নিদর্শনগুলো লুটপাট করে যে ধ্বংসলীলার অবতারণা তার কোনো একটি কি সভ্য দুনিয়ায় গ্রহণযোগ্য? যুক্তরাষ্ট্রের স্টেট ডিপার্টমেন্ট কর্তৃক প্রতিবছর যেভাবে কান্ট্রি রিপোর্টের (Country Report) মাধ্যমে বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনাবলি তুলে ধরা হত তার কি কোনো নৈতিক অধিকার অবশিষ্ট রয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের? গুয়ানতিনামো বে-তে কয়েক সেলে আফগান বন্দীকে যেভাবে মানবেতর অবস্থায় পশুর মতো মধ্যযুগীয় কায়দায় নির্যাতন করা হচ্ছে তার কি কোনো নজির রয়েছে? ১১ সেপ্টেম্বরের পূর্বে যা অগ্রহণযোগ্য ছিল আজ তাই বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে নিয়মে পরিণত হয়েছে এবং

www.pathagar.com

এসবের অধিকাংশই ঘটেছে মানবাধিকার সম্পর্কে স্নায়ু যুদ্ধের পরবর্তী পর্যায়ে যে যুক্তরাষ্ট্র সর্বাধিক উচ্চকণ্ঠ হয়েছিল তারই নেতৃত্বে, তার ঘনিষ্ঠ সহযোগী ও অনুগত ইসরাইলের মাধ্যমে। ঘটছে যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম সহযোগী ব্রিটেনের মাধ্যমে। অথচ এই ব্রিটেন ও যুক্তরাষ্ট্রই বিশ্বময় গণতান্ত্রিক চিন্তাভাবনা, গণতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থা, নাগরিকদের মৌলিক অধিকার, সুশাসন ও স্বশাসনের যোগ্যতম প্রবক্তা ছিল। যে জাতিসংঘ গত অর্ধশতাব্দী ধরে বিশ্বময় পর্যন্ত শৃঙ্খলা রক্ষায় এক ঐতিহাসিক ভূমিকা রেখেছিল যুক্তরাষ্ট্র এবং ব্রিটেনের নেতৃত্বে গত ক'বছর ধরে যা ঘটে চলেছে সেই জাতিসংঘের কি অবশিষ্ট রয়েছে? অপছন্দের শাসককে সরিয়ে দেবার লক্ষ্যে আগেভাগেই আক্রমণ পরিচালনার (Pre-emptive attack for regime change) যে দৃষ্টান্ত বিশ্বের একমাত্র পরাশক্তি স্থাপন করল তার ফলে শুধু আফগানিস্তান ও ইরাকে জনগণের দুর্দশা সীমাহীন হয়েছে তাই নয়, বিশ্বের প্রায় ১৫০টির মতো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রও আজ ভীত ও সন্ত্রস্ত। ফিলিস্তিনি জনগণকে প্রত্যেক মুহূর্তে মৃত্যুর মুখোমুখি হতে হচ্ছে। ধর্মীয় ভিন্নতা এবং নৃতাত্ত্বিক বিভিন্নতা আজ রক্তক্ষয়ী সংঘাতের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছে। নিরাপত্তার নামে রাজনীতি, বাণিজ্য এবং মানবাধিকার আজ কলঙ্কিত। কে দেবে এর জবাব? এ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল শুধু তো বরফশৈলীর অগ্রভাগের কিঞ্চিত উদঘাটন করেছে। বিশ্বমানবের বৃহৎ এক অংশের আর্তনাদ তো এই চিত্রে পরিস্ফুট হয়ে ওঠেনি। হাজার হাজার কোটি ডলার ব্যয় করে দুই মহাসাগর বেষ্টিত থেকেও যুক্তরাষ্ট্র নিজের নিরাপত্তার জন্য সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছে এবং নিজের নিরাপত্তার জন্য কোটি কোটি মানুষের নিরাপত্তা হরণ করেছে। কিন্তু যে বিশ্বের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ মানবগোষ্ঠীর নিরাপত্তা যে কারণে প্রতিনিয়ত বিঘ্নিত হচ্ছে সেই সব কারণ দূর করার জন্য তো তাদের কোনো মাথাব্যথা নেই। দারিদ্র্য, নিপীড়ন, দুর্নীতি, ব্যাধি-অপুষ্টির আঘাতে প্রতিদিন যে হাজার হাজার মানুষ নিশ্চিহ্ন হচ্ছে সে সম্পর্কে তো তাদের কোনো ভাবনা নেই! বিশ্বায়নের বাতাবরণে তারা অতীতের সেই নগ্ন উপনিবেশবাদের সূত্রগুলোকে সুকৌশলে নাড়াচাড়া করছে। ক্ষমতাই যে সবকিছু, ক্ষমতার মানদণ্ডেই যে সব নীতি-নৈতিকতা সুনির্দিষ্ট হয়, মানবাধিকার বা সুশাসনের কথা বা স্বশাসনের চেতনা যে ক্ষমতার নিকট অত্যন্ত গৌণ তা আজকের একমাত্র পরাশক্তি ও তার উপর নির্ভরশীল কিছু কিছু প্রধান শক্তির কার্যক্রমে সুস্পষ্ট হচ্ছে। কীসের গণতন্ত্র যখন দেশের শতকরা সত্তর ভাগ জনগণের ইচ্ছাকে পদদলিত করে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী যুদ্ধের দামামা নিজের ঘাড়ে তুলে নিলেন? কীসের গণরায় যখন দেশের শতকরা নব্বই জনের অভিপ্রায়কে দলিত-মথিত করে স্পেনের শাসকরা অতীতের মতো দিগ্বিজয়ে বের হতে সাহসী হয় মধ্যপ্রাচ্যে? কীসের মানবাধিকার যখন জর্জ বুশের মতো নেতা দেশের আলোকিত অংশের মতামতকে অগ্রাহ্য করে পদদলিত করতে সাহসী হন সব আইনকানুন আর আন্তর্জাতিক বিধিবিধান? যুক্তরাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে এমন সব ভীষণ মারণাস্ত্র এবং তা এত বেশি যে তা দিয়ে ইরাক বা আফগানিস্তান কেন, সমগ্র বিশ্বকে অন্তত বার দশেক প্রাণহীন করা সম্ভব। তার পরে কেন কে কোন ধরনের অস্ত্র তৈরি করছে তার খবরদারি?

www.pathagar.com

সব মিলিয়ে আমার মনে হচ্ছে এসবই যোগ্য নেতৃত্বের প্রশ্ন, সুযোগ্য নেতৃত্বের সংকট। একমাত্র পরাশক্তি যুক্তরাষ্ট্রে মানবতাবাদী, উদারহৃদয়, গণতান্ত্রিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ নেতৃত্বের সঙ্কট। আফগানিস্তান দখল বা ইরাক দখলের ফলে আফগানিস্তানের জনগণ বা ইরাকিদের অপেক্ষা অনেক বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের ভাবমূর্তি। ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের মানবতাবাদী জনগণ। এ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের ২০০৩ সালের প্রতিবেদন যুক্তরাষ্ট্রের এই ঐতিহাসিক পরাজয়কে বিশ্বময় সুস্পষ্ট করেছে। জর্জ বুশ (সিনিয়র) যা পারেননি তার পুত্র হয়ত তাই করে গর্বে স্ফীত করেছেন তার বুক। কিন্তু ইতিহাসের নির্মম ধারা তার এই কাজের মূল্যায়ন কীভাবে করবে তার কিছুটা ইঙ্গিত বহন করছে এই প্রতিবেদনটি। যুক্তরাষ্ট্র এবং ব্রিটেনের তথ্য মাধ্যমে সিএনএন এবং বিবিসি এরই মধ্যে হারিয়েছে তাদের গ্রহণযোগ্যতার বিরাট এক অংশ। গণতন্ত্রের প্রবক্তারূপে যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেনের ভাবমূর্তির বড় একটা অংশ এখন ধূলি ধূসরিত। তাদের মানবাধিকার সম্পর্কিত উচ্চবাচ্য এখন থেকে বিশ্ববাসী সন্দেহের চোখে দেখতে শুরু করেছে। তাদের আইনের প্রতি শ্রদ্ধা এবং উদারভাবের আবেদন হ্রাস পেয়েছে মারাত্মকভাবে। তাদের মাতব্বরির দিনও এখন শোনা যায়। যুক্তরাষ্ট্রের ইরাক আক্রমণকে নিন্দা করে বিশ্বজনমত উঠে এসেছে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিদ্বন্দ্বী আর এক পরাশক্তিরূপে। এই প্রেক্ষাপটেই ক'দিন পূর্বে এ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের প্রতিবেদনকে পর্যালোচনা করা সম্ভব এবং সঙ্গত। এই প্রতিবেদনে প্রতিফলিত হয়েছে বিশ্ববিবেক। প্রতিফলিত হয়েছে মানবতার করুণ সুর। সুযোগ্য নেতৃত্বের আবেদন ঝংকৃত হয়েছে এর প্রতি ছত্রে। এ সময়ের দুঃখবাদী চিত্রের এই দুঃসময়ে এই প্রতিবেদনটি আমার মনে হয়েছে এক আলোকবর্তিকার মতো।

www.pathagar.com

ভারতের নতুন সরকার এবং বাংলাদেশ

মাত্র ক'দিন আগে (৩০ জুন ২০০৪) ভারতের প্রধানমন্ত্রী ড. মনমোহন সিং বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার নিকট লিখিত এক পত্রে বলেছেন, "বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্কের ভিত্তি হচ্ছে "বিশেষ ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক কেন্দ্রিক এক বিশেষ সাদৃশ্য।" তিনি বলেন, দু'দেশের জনগণের পারস্পরিক সদিচ্ছা ও প্রত্যাশা আমাদের পারস্পরিক আস্থা ও উপলব্ধি এবং বন্ধুত্বের বাতাবরণে সমৃদ্ধি ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যসমূহ অর্জনের লক্ষ্যে একযোগে কাজ করার সাথে নিয়োজিত রেখেছে। তার কথায়, "আমি আস্থাশীল যে, সংলাপ ও পারস্পরিক উপলব্ধির মাধ্যমে আমরা সব সমস্যার দিকে দৃষ্টি দিতে পারব। আমি আশা করি, মিলিত প্রয়াসে আমরা এসব ক্ষেত্রে সামনে এগিয়ে যাব।" আমাদের বিশাল প্রতিবেশী ভারতের প্রধান নির্বাহীর এই বক্তব্য অত্যন্ত ইতিবাচক, বিশেষ করে ভারত সরকারের শীর্ষ উপদেষ্টা যখন সোনিয়া গান্ধী স্বয়ং। ড. মনমোহন সিং অপরিচিত কোনো ব্যক্তিত্ব নন। ভারতের অর্থমন্ত্রী হিসেবে তিনি যেসব ফরওয়ার্ড লুকিং পদক্ষেপ গ্রহণ করে ভারতের গৃহবন্দী অর্থনীতিকে বিশ্বময় ছড়িয়ে দেয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করেন এবং ফলে ভারত যেভাবে দ্রুতপদে অগ্রসর হয় তাও সবার জানা। ক্ষমতা গ্রহণের পর পর তিনি এও বলেছিলেন যে, "ভারত চাচ্ছে তারা প্রতিবেশিদের সাথে "সর্বাপেক্ষা সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক" ('Most Friendly Relations'), "বিশেষ করে পাকিস্তানের সাথে" ('Most so with Pakistan')। এই প্রেক্ষাপটে তার মন-মানসিকতা অনুধাবনে এতটুকু অসুবিধা হচ্ছে না তিনি কি চান। ভারতের অর্থনৈতিক অগ্রগতি এবং তাও শুধুমাত্র কেন্দ্রে সঞ্চিত না রেখে প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত করে সাধারণ মানুষের দোরগোড়া পর্যন্ত টেনে আনা, বহুজাতির এবং বহু সম্প্রদায়ের ভারতে বহুবাচনিক নীতির মাধ্যমে ভারতীয় জনগণের মধ্যে অসাম্প্রদায়িক এক প্রীতির পরিবেশ গড়ে তোলা এবং বামপন্থীদের সমর্থন পুষ্ট ভারত আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে নিরপেক্ষতার পতাকা উন্নীত রাখা যে ভারতের নীতি নির্ধারকদের নীতি তা ক্রমে ক্রমে সুস্পষ্ট হচ্ছে।

পাকিস্তানের সাথে ভারতের সম্পর্ক যে বন্ধুত্বপূর্ণ হবে তা অত্যন্ত স্বাভাবিক। এর কারণ দ্বিবিধ। **এক.** ভারত ও পাকিস্তান উভয়ই পারমাণবিক অস্ত্রে সজ্জিত। ফলে অতীতে তিন চার বার যুদ্ধে লিপ্ত হলেও ভবিষ্যতে ভারত এবং পাকিস্তানের মধ্যে যুদ্ধ সংঘটিত হবার আশঙ্কা আর নাই বললেও চলে, কেননা পারমাণবিক অস্ত্র দিয়ে যুদ্ধ চলে না। এই অস্ত্র দিয়ে শুধুমাত্র ধ্বংস করা চলে। আর চলে ধ্বংস হয়ে যাওয়া। বিশ্ব ইতিহাসও এর প্রধান সাক্ষী। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে বিশ্ব যে বিভীষিকাময় বিশ্ব বিভাজন ("Great Divide") অবলোকন করে তখনও দুই পরাশক্তির কেউ যুদ্ধের সাথে এগোয়নি। তখন থেকে এখন পর্যন্ত পৃথিবী যে বড়োসড়ো কোনো যুদ্ধের অভিশাপ থেকে মুক্ত থেকেছে

www.pathagar.com

তার কারণ ঐ একটি। উভয় জোট ছিল পারমাণবিক অস্ত্রে সজ্জিত। জাতিসংঘের ভূমিকা ছিল শুধুমাত্র মাঝে মাঝে দুই শিবিরকে সতর্ক করা। এর বেশি কিছু নয়। ভারতের নেতৃত্ব তা ভালো করে জানে। জানে বলেই ভারতের উগ্র হিন্দু জাতীয়তাবাদী বিজেপির শাসনামলেও এল কে আদভানীর মতো উগ্র নেতা এ পথে পা বাড়াতে সাহস করেননি, যদিও তিনি পারমাণবিক বিস্ফোরণের পর পর এক ব্যর্থ হুংকারে পশ্চিমাঞ্চলে ঝড় তুলেছিলেন। চাগাইতে পাকিস্তান তার সফল পরীক্ষার মাধ্যমে শুধু আদভানীকে নয়, বিশ্ব হিন্দু পরিষদ, আর এস এস, শিবসেনা, বজরং ওয়ালাদের মুখ বন্ধ করেছে অনেকটা চিরতরে। তাই দেখা যায়, এই বাস্তবতাকে স্বীকার করে অটল বিহারী বাজপেয়ী নিজেই ক্রিকেট কূটনীতির মাধ্যমে পাকিস্তানের সাথে সদ্ভাব প্রতিষ্ঠায় অগ্রসর হন। তাই বলি, কাশ্মীরকে কেন্দ্র করে দুই রাষ্ট্রের সীমারেখায় লক্ষ লক্ষ সেনা মোতায়েন হতে পারে। ছোট ছোট খণ্ড যুদ্ধও হতে পারে। কূটনৈতিক পর্যায়ে ঝড়ও উঠতে পারে। কূটনৈতিক সম্পর্কছেদের মতো ঘটনাও ঘটতে পারে। কিন্তু যুদ্ধ বলতে যা বোঝায় তার সম্ভাবনা আর নেই বললেই চলে। **দুই.** ড. মনমোহন সিং কিন্তু অন্য কারণে পাকিস্তানের সাথে সুসম্পর্ক স্থাপনে আগ্রহী এবং তা হল অর্থনৈতিক। দেশের অর্থনীতিকে সচল এবং প্রাণবন্ত করতে হলে দেশের সীমানা বরাবর যে সামরিক বাহিনী এখনো সমবেত রয়েছে এবং কাশ্মীর সমস্যাকে কেন্দ্র করে অর্থনীতি ক্ষেত্রে যে প্রতিনিয়ত রক্তক্ষরণ চলছে তার সুরাহা করতে কৃতসংকল্প ড. মনমোহন সিং। তার নিকট সঠিক অর্থনীতির ভিত্তি সুস্থ রাজনীতি। রাজনীতি উপায় মাত্র। অর্থনীতি তার নিকট উপেয়। লক্ষ্য, উপলক্ষ মাত্র নয়। এদিক থেকে বলা যায়, ড. মনমোহন সিং এর নেতৃত্বে ভারতের রাজনীতির চেহারা পাল্টেছে। বৈপ্লবিক পরিবর্তন এসেছে ভারতীয় রাজনীতিতে।

ভারতের সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক কেমন হবে, কি হওয়া উচিত বৃহৎ ভারতের পাশে ছোট্ট বাংলাদেশের অবস্থান, কীভাবে বাংলাদেশ ভারতের সাথে সদ্ভাবের সূত্রগুলি নাড়াচাড়া করবে–এসব বিষয়ে যারা ভাবনা-চিন্তা করছেন তাদের এই গভীর পরিবর্তন সম্বন্ধে সচেতন হতে হবে সর্বাগ্রে। এ সম্পর্কে সচেতন না হলে মরুদ্যানের সন্ধানে গিয়ে তাদের আছড়ে পড়তে হবে বৃহৎ এক মরুভূমিতে। গাছের আগায় উঠতে গিয়ে তাদের পড়তে হবে মাটিতে। ইসলামিক সংহতি সম্মেলনে বাংলাদেশের ব্যর্থতার মূল এইখানেই নিহিত। ভারতীয় রাজনীতির পটভূমি অন্যদিক থেকেও ভিন্ন হয়ে উঠেছে। প্রেসিডেন্ট এ পি জে আবদুল কালাম একজন মুসলমান। প্রধানমন্ত্রী ড. মনমোহন সিং একজন শিখ ধর্মাবলম্বী। শাসক জোট ইউনাইটেড প্রোগ্রেসিভ এলাইন্সের সংসদীয় দলের নেতা সোনিয়া গান্ধী একজন খৃষ্টান। কেউ কিন্তু তাদের ধর্মীয় পরিচয়কে কোনোভাবে বড় করে দেখেন না। বরং ভারতীয়, একান্তভাবে ভারতীয়–এই পরিচয়ে প্রত্যেকে গর্বিত ভারতীয় নাগরিক। ভারতকে আধুনিক ভারতরূপে গড়ে তুলতে প্রত্যেকে দৃঢ়সংকল্প। এই এলাইন্স অন্যদিকে ভারতের বামপন্থার নেতৃবৃন্দের সমর্থনপুষ্ট। এই বামপন্থার নেতৃবৃন্দের অধিকাংশের নিকট জনকল্যাণ মহামূল্যবান, তা জনগণ ভারতের হোক, পাকিস্তান-বাংলাদেশের হোক অথবা হোক শ্রীলঙ্কা বা নেপাল,

www.pathagar.com

ভুটানের। ভারতের সাধারণ নির্বাচনের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য ছিল ধর্ম, বর্ণ, সম্প্রদায়, ভাষা বা অঞ্চল নির্বিশেষে ভারতের সামগ্রিক স্বার্থকে ধারণ করে এক সর্বভারতীয় নেতৃত্বের উত্থান–যার প্রবল স্রোতে ভেসে গেছে লালকৃষ্ণ আদভানীর "ভারত উদয় যাত্রা", উড়ে গেছে নরেন্দ্র মোদীর সংকীর্ণ "হিন্দুত্বের" গেরুয়া বসনের আবরণ, ছিন্ন-ভিন্ন হয়েছে বিশ্বহিন্দু পরিষদ তথা শিব সেনা–আর এস এসের হিংসাত্মক পতাকা। জন্ম হয়েছে এক নতুন ভারতের। তাদের ভাষা ভিন্ন। ভিন্ন তাদের চিন্তা-ভাবনা। ভিন্ন হয়েছে লক্ষ্যও। ভারতের প্রতিবেশিদের, বিশেষ করে বাংলাদেশের নেতানেত্রীর এই ভাষা বুঝতে হবে। নতুন ভারতের নতুন লক্ষ্য সম্পর্কেও সঠিকভাবে সচেতন হতে হবে।

বিজেপি সরকারের ভাষা বুঝতে অসুবিধা হত না, কেননা তা যেমন ছিল স্থূল, তেমনি অরুচিকর। যেকোনো প্রতিবেশী মর্মে মর্মে তা অনুভব করত। মর্মাহত হত। অনেক সময় মরমে মরে যেত। অন্যের ওপর চাপ সৃষ্টি করতে নতুন নতুন ফন্দি আঁটত। বাংলাভাষী ভারতীয়দের বাংলাদেশে 'পুশ ইন' (Push in) করার, বিশেষ করে সময়ে-অসময়ে উত্তর-পূর্ব ভারতের বিদ্রোহীদের আশ্রয়-প্রশয়-প্রশিক্ষণ দেবার অজুহাত উত্থাপনের ভাষা সবার জানা। পাকিস্তান, নেপাল, ভুটানকে যথোচিত শিক্ষা দেবার হুঙ্কারও তাদের মনে রয়েছে এবং রইবে বহুদিন। শুধু প্রতিবেশীদের প্রতি কেন, দেশের অভ্যন্তরে সহযোগী দলগুলির শীর্ষ পর্যায়ের নেতানেত্রীর সম্পর্কে বিজেপির নেতাদের উচ্চারিত অশ্লীল বক্তব্য সীমানা পেরিয়ে এদিকে এসে পড়ত। একবার গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী উগ্র সাম্প্রদায়িতার মূর্ত প্রতীক নরেন্দ্র মোদী সোনিয়া গান্ধী সম্পর্কে বলেছিলেন, " সোনিয়া এক ধরনের রংচং-এ গাভী। কোনো দোকানদারও তাকে কেরানীর পদে নিয়োগ দেবে না।" ['Sonia is a jersey cow. Even shopkeepers are not ready to employ her as a clerk.'] রাহুল গান্ধী সম্পর্কে তিনি বলেন, "রাহুল গান্ধী একটা দো-আঁশলা বাছুর মাত্র। তাকে আমি আমার গাড়ির চালকরূপেও নিয়োগ দেব না।" ['Rahul Gandhi is a hybrid Calf. I will not employ him as my driver.'] এক্ষেত্রে ভাষা বলতে শুধু উচ্চারিত কথাই বুঝাচ্ছি না, বলতে চাই কলা-কৌশল, নির্ধারিত নীতি ও কার্যক্রমকেও। আজকেও ভারতের নেতৃত্বের সাথে সঠিক যোগাযোগ এবং আদান-প্রদানের জন্যে ভারতের প্রতিবেশীদের, বিশেষ করে বাংলাদেশের নেতৃত্বের প্রয়োজন হবে তাদের যুক্তি সম্পর্কে, তাদের চিন্তা-ভাবনা এবং সংস্কার সম্পর্কে, তাদের ইতিহাস-চেতনা সম্পর্কে অবহিত হওয়া। এর কোনো ব্যতিক্রম ব্যর্থতার নামান্তর।

তাছাড়া, ভারতের মতো বৃহৎ প্রতিবেশীর সাথে সফল আদান-প্রদানের জন্যে প্রয়োজন হবে ভারতের আর্থ-রাজনৈতিক লক্ষ্য, নিরাপত্তার কৌশল, বিশ্বায়নের একালে ভারতীয় নেতৃত্বের বৈশ্বিক দৃষ্টিভঙ্গি (World View) সম্পর্কে পুরোপুরি অবহিত হওয়া। শুধু অবহিত হলেই চলবে না, ভারতের নিকট থেকে কিছু পাবার জন্যে কোনো কোনো ক্ষেত্রে ভারতের দাবি পূরণের ইচ্ছাও পোষণ করতে হবে। আন্তর্জাতিক সম্পর্কে সবকিছুর মূল্য নির্দিষ্ট (Price Tag) রয়েছে। এক্ষেত্রেও তার কোনো ব্যতিক্রম নেই।

www.pathagar.com

তাই সব কিছুর নিরিখে বাংলাদেশের নীতি নির্ধারকদের অনুভবের মানচিত্রকে (Cognitive Map) সুস্পষ্ট রাখতে হবে।

বাংলাদেশ ভারতের নিকট থেকে কি চায়? ভারতের সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক ভালো। তবে আরো ভালো হওয়া প্রয়োজন। এজন্যে বাংলাদেশ কি করতে পারে, জাতীয় স্বার্থ সংরক্ষণ করে কতটুকু অগ্রসর হতে পারে সে সম্পর্কে সুস্পষ্ট হতে হবে সর্বপ্রথম। সে লক্ষ্যে যুক্তিনির্ভর পরিকল্পনা তৈরি করতে হবে। সৎ প্রতিবেশী হিসেবে বাংলাদেশ ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সাতটি রাজ্যের কোনো বিদ্রোহীকে অথবা বিদ্রোহী গ্রুপকে কোনোরূপ সহযোগিতা দিতে পারে না অথবা বাংলাদেশের অভ্যন্তরে তাদের কোনোরূপ আশ্রয়-প্রশ্রয় দিতে পারে না। কিন্তু এই শর্তটি তখনই কার্যকর হতে পারে যখন ভারতও একইরূপ অঙ্গীকারে আবদ্ধ হয়। এসব বিষয়ে আলোচনার মাধ্যমে সমাধান আসবে। এক্ষেত্রে কোনো রকম ছাড় দেবার সুযোগ নেই। কোনো ছাড় দেবার সুযোগ নেই দুই দেশের সীমানা নির্ধারণে–যা কিছু অবশিষ্ট রয়েছে সে ক্ষেত্রেও। এ নিয়ে বাংলাদেশের বিডিআর (BDR) এবং ভারতের সীমান্ত রক্ষী বিএসএফ (BSF) এর মধ্যে মাঝে মাঝেই যে উত্তেজনার সৃষ্টি হচ্ছে তার অবসান হতে পারে যদি যে সাড়ে ছয় মাইল আন্তর্জাতিক সীমানা সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত হয়নি তা অবিলম্বে চিহ্নিত করা সম্ভব হয়। এসব বিষয় অনেকটা রুটিনমাফিক, জটিলতাবিহীন।

কিন্তু সবচেয়ে জটিল বিষয় হল বিজেপি সরকারের আমলে ভারত-বাংলাদেশ যৌথ নদী কমিশনে কোনো আলোচনা ছাড়াই, আন্তর্জাতিক নদীর পানি বণ্টন সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক বিধিবিধান উপেক্ষা করে উজানের দেশ ভারত গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনা অববাহিকার গতিপথে নদী-সংযোগ মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন। এই পরিকল্পনার মাধ্যমে ১২০০ কিলোমিটার দীর্ঘ কৃত্রিম খাল খনন করে ব্রহ্মপুত্র ও গঙ্গার পানি দক্ষিণ ভারতের কাবেরী নদীর সাথে সংযুক্ত করার লক্ষ্য স্থির করা হয়েছে। এই প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে যে ৫৪টি আন্তর্জাতিক নদী রয়েছে তাদের স্বাভাবিক গতি রুদ্ধ হবে। পদ্মা-যমুনা- মেঘনা যে বাংলাদেশের ঠিকানা তা ইতিহাস হয়ে যাবে। ফারাক্কা ব্যারাজ তৈরি করার ফলে আজকে যেমন হার্ডিঞ্জ ব্রিজের নিচ দিয়ে গরুর গাড়ি চলছে, আগামী কাল সদ্য নির্মিত যমুনা ব্রিজের নিজ দিয়ে চলবে ঘোড়ার গাড়ি। নদীমাতৃক বাংলাদেশের নদীপথে চলবে না আর লঞ্চ-স্টিমার। বঙ্গোপসাগরের জোয়ারের পানি উঠে আসবে ভৈরব বাজার ও আরিচা পর্যন্ত। বিশ্বের বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট সুন্দরবন যা ক'বছর পূর্বে বিশ্ব ঐতিহ্য (World Heritage) রূপে স্বীকৃতি লাভ করেছে তা নিঃশেষ হবে। যে জীব বৈচিত্র্য ও প্রাণ বৈচিত্র্যে বাংলাদেশ এত সমৃদ্ধ তার অবসান ঘটবে। ঘরছাড়া হবে বাংলাদেশের কোটি কোটি মানুষ। শুধু বাংলাদেশ কেন, উজানের দেশ নেপাল ও ভুটান, এমনকি উত্তর-পূর্ব ভারতের বিস্তীর্ণ এলাকাও এতে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। ভারতের নদী-সংযোগ মহাপ্রকল্প ছাড়াও রয়েছে গঙ্গার পানির সুষম বণ্টন, তিন বিঘা করিডোরে অবাধ যাতায়াত সমস্যা, বঙ্গোপসাগরের মুহুরী নদীতে জেগে ওঠা চরের ন্যায়ানুগ অধিকারের মতো সমস্যা। অন্যদিকে, ভারত চায় উত্তর-পূর্ব ভারতে যাতায়াতসহ পণ্য পরিবহনের সুবিধা, তাও জলপথে, রেলপথে এবং

www.pathagar.com

স্থলপথে–এক ধরনের বহুমুখী ব্যবস্থা (Multi-Modal) যাতায়াত ও পরিবহন ব্যবস্থা। বাংলাদেশের গ্যাসের প্রতি দৃষ্টি ছিল ভারতের। বাংলাদেশ এ বিষয়ে গ্যাস রপ্তানীর বিপক্ষে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে। তাছাড়াও আর একটি সমস্যা ক্রমে ক্রমে মাথা উঁচু করছে এবং তা হল ভারত-মায়ানমার সহ দশটি এশীয় দেশের সংযোগকারী ট্রান্স-এশিয়া গ্যাস পাইপ লাইন নির্মাণের প্রকল্পটি। এটির সাথে সংশ্লিষ্ট রয়েছে ট্রান্স-বিমসটেক গ্যাস পাইপ লাইন প্রকল্পও। এই দুটি প্রকল্প সম্পর্কে বাংলাদেশ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে সাথে সাথে উত্তর-পূর্ব ভারতের সাথে ভারতের মূল ভূখণ্ডের সংযোগের সমস্যাটি হয় ট্রানশিপমেন্ট, না হয় ট্রানজিটের মাধ্যমে সমাধানের জন্যে জরুরি হয়ে উঠবে।

এসব সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে ভারতের নতুন সরকার কতটুকু আগ্রহী হবে তা বলার সময় এখনো আসেনি, তবে কিছু কিছু সমস্যা সম্পর্কে ইউনাইটেড প্রোগ্রেসিভ এলাইন্সের শক্তিশালী অংশীদার ভারতের বামপন্থার নেতৃবৃন্দের ভূমিকা ইতিবাচক হবার সম্ভাবনাই বেশি, কেননা দক্ষিণ এশিয়ার ১৪ কোটি জনসমষ্টি অধ্যুষিত বাংলাদেশের তেমন মারাত্মক ক্ষতি হতে পারে এমন বিষয়ে তারা কয়েকবার ভেবে দেখবেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে তারা আবেগাপ্লুত না হয়ে বরং যুক্তির নিরিখেই দেখতে অভ্যস্ত। ড. মনমোহন সিং নিজেও অত্যন্ত বিজ্ঞানমনস্ক। নিজের কিঞ্চিত লাভের জন্যে অপরের বড় ক্ষতিকে সানন্দে গ্রহণ করবেন–এমন মানসিকতার অধিকারী তিনি নন।

তবে ভারতের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া কিন্তু এখন অনেক পরিণত হয়েছে। একটি সরকার পরিবর্তন হলে অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশে যেমন নীতির ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন সূচিত হয় ভারতে তেমনটি হয় না। সরকার আসে, যায়, কিন্তু দিল্লির দক্ষিণ প্লাজা (South Block) অনড়ই থাকে। এসব বিবেচনা করে ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কের উন্নয়ন সাধনে, বাংলাদেশের নীতি নির্ধারকদের পথ রচনা করতে হবে। এই প্রসঙ্গে শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান যেভাবে জাতীয় স্বার্থ (National Interest) সংরক্ষণের জন্যে উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন সেই পথেই চলতে হবে। সর্বপ্রথম জাতীয় পর্যায়ে পদক্ষেপ গ্রহণ করা অপরিহার্য। ভারতের নদী-সংযোগ মহাপ্রকল্প সম্পর্কে সমগ্র জাতিকে সচেতন করে, এর বিভিন্ন দিক সুস্পষ্ট করতে হবে সর্বাগ্রে জাতির নিকট। তারপর এই অঞ্চলের সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রগুলিকে (নেপাল, ভুটান, ভারতের পশ্চিম বাংলা ও উত্তর-পূর্ব ভারত) এ বিষয়ে অবহিত করে চূড়ান্ত পর্যায়ে ভারত সরকারের সাথে আলোচনা-পর্যালোচনায় লিপ্ত হওয়া প্রয়োজন। তেমনি উত্তর-পূর্ব ভারতে বাংলাদেশের ভেতর দিয়ে ট্রানজিটের প্রশ্নটিও সর্বপ্রথম জাতীয় পর্যায়ে, তারপর আঞ্চলিক পর্যায়ে বিশ্লেষিত হবার দাবি রাখে। বাংলাদেশ যদি নেপাল, ভুটানে পণ্য পরিবহনে ট্রানজিট লাভ করে, তাহলে উত্তর-পূর্ব ভারতে ট্রানজিটের প্রশ্নটিও সহজ হয়ে আসে। বাংলাদেশের ভেতর দিয়ে মায়ানমার যদি তার সদ্যপ্রাপ্ত গ্যাস ভারতে রপ্তানি করতে পারে তাহলে ট্রানজিটের সমস্যা আরো সহজতর হয়ে ওঠে। ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ককে আরো প্রাণবন্ত ও সৎপ্রতিবেশীসূলভ করার ক্ষেত্রে সাফল্য নির্ভর করবে বাংলাদেশের নীতি নির্ধারকরা কতটুকু সৃজনশীল হতে পারছেন তার ওপর।

www.pathagar.com

বামপন্থার নেতৃত্ব এক্ষেত্রে যতটুকু ইতিবাচক ভূমিকা পালন করবে, অন্যদিকে ভারতের উগ্র হিন্দু জাতীয়তাবাদীরা কিন্তু ততটুকু নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে। এটিও উল্লেযোগ্য যে, বাংলাদেশের শতকরা ৮৫ ভাগ জনসমষ্টি মুসলমান এবং বিজেপির অভিধানে বাংলাদেশ আর একটি পাকিস্তান। এ বিষয়ে বাংলাদেশের অভ্যন্তরেও রয়েছে কিছু কিছু নাম-না-জানা ব্যক্তি ও গোষ্ঠী যারা উঠে পড়ে লেগেছে মৌলবাদী রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশকে চিহ্নিত করতে। এদের মধ্যে রয়েছে মুসলিম ও অমুসলিম উভয় সম্প্রদায়েরই কিছু ব্যক্তি যারা এদেশে আছেন, বিদেশেও আছেন। এদের সম্বন্ধে সদা সতর্ক দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। ভারতে বিজেপি এবং তার অঙ্গ সংগঠনসমূহ ক্ষমতাচ্যুত হয়েছে বটে, কিন্তু অপকর্মে তাদের জুড়ি নেই। ২০০৪ সালের ১ জুলাই কলকাতায় তিন দিন ব্যাপী অনুষ্ঠিত বিশ্ব হিন্দু পরিষদের প্রথম অধিবেশনে পরিষদের সহ-সভাপতি গিরিরাজ কিশোর বলেছেন, "যেভাবে দেশের সব রাজনৈতিক দল হিন্দুদের উপেক্ষা করে মুসলিম কার্ড খেলছে তাতে আগামী পাঁচ বছর পরে ১৯৪৭ সালের দাঙ্গা পরিস্থিতি ফিরে আসবে। এবার শুধু কলকাতায় নয়, সমগ্র ভারত জুড়ে এই দাঙ্গা হবে।" দাঙ্গা হোক বা না হোক অথবা কলকাতায় বা অন্য কোথাও হোক বা না হোক, ভারত এবং বাংলাদেশের মধ্যে সুসম্পর্ক প্রতিষ্ঠার যে নতুন সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে তা দাঙ্গাবাজদের অশুভ প্ররোচনায় বিনষ্ট হতে পারে। বাংলাদেশের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের এ বিষয়েও সচেতন থাকতে হবে, বিশেষ করে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির দেশ হিসেবে বাংলাদেশের যে ভাবমূর্তি রয়েছে তা সংরক্ষণের নিমিত্তে আর এই অনুভব স্মরণে রেখে যে, এদেশের যেসব বড়ো বড়ো অর্জন রয়েছে তার মূলে রয়েছে ধর্ম-বর্ণ-সম্প্রদায় নির্বিশেষে সবার অবদান, বাংলাদেশের অধ্যাত্ম সত্তায় মিছে আছে মানবতার মহান সুর, সর্ব ধর্ম সমন্বয়ে মিলে মিশে মাথা উঁচু করে বেঁচে থাকার মূর্চ্ছনা এবং সবাইকে মহামিলনের ঐকতানে সংশ্লিষ্ট করার অপূর্ব ছন্দ। ভারতের সাথে বাংলাদেশের আদান-প্রদানে বাংলাদেশের এই স্বাতন্ত্র্য যেন আমাদের নীতি নির্ধারকদের অন্যতম মূলধন হয়ে টিকে থাকে।

www.pathagar.com

ভারতের নদী-সংযোগের মহাপরিকল্পনা : বাংলাদেশের আর এক মরণফাঁদ

২০০৩ সালের ১৫ আগস্টে অনুষ্ঠিত ভারতের স্বাধীনতা দিবসের উৎসবমুখর অনুষ্ঠানে দিল্লীর লাল কেল্লা থেকে ভারতের রাষ্ট্রপতি এ পি জে আব্দুল কালাম (আবুল পাকির জয়নালাবদিন আব্দুল কালাম) এবং প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী রাজপেয়ী সগর্বে ঘোষণা দিলেন যে, বৃহত্তর নদী সংযোগ প্রকল্পের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক নদী গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র এবং সেই অববাহিকার সকল নদী থেকে পানি সরিয়ে ভারতের উত্তরাঞ্চলে, উত্তর-পশ্চিমে, এমনকি দক্ষিণের কাবেরী নদী পর্যন্ত টেনে খরাপীড়িত অঞ্চলে পানি সরবরাহের ব্যবস্থা করা হবে। প্রধানমন্ত্রীর কথায়, এই বৃহত্তর প্রকল্পটি (Mega Project) অনেকটা যুদ্ধ-তৎপরতায় সম্পন্ন করার ব্যবস্থা করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। শুধু কি তাই? ভারতের আর একটি প্রিয় প্রকল্প হল সিলেটের উপরে বরাক নদীর উপরে ত্রিপামুখে বাঁধ নির্মাণ করে পানি বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রকল্পের মাধ্যমে সুরমা এবং কুশিয়ারা নদীর প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ। মোট কথা, বাংলাদেশ এবং ভারতের মধ্যে যে ৫৪টি আন্তর্জাতিক নদী রয়েছে সেসব নদীর পানিই এখন ভারত সরকার আটকে দিয়ে নদীগুলোর গতিপথ পরিবর্তন করে, ভারতের পানি-ঘাটতি উত্তর, উত্তর-পশ্চিম ও দক্ষিণাঞ্চলের প্রদেশগুলিতে সরবরাহের ব্যবস্থা গ্রহণে উদ্যোগী হয়েছেন। ২০০৩ সালের ২৪ জুলাই এর Guardian on line এ দেখুন, এভাবে প্রতিবছরে ভারতের সরিয়ে নেয়া পানির পরিমাণ হবে ১৭৩ বিলিয়ন ঘন মিটার। এসব নদীর পানি সরিয়ে নেবার জন্যে ভারত তৈরি করতে উদ্যত হয়েছে ১২০০ কিলোমিটার দীর্ঘ কৃত্রিম নদী। এজন্যে ব্যয় হবে ১৯৯০ সালের হিসেবে প্রায় ১২৪ বিলিয়ন ইউএস ডলার এবং সময় লাগতে পারে ১২ থেকে ১৫ বছর। এ লক্ষ্যে এরই মধ্যে তৈরি হয়ে গেছে নদী-সংযোগ প্রকল্পের টাস্কফোর্স (Task Force on Interlinking of Rivers)। এই টাস্কফোর্সের চেয়ারম্যান সাবেক মন্ত্রী সুরেশ প্রভু এরই মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের টেক্সাস সরকারের সহায়তায় প্রতিশ্রুতিও আদায় করে ছেড়েছেন (*যায় যায় দিন*, ১২ আগস্ট ২০০৩)। এই বৃহত্তর প্রকল্পের মাধ্যমে ভারত এসব নদীর এক-তৃতীয়াংশ পানি সরিয়ে নিতে সক্ষম হবে।

এতে বাংলাদেশের কি হবে?

ভারতের এই বৃহত্তর নদী সংযোগ প্রকল্প যদি সত্যসত্যই বাস্তবায়িত হয় তাহলে বাংলাদেশ শুকিয়ে মরবে। নদীমাতৃক বাংলাদেশের মৃত্যু ঘটবে। মৃত্যু ঘটবে রবীন্দ্রনাথের "সোনার বাংলার"। ধ্বংস হবে নজরুল ইসলামের "আমার বাংলা"র।

www.pathagar.com

পদ্মা-যমুনা-মেঘনা-তিস্তা মহানন্দার পানি হ্রাস পাবে ভীষণভাবে। গঙ্গার উপর ফারাক্কা বাঁধ নির্মাণ করে এরই মধ্যে ভারত পদ্মাকে পানি শূন্য করেছে। বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে শুরু হয়েছে মরুকরণ প্রক্রিয়া। হার্ডিঞ্জ ব্রিজের নিচ দিয়ে শীতকালে চলে গরুর গাড়ি। ভারতের এই মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়িত হলে যমুনা ব্রিজের নিচ দিয়ে চলবে ঘোড়ার গাড়ি। বাংলাদেশের প্রায় অর্ধেক এলাকা লবণাক্ততায় আক্রান্ত হবে। বঙ্গোপসাগরের জোয়ারের প্রভাব আরো উত্তরমুখী হবে। সমুদ্রের পানি চলে আসতে পারে আরিচা এবং ভৈরববাজার পর্যন্ত। হারিয়ে যাবে বিশ্বের বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ (Mangrove) জঙ্গল সুন্দরবন–যা কয়েক বছর পূর্বে স্বীকৃতি লাভ করেছে "ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ" অবস্থান (World Heritage) রূপে। যে জীব বৈচিত্র্য ও প্রাণ বৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ এদেশ, তা বিধ্বস্ত হবে। মাছের চাষ হ্রাস পাবে। বাংলাদেশের কৃষি বিপন্ন হবে। বর্ষাকালে ভারত চাইলে সমগ্র বাংলাদেশকে ৫ ফুট পানির নিচে তলিয়ে দেবে। শীতকালে সমগ্র বাংলাদেশ লাভ করবে মরুভূমির আদল, কেননা শীতকালে বাংলাদেশের নদ-নদীগুলিতে যে পানি আসে তার ৬৫ থেকে ৭০ ভাগ আসে ব্রহ্মপুত্র থেকে। প্রায় ১৪ কোটি জনসমষ্টি অধ্যুষিত বাংলাদেশ হবে বিপন্ন। দেশের পরিবেশ হয়ে উঠবে বিষাক্ত। কোটি কোটি জনসমষ্টি উদ্বাস্তু হয়ে মানবেতর জীবনযাপনে বাধ্য হবে। রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের অস্তিত্ব হুমকির মুখে পড়বে।

ভারতের এই মহাপরিকল্পনার প্রেক্ষাপট :

ভারতীয় রাজনীতি হাজারো বৈপরিত্যে পরিপূর্ণ। ভারতে আধুনিকতার আলো যেমন উজ্জ্বল, তেমনি প্রবল সনাতন ও প্রাচীনপন্থী জীবনবোধ। রাজনীতি ক্ষেত্রে পরিবর্তন যেমন গতিবেগ অর্জন করেছে, তেমনি পিছুটান দিয়েছে অতীত স্মৃতি। সমাজ জীবনে ধর্মনিরপেক্ষতা যতটুকু প্রভাব বিস্তার করেছে, সনাতন ধর্মীয় বোধ, বিশেষ করে ধর্মান্ধতা রাজত্ব করছে তেমনি প্রবল প্রতাপে। গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের বিজয় যতটুকু সূচিত হয়েছে, ততোধিক প্রভাব বিস্তার করেছে সম্প্রদায়গত দ্বন্দ্ব এবং বর্ণবাদ। ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী ১৯৬৮ সালে এক ভাষণে বলেন : "ভারতের জীবনধারা বিভিন্ন স্তরে বিন্যস্ত। ভারতের কিয়দংশের অগ্রগতি পৃথিবীর যেকোনো স্থানের অগ্রগতির সাথে তুলনীয়। কিন্তু সমাজের বৃহত্তর অংশ সনাতন জীবনধারার নিগড়ে আজও আবদ্ধ।"

অসংখ্য সমস্যার মধ্যে রাজনীতিকে সঙ্কটসঙ্কুল ও দুর্যোগপূর্ণ করে তোলে সাম্প্রদায়িকতার কুয়াশা এবং বর্ণবাদের ঝড়ো হাওয়া। ভারতে রয়েছে একদিকে ধর্মনিরপেক্ষতার মহান আদর্শ, অন্যদিকে ধর্মান্ধতার অমানবিক মত্ততা। একদিকে বিকশিত হয়েছে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ, অন্যদিকে তেমনি বিরাজ করছে বর্ণবাদী নির্মমতা। ভারত বিশ্বের দুটি বৃহৎ ধর্মের–হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মের–জন্মস্থান এবং বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম মুসলিম অধ্যুষিত রাষ্ট্র। ভারতে জনসমষ্টির শতকরা ৮৫ ভাগ হিন্দু হলেও হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা বিভিন্ন জাতি- উপজাতি-সম্প্রদায়ে বিভক্ত এবং একই

www.pathagar.com

সম্প্রদায়ে রয়েছে বিভিন্ন বর্ণ। বিভিন্ন সম্প্রদায় ও উপজাতি শিক্ষা-দীক্ষায় এবং অর্থনৈতিক অগ্রগতিতে বিভিন্ন স্তরে বিন্যস্ত। বহুল প্রচারিত মণ্ডল কমিশনে বলা হয়েছে, তপসিলী জাতি ও উপজাতির জনসংখ্যা মোট জনসংখ্যার প্রায় সাড়ে বাইশ ভাগ এবং সবগুলি পশ্চাৎপদ সম্প্রদায়ের জনসংখ্যা মোট জনসমষ্টির প্রায় ৫৩ ভাগ। ভাষা-ধর্ম-বর্ণে বহুধা বিভক্ত ভারতে কিন্তু রাজনৈতিক ক্ষমতা বরাবর প্রয়োগ করে এসেছেন উচ্চবর্ণের সংখ্যালঘু হিন্দু নেতৃবৃন্দ। রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপে তারাই মধ্যমণি। অন্যান্যরা রাজনীতির লক্ষ্যবস্তু। ক্ষমতার প্রয়োগ তারা করেন না, কিন্তু ভোট দিয়ে উঁচু মার্গের ব্যক্তিদের ক্ষমতাসীন করেন। এই সংখ্যালঘু ব্যক্তিবর্গ ভারতের যে অংশে বসবাস করেন তা হল আর্যাবর্ত–বর্তমান ভারতের উত্তর, উত্তর-পশ্চিম এবং মধ্যাঞ্চল। ভারতের এই অঞ্চলকে সমৃদ্ধ করতে, এর অগ্রগতি নিশ্চিত করতে ভারতীয় নেতৃবৃন্দ সবকিছু করতে প্রস্তুত। ভারতের অন্যান্য অংশ চুলোয় যাক, ভারতের ছোট ছোট প্রতিবেশীরা শুকিয়ে মরুক তাতে কী আসে যায়! ভারতীয় নেতৃত্বের এই মানসিকতাই আন্তর্জাতিক নদী বা ব্রহ্মপুত্রকে কেটে ছেঁটে আর্যাবর্তের উপযোগী করার উদ্যোগের জন্যে দায়ী। নীতি-নৈতিকতার কোনো ধার তারা ধারে না। বিধিবিধান, তা জাতীয় হোক আর আন্তর্জাতিক হোক, তাতে কী আসে যায়! নিজেদের প্রয়োজনটাই তাদের নিকট মুখ্য। অন্যেরা মরে মরুক।

তাই দেখি গত শতকের পঞ্চম দশকের প্রথম দিকেই ভারতের এক প্রকৌশলী কর্ণেল দস্তুর প্রস্তাব করেন যে, হিমালয় পর্বতের নিম্নাঞ্চলে অর্ধ-চন্দ্রাকারে বৃহৎ একটি নদী খনন করে হিমালয়ের বরফ গলা পানি সংরক্ষণ করতে হবে। সেই পানি ভারতের উত্তর প্রদেশ, রাজস্থান, অন্ধ্রপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র ও গুজরাটসহ অন্যান্য স্থানে সরবরাহ করা যেতে পারে। সেই ভারতের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন জওহরলাল নেহেরু। নেহেরু মন্ত্রিসভার সদস্য পানিমন্ত্রী কে এল রাও কর্ণেল দস্তুরের প্রস্তাব অধিক ব্যয়বহুল হবে বলে ভারতের উত্তর, উত্তর-পশ্চিম ও মধ্য অঞ্চলে পানি সরবরাহের জন্যে আর একটি মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন করেন। সেই মহাপরিকল্পনার খসড়া "ইন্ডিয়ান ওয়াটার ওয়েলথ" (Indian Water Wealth) শিরোনামে পুস্তক আকারে প্রকাশিত হয়। এই মহাপরিকল্পনায় বলা হয়, ব্রহ্মপুত্রের পানির একাংশ পূর্ব বাংলার মধ্য দিয়ে অথবা উপর দিয়ে খাল কেটে গঙ্গায় ফেলতে হবে। তারপর গঙ্গার পানি সংরক্ষণ করে গঙ্গা-কাবেরী যোগাযোগ চ্যানেলের মাধ্যমে সমগ্র ভারতে বিতরণ করতে হবে। কর্ণেল দস্তুর এবং কে এল রাও এর পরিকল্পনার আলোকে ভারতের সুপ্রিম কোর্টে সম্প্রতি ভারতীয় এক নাগরিক জনকল্যাণমূলক মামলা করলে বিচারক ভারত সরকারকে গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের পানি মধ্য ও দক্ষিণ ভারতে নিয়ে যাওয়ার জন্যে প্রয়োজনীয় প্রকল্প গ্রহণ ও তা বাস্তবায়নের কাজ শুরু করা সম্পর্কে সুপ্রিম কোর্টে রিপোর্ট পেশের নির্দেশ দেন। সেই পরিপ্রেক্ষিতে ভারত সরকার সুরেশ প্রভুর নেতৃত্বে এই উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন টাস্কফোর্স সৃষ্টি করেন।

কর্নেল দস্তুর এবং কে এল রাও এর মহাপরিকল্পনার পরে গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্রে বহু পানি প্রবাহিত হয়েছে। পঞ্চম দশকের শেষ দিকে ভারত কলকাতা বন্দরের নাব্যতা বৃদ্ধির

www.pathagar.com

লক্ষ্যে একতরফাভাবে গঙ্গার পানির একাংশকে সরিয়ে নেবার জন্যে ফারাক্কা ব্যারাজ নির্মাণ করে। স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশের অনিশ্চিত অবস্থার সুযোগ নিয়ে ভারত বাংলাদেশের সাথে আন্তর্জাতিক নদী গঙ্গার পানি বণ্টন সম্পর্কে কোনো চুক্তি না করে ৪১ দিনের জন্যে সেই সংযোগকারী খাল চালু করে। ১৯৭২ সালে ভারতের সাথে আন্তর্জাতিক নদীসমূহের পানি উভয় দেশের স্বার্থে যথাযথ ব্যবহারের লক্ষ্যে ভারত-বাংলাদেশ যৌথ নদী কমিশন (Joint Rivers Commision 1972) গঠন করা হয়। সমগ্র সত্তর দশক ব্যাপী এই কমিশনে ভারতীয় প্রতিনিধিরা একটি বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করে এসেছেন এবং তা হল গঙ্গার পানি প্রবাহ বৃদ্ধির লক্ষ্যে বাংলাদেশের ভেতর দিয়ে গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র খাল নির্মাণের ওপর গুরুত্ব আরোপ।

বাংলাদেশ ভারতের এই প্রস্তাবে রাজি হতে পারেনি প্রধানত তিনটি কারণে : **এক.** গঙ্গা এবং ব্রহ্মপুত্রকে সংযোগ করে খাল নির্মাণ করলে বাংলাদেশের বাইরে উৎপন্ন সকল নদী যেভাবে উত্তর থেকে প্রবাহিত হয়ে দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরে মিশে যাচ্ছে এসব নদীর স্বাভাবিক গতি ভীষণভাবে ব্যাহত হবে। **দুই.** বাংলাদেশের ভেতর দিয়ে সেই খাল নির্মাণ করলে বিশ্বের সবচেয়ে ঘনবসতির বাংলাদেশে অন্তত পক্ষে আড়াই থেকে তিন কোটি মানুষ ঘরছাড়া হবে। **তিন.** এই খাল এত দীর্ঘ এবং গভীর হবে যার ফলে বাংলাদেশের উত্তরে এবং উত্তর-পশ্চিমে পরিবেশ এবং প্রতিবেশে দেখা দেবে ভীষণ অশুভ প্রতিক্রিয়া। ফারাক্কা ব্যারাজ নির্মাণের ফলে এরই মধ্যে বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিম ও দক্ষিণাঞ্চলে মরুকরণ প্রক্রিয়ার সূচনা হয়েছে। পরিবেশ বিষাক্ত হচ্ছে। লবণাক্ততায় আক্রান্ত হয়ে চাষযোগ্য ভূমির পরিমাণ কমে আসছে। সুতরাং বাংলাদেশের পক্ষ থেকে যে সকল যুক্তি দেখানো হয়েছে তা যথার্থ। অন্যদিকে, বাংলাদেশ যে প্রস্তাব করেছিল তা অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গত। বাংলাদেশের প্রস্তাব ছিল নেপাল, ভারত ও বাংলাদেশ সম্মিলিতভাবে উদ্যোগ গ্রহণ করে উজানে বিরাট জলাধার নির্মাণ করে গঙ্গার প্রবাহ বৃদ্ধি করা যায়। এ বিষয়ে নেপালও সহযোগিতার হস্ত প্রসারিত করে। কিন্তু ভারত তার দ্বিপাক্ষিকতার কর্কশ লোমশ হাতের মুঠোয় বাংলাদেশকে আটকে রেখে পানি সমস্যা সমাধানে আগ্রহী হয়ে ওঠে। তারই পরিণতি হল ব্রহ্মপুত্র এবং এই অববাহিকার ৩৬ নদীর সংযোগ ঘটিয়ে এই অববাহিকার পানি সম্পদের বিরাট অংশকে ভারতের বিভিন্ন অংশে ছড়িয়ে দেয়া।

ভারতের এই উদ্যোগ কি বিধিবিধান সম্মত?

ছোট বড় মিলিয়ে বাংলাদেশে রয়েছে ২০০টির মতো নদ-নদী। তার মধ্যে ৫৭টি হল আন্তর্জাতিক, এই অর্থে যে, এসব নদ-নদীর বিস্তৃতি-ব্যাপ্তি একাধিক জাতি বা রাষ্ট্রে। ৫৭টি নদীর মধ্যে ৫৪টি এসেছে ভারত থেকে এবং ৩টি মায়ানমার থেকে। বাংলাদেশের অবস্থান ভাটিতে এবং বাংলাদেশের মধ্য দিয়ে এসব নদী বঙ্গোপসাগরে মিশেছে। বাংলাদেশকে এসব কারণে বলা হয়ে থাকে নদীমাতৃক দেশ। পানির অর্থ জীবন যেমন সত্য ব্যক্তিগত পর্যায়ে, বাংলাদেশের সামষ্টিক জীবনও তেমনি গড়ে

www.pathagar.com

উঠেছে পানিকে কেন্দ্র করে। কোথাও কোনো পর্যায়ে পানির স্বল্পতা সৃষ্টি হলে সৃষ্টি হয় বিপর্যয়। ভারতের এই গোপন উদ্যোগে তাই বাংলাদেশ শঙ্কিত, ভীত, সন্ত্রস্ত।

সমগ্র দক্ষিণ এশিয়ায় রয়েছে প্রধানত তিনটি নদীমালা বা নদী ব্যবস্থা (River Systems)–সিন্ধু, গঙ্গা এবং ব্রহ্মপুত্র। সিন্ধু অববাহিকার অংশীদার ভারত ও পাকিস্তান, কিন্তু গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের সাথে জড়িয়ে রয়েছে ভারত, নেপাল, ভুটান, বাংলাদেশ এবং কিছুটা হলেও চীন। দক্ষিণ এশিয়ার পানি নিয়ে দ্বন্দ্ব এর পূর্বেও দেখা দিয়েছিল। ফলে পানি বণ্টন সংক্রান্ত চুক্তির মাধ্যমে অবস্থা স্বাভাবিক করা হয়েছে। ১৯৬০ সালে সিন্ধু নদী সম্পর্কিত চুক্তি সম্পাদিত হয় ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে। গঙ্গার পানি বণ্টন চুক্তির সর্বশেষটি স্বাক্ষরিত হয় ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে ১৯৯৬ সালে। ভারত এবং নেপালের মধ্যে স্বাক্ষরিত হয় ১৯২০ সালে সারদা চুক্তি, ১৯৫৪ সালে কোসি চুক্তি, ১৯৫৯ সালে গন্ডক চুক্তি এবং ১৯৯৬ সালে মহাকালি চুক্তি। এসব চুক্তির প্রকৃতি ও লক্ষ্য ভিন্ন ভিন্ন। সিন্ধু নদী চুক্তিতে বণ্টন করা হয় নদী, কিন্তু গঙ্গা নদী সম্পর্কিত চুক্তিতে বণ্টন করা হয় নদীর পানি আর নেপালের সাথে স্বাক্ষরিত চুক্তি বণ্টন করা হয় নদী থেকে উৎপন্ন সুবিধাদি।

ভারতের বর্তমান উদ্যোগ কিন্তু গৃহীত হচ্ছে কোনো চুক্তির কাঠামোয় নয়। আন্তর্জাতিক নদী গঙ্গার পানি ভাগীরথী নদীতে সরিয়ে নেবার লক্ষ্যে যেভাবে গোপনে ফিডার ক্যানাল (Feeder Canal) তৈরি করে দুর্বল বাংলাদেশকে বাস্তবতা স্বীকার করতে বাধ্য করা হয়েছিল, ঠিক তেমনিভাবে ব্রহ্মপুত্র অববাহিকার নদ-নদীগুলিকে গোপনে সংযুক্ত করে বাস্তবতাকে স্বীকার করে নেবার জন্যে চাপ সৃষ্টির কৌশল অবলম্বন করেছে। এই কৌশল অনৈতিক। অনৈতিক দুই অর্থে : **এক.** বাংলাদেশ সবসময় ভারতের সাথে সৎ প্রতিবেশীসুলভ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছে। অত্যন্ত দুভার্গ্যের বিষয় হল, ভারত কিন্তু বাংলাদেশের ওপর চাপ সৃষ্টি করে সব সময় সুযোগ-সুবিধা আদায় করতেই ব্যস্ত। প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে ভারত মনে করে বাংলাদেশ তার বর্ধিত সীমানা (extended frontier)। অর্থনৈতিক দিক থেকে বাংলাদেশকে মনে করে ভারতীয় বাজারের একাংশ। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বাংলাদেশকে বন্ধু বা সহযোগী মনে না করে চিহ্নিত করতে চায় অনুগত ফেলো ট্রাভেলাররূপে। তাই ভারতীয় নেতৃত্ব মনে করে আর্যাবর্তে পানি সরবরাহের ব্যবস্থা হলে বাংলাদেশের খুশি হওয়াই উচিত। যাক না বাংলাদেশ শুকিয়ে, তারপরেও তাদের উচিত চুপ থাকা। এতেই তাদের মঙ্গল। এসব বিষয়ে চিৎকার করা অনেকটা বেয়াদবির শামিল। **দুই.** আর এক দিক থেকে ভারতের এই উদ্যোগ অনৈতিক। গঙ্গার উপর ফারাক্কা ব্যারাজ তৈরি বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিম ও মধ্য অঞ্চলে যে বিপর্যয় সৃষ্টি করেছে ভারত বাংলাদেশের পরিবেশ ও প্রতিবেশে (ecology) যে অভাবনীয় সংকট সৃষ্টি করছে সে সম্পর্কে পুরোপুরি সজ্ঞাত ও সচেতন থেকেও এই উদ্যোগ গ্রহণ করতে উদ্যত ভারত। এর ফলে যে সমগ্র বাংলাদেশ ভীষণভাবে বিপন্ন হয়ে উঠবে তা জানা সত্ত্বেও। এই উদ্যোগের বিরুদ্ধে বাংলাদেশ যে প্রতিবাদে সোচ্চার হয়ে উঠবে তা মনে রেখেও। এই উদ্যোগের বিরুদ্ধে নেপাল প্রতিবাদ জানাবে। প্রতিবাদ জানাবে ভুটানও. ভারতের চাপে

www.pathagar.com

সুস্পষ্টভাবে না হলেও। ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলিও ব্রহ্মপুত্রের স্বাভাবিক গতি ব্যাহত হলে অস্বাভাবিক অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে এই আশঙ্কায় প্রতিবাদ করতে পারে। সব জানার পরেও ভারতের নেতৃত্ব এই অশুভ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। ভারতের এই উদ্যোগ শুধু যে অনৈতিক তাই নয়, আন্তর্জাতিক নদ-নদীর পানি সম্পর্কিত বিধি-বিধানেরও পরিপন্থী।

ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে ৩০ বছরের জন্যে সম্পাদিত ১৯৯৬ সালে গঙ্গার পানি বণ্টন চুক্তির ভূমিকায় (Preamble) বলা হয়েছে যে, "দুই দেশ তাদের দেশের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত আন্তর্জাতিক নদীর পানি বণ্টনে স্বীকৃত হয়েছে এই মর্মে যে বন্যা নিয়ন্ত্রণ, পানি সেচ, অববাহিকার উন্নতিসাধন এবং পানি-বিদ্যুৎ উৎপাদনের মাধ্যমে দুই দেশের জনগণের উন্নতি বিধানে এলাকার পানি সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহারে তারা ইচ্ছুক।" ["Desirious of sharing by mutual agreement the waters of the international rivers flowing through the territories of the two countries and making of the optimum utilization of the water resources of their region in the fields, of flood management, irrigation, river basin development and generation of hydro-power for the mutual benefit of the peoples of the two countries."]

আন্তর্জাতিক নদী গঙ্গার পানি বণ্টন সম্পর্কে ভারত-বাংলাদেশ চুক্তি সম্পাদিত হল (অবশ্য এর পূর্বেও ভারত এ সম্পর্কে চুক্তিবদ্ধ হয়েছে বাংলাদেশের সাথে যখন মুরারজী দেশাই ভারতের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন), কিন্তু ব্রহ্মপুত্র ও অন্যান্য ৩৬টি নদী আন্তর্জাতিক হওয়া সত্ত্বেও নদী-সংযোগ মহাপরিকল্পনায় ভারত এককভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে কীভাবে? এক্ষেত্রে ভারতের অনীহা কেন? গঙ্গার পানি চুক্তির নবম অনুচ্ছেদে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখিত হয়েছে যে "উভয় সরকার অন্যান্য নদীর পানি বণ্টন সম্পর্কেও পানি-বণ্টন চুক্তি বা ঐকমত্যে উপনীত হতে সম্মত হয়েছে।" ["Both Government agree to conclude water sharing Treaties/Agreements with regard to other common rivers."] চুক্তির এই শর্তে ভারতকে একতরফা নদী-সংযোগ পরিকল্পনার মাধ্যমে ব্রহ্মপুত্র অববাহিকা থেকে পানি প্রত্যাহারের কোনো অধিকার তো দেয়নি। তাহলে কীভাবে, অন্যদিকে দৃষ্টি না দিয়ে শুধু ১৯৯৬ সালের গঙ্গার পানি বণ্টন চুক্তির দিকে তাকালেই প্রশ্ন করা যায়, ভারত এককভাবে এই উদ্যোগ গ্রহণে উদ্যত হতে পারে?

আন্তর্জাতিক নদী বা পানি সম্পদের ভাগাভাগির বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিশ্বময় এই বিষয়ে সমধিক গুরুত্ব আরোপ করা হচ্ছে। ভারতের নেতৃবৃন্দ তা জানেন। জানেন তা ভারতের পানি বিশেষজ্ঞরাও। আমি কোনো পানি বিশারদ নই। ১২ আগস্টে প্রকাশিত *যায় যায় দিনে* হেলসিংকি থেকে মুহাম্মদ মিজানুর রহমানের লেখা "বাঁচাও গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র : বাঁচাও বাংলাদেশ" শীর্ষক লেখাটি পড়ে একজন সচেতন নাগরিক হিসেবে এই লেখা লিখতে উৎসাহী হয়েছি। লিখতে গিয়ে তথ্য উপাত্তের খোঁজ করতে করতে লাভ করি মস্ত এক ভাণ্ডার এবং সর্বত্রই রয়েছে আন্তর্জাতিক নদী বা হ্রদের ব্যবহার সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট নীতিমালা। অত্যন্ত বেদনার সাথে অনুভব করি, ভারতের

www.pathagar.com

মতো একটি বৃহৎ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র তার ছোট ছোট প্রতিবেশীদের কোনো তোয়াক্কা না করেই একতরফা সিদ্ধান্ত গ্রহণে উদ্যোগী হয়েছে আন্তর্জাতিক নদী ব্রহ্মপুত্র এবং সেই অববাহিকার সকল নদীর পানি নিজের জন্যে গ্রাস করতে। অতীব পরিতাপের বিষয়, বাংলাদেশের জন্মের পরপরই ১৯৭২ সালে সংগঠিত ভারত-বাংলাদেশ যৌথ নদী কমিশনের (Joint Rivers Commision) সাথেও কোনো আলোচনা করার এতটুকু প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেনি ভারত।

আন্তর্জাতিক নদী সম্পর্কিত বিধিবিধানের লঙ্ঘন

আন্তর্জাতিক নদী বা আন্তর্জাতিক পানি সম্পদ ব্যবহারের জন্যে এরই মধ্যে রচিত হয়েছে সুনির্দিষ্ট বিধিবিধান। ১৯৯২ সালের ১৭ মার্চে গৃহীত হেলসিংকি চুক্তির (Convention on the Protection and Use of Transboundary Watercourses and International Lakes- Heisinki Agreement 1992) কয়েকটি শর্তের দিকে দৃষ্টি দিন, বুঝতে এতটুকু অসুবিধা হবার কথা নয়,. ভারতের এই একতরফা উদ্যোগ কত বিধিবিধান বহির্ভূত। এই চুক্তির ২(১) অনুচ্ছেদে লিখিত হয়েছে : "আন্তর্জাতিক পানি সম্পদের পরিবর্তন ক্ষেত্রে সকল পক্ষকে এমন যুক্তিসঙ্গত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে যাতে আন্তঃসীমা প্রতিক্রিয়া (Transboundary Impact) পরিহার করা, নিয়ন্ত্রণ করা বা হ্রাস করা সম্ভব হয়।" ["The parties shall take appropriate measures to prevent, control and reduce any transboundary impact."] "আন্তঃসীমা প্রতিক্রিয়া বলতে বোঝায় আন্তর্জাতিক নদী বা পানি সম্পদে মানুষ সৃষ্ট কোনো উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনের ফলে পরিবেশের ওপর বিরূপ প্রভাব। পরিবেশের ওপর প্রভাবের অন্তর্গত হল মানুষের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার ওপর প্রভাব, এলাকার উদ্ভিদ ও প্রাণীকুলের ওপর প্রভাব, মাটি ও বায়ুমণ্ডলে প্রভাব, পানির পরিমাণে, আবহাওয়ায়, প্রাকৃতিক ভূদৃশ্যের ওপর প্রভাব, এমনকি ঐতিহাসিক কোনো অট্টালিকা বা অন্যান্য প্রাকৃতিক কাঠামোয় অথবা এসবের মিথস্ক্রিয়ার ওপর প্রভাব। এভাবে সৃষ্ট পরিবর্তনের ফলে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বা সামাজিক অর্থনৈতিক অবস্থায় সৃষ্ট প্রভাবও এর অন্তর্গত।" ["Transboundary impact means any significant adverse effect on the environment ressulting from a change in the conditions of transboundary waters caused by a human activity...Such effects on the environments include effects on human health and safety. flora, fauna, soil, air, water, climate, Landscap and historical mouments or other physisal structures or the interaction among these factors; they also include effects on the cultural heritage or socioeconomic conditions resulting from alterations to these factors."]

www.pathagar.com

হেলসিংকি চুক্তির ২(গ) অনুচ্ছেদে আরো বলা হয়েছে : "সকল পক্ষকে নিশ্চিত করতে হবে যে আন্তঃসীমানার পানি সম্পদের এমন চুক্তি যুক্তিসঙ্গত ও ন্যায়ানুগভাবে ব্যবহারে সেই পানি সম্পদের কোনো আন্তঃসীমা প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি না হয়।" ["The parties shall in particuler take all appropriate measures to ensure that transboundary waters are used in a reasonable and equitable way, taking into particular account their transboundary character, in the case of activities which cause or likely to cause transboundary impact."] ব্রহ্মপুত্র নদী ও অন্যান্য ৩৬টি নদীর ক্ষেত্রে পরিবর্তন আনয়নকারী সকল পক্ষই কিন্তু ভারত, যদিও এসব নদীর গতিপথে রয়েছে নেপাল, ভুটান, চীন এবং বাংলাদেশ। বাংলাদেশের মধ্য দিয়েই এসব নদী মিশেছে বঙ্গোপসাগরে। ভারতের এই অশুভ উদ্যোগের সাথে নেই তার কোনো প্রতিবেশী রাষ্ট্র। ভারত এককভাবে এই উদ্যোগ হাতে নিয়েছে।

হেলসিংকি চুক্তি না হয় ইউরোপের রাষ্ট্রসমূহের ওপর প্রযোজ্য, জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে ১৯৯৭ সালের মে মাসে গৃহীত সিদ্ধান্তের দিকে দৃষ্টি দিন, দেখবেন ভারত কত অবহেলাভরে জাতিসংঘের সিদ্ধান্তকে উপেক্ষা করছে। সাধারণ পরিষদে যে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে তার ৫(১) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে : "আন্তর্জাতিক পানি সম্পদের তীরবর্তী রাষ্ট্রগুলি আন্তর্জাতিক পানি সম্পদকে নিজ নিজ রাষ্ট্রে এমন ন্যায়ানুগ ও যুক্তিসঙ্গতভাবে ব্যবহার করবে যেন এর সঠিক ও সযত্ন প্রয়োগ নিশ্চিত হয় এবং এর ব্যবহার কল্যাণকর হয়, বিশেষ করে পানি সংলগ্ন রাষ্ট্রের স্বার্থ সংরক্ষিত হয় এবং এই পানি সম্পদ সংরক্ষিত হয়।" ["Watercourse states shall in their respective territories utilize an international water course in a reasonable manner. In particular, an international watercourse shall be used and developed by watercourse states with a view to attaining optimal and sustainable utilization thereof and benefits thereof, taking into account the interests of the watercourse states concerned, consistent with adequate protection of the watercourse."]

এই সিদ্ধান্তের ৬ নং অনুচ্ছেদে আরো লিখিত হয়েছে : "আন্তর্জাতিক পানি সম্পদের ব্যবহার এমন ন্যায়সঙ্গত ও যুক্তিসংগতভাবে হতে হবে যেন ভৌগোলিক, পানির অস্তিত্ব, পানির গতিবিধি, পরিবেশগত, পারিপার্শ্বিক ও পানি সম্পদের স্বাভাবিক চরিত্র কোনোভাবে বিঘ্নিত না হয়। নদীর তীরবর্তী রাষ্ট্রসমূহের সামাজিক ও অর্থনৈতিক চাহিদা পূর্ণ হয়। বিশেষ করে একটি রাষ্ট্রের পানি ব্যবহারের ফলে যেন অন্য রাষ্ট্রের উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি না হয়।" ["utilization of an international watercourse in an equitable and reasonable manner within the meaning of Articles 5 requires into account all relevant factors and circumstances, including; geographic, hydrographic, climatic,

www.pathagar.com

ecological and other factors of a natural character; the social and economic needs of the watercourse states concerned ; the population dependent on the watercourse in each watercourse state ; the effects of the use or uses of the watercourses in one watercourse state on other watercourse states."] এই সিদ্ধান্তের ৭ অনুচ্ছেদে রয়েছে : "পানি সম্পদের তীরবর্তী রাষ্ট্রগুলি নিজেদের এলাকায় কোনো আন্তর্জাতিক নদীর পানি সম্পদের ব্যবহারে এমন যথাযোগ্য পদক্ষেপ গ্রহণ করবে যেন অন্য রাষ্ট্রের উপর কোনো উল্লেখযোগ্য অশুভ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি না হয়" ["Watercourse states shall, in utilizing an international watercourse in their territories, take all appropriate measure to prevent the causing of significant harm to other water course states."]

এখন ভারতের একক উদ্যোগের সাথে জাতিসংঘের সিদ্ধান্তকে মিলিয়ে দেখুন, রায় আপনার। বাংলাদেশের উত্তর, উত্তর-পূর্ব এবং মধ্য অঞ্চলের সকল নদীতে শীতকালে যে পানি আসে তার প্রায় ৭০ ভাগই আসে ব্রহ্মপুত্র থেকে। এর এক-তৃতীয়াংশ পানি ভারত যদি একতরফাভাবে প্রত্যাহার করে নেয় তাহলে যমুনা-মেঘনার নৌপথ কি চালু থাকবে? তিস্তা প্রকল্প কি টিকে থাকবে? সুরমা এবং কুশিয়ারা কি শুধুমাত্র বন্যার ঢল ধারণ করবে? দেশের ২০০ নদ-নদী শীতকালে কি শুধু খালবিল হয়েই টিকে থাকবে? গঙ্গা-কপোতাক্ষ প্রকল্প এখন পর্যন্ত অর্ধমৃত হয়ে টিকে রয়েছে।'তখন কি হবে তার? যমুনা ব্রিজের অবস্থা তাহলে কি হার্ডিঞ্জ ব্রিজের মতোই হবে? ভারতের উদ্যোগের দিকে দৃষ্টি দিন, কত গোপনে, কত সন্তর্পণে গোপন ষড়যন্ত্রের কালো গ্রন্থি বুনে চলেছে ভারত। নদীমাতৃক সনাতন বাংলার চেহারা তখন কেমন হবে? স্বাধীন বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান ও প্রথম সৃষ্টি যৌথ নদী কমিশনের কি কোনো ভূমিকা থাকবে না এসব ব্যাপারে? বাংলাদেশ তো ভারতের কোনো শত্রু রাষ্ট্র নয় যে, এ বিষয়ে আলোচনা-পর্যালোচনার কোনো সুযোগ গ্রহণ করবে না ভারত? মাত্র ক'বছর আগে বিশ্বের সর্ববৃহৎ 'ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট' সুন্দরবন "বিশ্ব ঐতিহ্য" রূপে স্বীকৃতি লাভ করেছে। লোনা পানির গর্ভজাত সুন্দরবন নদীবাহিত মিঠা পানির কোমল স্পর্শ লাভ করেই হয়েছে সুন্দরবন। নদীর প্রবাহ হ্রাস পেলে লবণাক্ততার আক্রমণে বাংলাদেশের কৃষি জমির পরিমাণ যে হ্রাস পাবে এবং সেক্ষেত্রে এদেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার যে করুণ পরিণতি হবে তা কি আমাদের মহান প্রতিবেশী একবারও ভেবে দেখেছেন? অসংখ্য নদী-নালায় বাংলাদেশের সমৃদ্ধ মৎস্য সম্পদেরই বা কি হবে?

সত্যি বটে, ভারতের কোনো কোনো অঞ্চল খরাপীড়িত বটে, কিন্তু তার জন্য বাংলাদেশকে এভাবে মূল্য দিতে হবে? কৃত্রিম নদীর মাধ্যমে ব্রহ্মপুত্র অববাহিকার পানি প্রবাহিত করলে ঐসব নদীর স্বাভাবিক গতিধারা যে রুদ্ধ হবে এবং ফলে তার পরিণতি কি হতে পারে তা কি ভারতীয় নেতৃত্ব ভেবে দেখেছেন? তাছাড়া, আন্তর্জাতিক নদীর গতি পরিবর্তনের অধিকার এককভাবে ভারত কোথা থেকে পেল? বাংলাদেশ কি শুধু

www.pathagar.com

বন্যায় ভাসবে? শীতকালে শুকিয়ে মরে শুধুমাত্র বন্যাস্নাত হবে? এ ধরনের হাজারো প্রশ্নের মুখোমুখি আজকের বাংলাদেশ।

ভারতের এই উদ্যোগ শুধু ১৯৯৭ সালে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে গৃহীত Convention on the Law of the Non-navigational Uses of internatioal Watercourse এর বিরোধী নয়, নয় শুধু ১৯৯৩ সালে ১৭ মার্চে গৃহীত Convention on the Protection and Use of Transboundary Watercourse and International Lakes- Helsinki Agreement-এর বিরোধী, এই উদ্যোগ Economic Commission for Europe সম্পর্কিত জাতিসংঘের অর্থনৈতিক এবং সামাজিক সংস্থার (Economic and Social Council) ২০০০ সালের ২৩-২৫ মার্চে হেগ-এ অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্তেরও পরিপন্থী। তাছাড়া ভারতের এ উদ্যোগ ১৯৭২ সালে গৃহীত জাতিসংঘের বিশেষজ্ঞ সংস্থা জাতিসংঘের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক সংস্থা ইউনেস্কোর (UNESCO) বিশ্ব ঐতিহ্য সংরক্ষণ সম্মেলনে (World Herittage Convention Concerning the Protecting the World Cultural and National Heritage by UNESCO 1972) সিদ্ধান্তের পরিপন্থী। বিশ্ব ঐতিহ্য সুন্দরবনের মারাত্মক ক্ষতি সাধন করবে ভারতের উদ্যোগ। হয়ত সুন্দরবন চিরতরে ভূপৃষ্ঠ থেকে মুছে যাবে। একইভাবে এই উদ্যোগ ১৯৯৮ সালের জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ সম্পর্কিত (Bio-diversity Convention 1998) সিদ্ধান্তেরও পুরোপুরি পরিপন্থী।

বাংলাদেশের অর্থনীতি, সামাজিক জীবন, এমনকি রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের অস্তিত্বের প্রতি হুমকিস্বরূপ ভারতের এই মহাপরিকল্পনা যেন বাস্তবায়িত না হয় সেজন্যে সর্বপ্রথম জাতীয় পর্যায়ে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠা করে, দলমত নির্বিশেষে সকলকে সচেতন করে রুখে দাঁড়াতে হবে। ভারতের প্রধানমন্ত্রী যেমন সেই প্রকল্পকে বাস্তবায়নের জন্যে যুদ্ধকালীন তৎপরতার আহ্বান জানিয়েছেন, তেমনি যুদ্ধকালীন তৎপরতায় বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ভারত সৃষ্ট এই বিপর্যয়কে প্রতিরোধ করার জন্যে জাতিকে প্রস্তুত হতে হবে। জাগ্রত কোনো জাতিকে কোনো ষড়যন্ত্র পরাস্ত করতে পারে না।

বাংলাদেশ সরকারের নিকট আমাদের প্রত্যাশা, সরকারি পর্যায়ে আমাদের এই জাতীয় সঙ্কট সম্পর্কে বিশ্বজনমত সংগঠন করবেন। আন্তর্জাতিক নদ-নদীর পানি বণ্টন ও প্রত্যাহার সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক বিধিবিধান সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরে জাতিসংঘের বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ সংস্থাকে সজ্ঞাত করে বাংলাদেশের জাতীয় বিপর্যয় প্রতিরোধের ব্যবস্থা করবেন। তাছাড়া, দেশের পানি বিশেষজ্ঞদের মাধ্যমে ভারতের নদী-সংযোগ মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়িত হলে বাংলাদেশের ক্ষতি কোনো কোনো পর্যায়ে কেমন মারাত্মক হয়ে উঠতে পারে তারও প্রামাণ্য দলিল তৈরি করা একান্ত প্রয়োজন। এই তথ্য-উপাত্তের বিবরণ তুলে ধরতে হবে। প্রয়োজন হলে আগামী বছরের প্রথম দিকে অনুষ্ঠিতব্য দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা (সার্ক) শীর্ষ বৈঠকে এই সমস্যা তুলে ধরতে হবে এবং ভারতকে বাংলাদেশ বিরোধী এই প্রকল্প থেকে সরিয়ে আনতে হবে।

www.pathagar.com

জানা গেছে, ভারত এরই মধ্যে বিশ্বব্যাংক ও অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংস্থার নিকট এই মহাপরিকল্পনার জন্যে আর্থিক সহায়তার আবেদন জানিয়েছে। সরকারি পর্যায়ে এসব প্রতিষ্ঠান ও সংস্থার নিকট আমাদের যুক্তিসঙ্গত আপত্তি ও পরিবেশ সম্পর্কিত বিপর্যয়ের কথা তুলে ধরতে হবে যেন ভারত তার এই মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কোনো আর্থিক সহায়তা লাভ না করে।

ভারতের নদী-সংযোগ প্রকল্প সম্পর্কে আমরা যেমন ভীত-সন্ত্রস্ত, জানা গেছে, ভারতের কয়েকটি অঙ্গরাজ্যও তেমনি হতাশ। আগেই বলেছি হাজারো বৈপরিত্যে ভরা ভারত। ভারতে যেমন রয়েছেন নরেন্দ্র মোদীর মতো নেতা, তেমনি রয়েছেন জ্যোতি বসুর মতো প্রতিভাও। রয়েছেন অরুন্ধতি রায়ের মতো প্রতিবাদী কণ্ঠ। এই প্রকল্প বাংলাদেশের জন্যে যেমন ক্ষতিকর, তেমনি ক্ষতিকর প্রতিবেশী কয়েকটি অঙ্গরাজ্যেরও। তাছাড়া, ভারতের পরিবেশবিদ এবং মানবতাবাদীরাও সমগ্র বিষয়টিকে ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখছেন। এই জটিল বিষয়টি সম্পর্কে ভারতের নাগরিকদেরও সচেতন করা প্রয়োজন এবং এর বিকল্প সম্পর্কেও এদেশের পানি বিশেষজ্ঞদের ভেবে-চিন্তে পন্থা নির্ধারণ করতে হবে।

২৬১টি আন্তর্জাতিক নদী ও হ্রদ এবং অসংখ্য আন্তঃসীমার পানি সম্পদের আয়তন বিশ্বের স্থলভাগের প্রায় অর্ধেক। এসব পানি সম্পদের ব্যবহারও হচ্ছে পারস্পরিক বোঝাপড়ার মাধ্যমে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে আন্তঃরাষ্ট্র চুক্তির মাধ্যমে। জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংগঠনের (UN Food and Agriculture Organization-FAO) মতে, আন্তর্জাতিক পানি সম্পদ সম্পর্কিত চুক্তির সংখ্যা প্রায় ৩৬০০ এবং এসব চুক্তির সূচনা হয়েছে ৮০৫ খৃষ্টাব্দ থেকে। আন্তর্জাতিক নদীর পানি ভাগাভাগি করার জন্যেই শুধু সম্পাদিত হয়েছে দুই শতাধিক চুক্তি। এগুলির প্রায় ১৫০টি চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে দুই রাষ্ট্রের মধ্যে। কিছু চুক্তি হয়েছে তিনরাষ্ট্রের মধ্যে এবং কিছু বহু রাষ্ট্রের মধ্যে। কোনো একটি আন্তর্জাতিক নদীর পানি কোনো একটি রাষ্ট্র এককভাবে প্রত্যাহার করেনি আজ পর্যন্ত। সংশ্লিষ্ট প্রকল্পটি একমাত্র ব্যতিক্রম। আমরা আশা করব, ভারতীয় নেতৃত্বেরও শুভ বুদ্ধির উদয় হবে।

www.pathagar.com

আজকের রাজনীতি

বাংলাদেশের রাজনীতি দিনে দিনে প্রতিহিংসামূলক হয়ে উঠেছে। হয়ে পড়েছে ভীষণভাবে সংঘাতময়। স্বাধীনতা ঘোষণার এই মাসে এমন জাতীয় সঙ্কট নিরসনের পন্থা সম্পর্কে কিন্তু কেউ কিছু যে ভাবছেন তা মনে হয় না। দেশের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের অনেকেই বর্তমানকে মুখ্যজ্ঞান করে ভাবছেন ব্যক্তিগত স্বার্থ সম্পর্কে অথবা দলীয় স্বার্থের বিষয়ে। জাতি যে যন্ত্রণায় কাতর হয়ে ছটফট করছে সে বিষয়ে তাদের কোনো ভ্রুক্ষেপ নেই। দেশের প্রধান বিরোধী দল সুনির্দিষ্ট দিনক্ষণ বেঁধে দিয়ে সরকার পতনের আন্দোলনে নেমেছে। ঘোষণা দিয়েছে, সরকার পতনের জন্যে যা যা দরকার তারা তাই করবে। ক্ষমতাসীন জোট সরকারও ২০০১ সালের সাধারণ নির্বাচনে অভূতপূর্ব বিজয় লাভের পরে মাত্র আড়াই বছরের মাথায় বিরোধী দলের সরকার পতনের আন্দোলনের মুখে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে ঘোষণা দিয়েছে, সন্ত্রাসকারীদের কোনো রকম ছাড় দেয়া হবে না। দেশের ছোট ছোট দলগুলিও উত্তপ্ত বাক্য ছুঁড়ে দিয়ে পরিবেশকে ঘোলাটে করে চলেছে। সবাই কিন্তু দেশের জনগণের স্বার্থের দোহাই দিয়ে, জনগণের স্বার্থ সংরক্ষণের নামে, নিজেদের ক্ষমতাশ্রয়ী অভিলাষকে গোপন করে, জনজীবনে নামিয়ে আনতে উদ্যত হয়েছেন অবিমিশ্র এক অভিশাপ। এই অবস্থা অনভিপ্রেত, অনাকাঙ্ক্ষিত। কীভাবে সরকারের পতন ঘটবে এ সম্পর্কে তাদের সুস্পষ্ট কোনো বক্তব্য নেই। ক্ষমতাসীন জোট সরকারের রয়েছে জাতীয় সংসদে দুই-তৃতীয়াংশের অধিক সংখ্যক সদস্যের সমর্থন। সুতরাং নির্বাচিত বৈধ সরকারকে যেভাবে সংসদে অনাস্থা ভোটে পরাজিত করে তার পতন ঘটানো হয় সেভাবে নিশ্চয়ই হবে না। তাহলে কীভাবে? গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে কি? গণঅভ্যুত্থান কীভাবে সংঘটিত হয় তার হিসাব-নিকাশ কি তারা রাখেন? এদেশে গণঅভ্যুত্থান হয়েছিল ১৯৬৯ সালে। তার পটভূমি ছিল ভিন্ন। বাংলাদেশ তখন ছিল পূর্ব পাকিস্তান এবং পূর্ব পাকিস্তান দীর্ঘদিন ধরে জ্বলে মরছিল পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকদের বৈষম্যমূলক চণ্ড শাসন-শোষণের নির্মম উত্তাপে। পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর মোনেম খানের বশংবদ ভূমিকা, তার স্বেচ্ছাচারিতা আর পাকিস্তানি শাসকদের ক্ষমতাদর্পী পদক্ষেপ, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে চরম বৈষম্যমূলক নীতি, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তীব্র বঞ্চনা এবং তখনকার শাসকবৃন্দের বিরুদ্ধে পশ্চিম পাকিস্তানেও বিদ্রোহ, আইয়ুব খান সৃষ্ট সেবাদাস বেসিক ডেমোক্র্যাটদের প্রতি তীব্র ঘৃণা–সব মিলিয়ে ঊনসত্তরে গণঅভ্যুত্থানের সৃষ্টি হয়। সবচেয়ে বড় কথা, এর নেতৃত্বে ছিল জনগণের আস্থাভাজন এক দল আদর্শবাদী, নির্মোহ এবং নিরপেক্ষ তরুণ ছাত্র। ফলে গণঅভ্যুত্থানের উত্তাল তরঙ্গে ভেসে গিয়েছিল পাকিস্তানি শাসন। এখন যারা আন্দোলনে নেতৃত্ব দিচ্ছেন তাদের দিকে তাকালেই তফাৎটা সবার চোখে পড়বে। গণঅভ্যুত্থান বললেই যদি গণঅভ্যুত্থান হয়ে যায় তাহলে কিছু বলার নেই।

www.pathagar.com

১৯৯০ সালের শেষলগ্নে স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনও গণঅভ্যুত্থানের রূপ লাভ করে। এর পটভূমিও ছিল ভিন্ন। স্বৈরাচার হটিয়ে রাজনৈতিক ব্যবস্থা হিসেবে গণতন্ত্রের পুনর্বাসন ছিল এর প্রধান লক্ষ্য। এর নেতৃত্বে ছিল ৮ দলীয়, ৭ দলীয়, ৫ দলীয় জোট এবং জামায়াতের সমন্বয়ে সংগঠিত জাতীয় পার্টি ও দু' একটি ছোট দল ব্যতীত দেশের সকল রাজনৈতিক দল। সুনির্দিষ্ট কর্মসূচির জন্যে এই গণঅভ্যুত্থানে নেতৃত্বদানকারীরা তাদের নির্ধারিত লক্ষ্যের প্রায় কাছাকাছি পৌঁছে যেতে সক্ষম হন।

আজকে যে আন্দোলনের সূচনা করতে চাচ্ছেন কোনো কোনো বিরোধী দল, তারা শুধু আন্দোলনের কথাই বলছেন। লক্ষ্য একটাই এবং তাও নেতিবাচক–বর্তমান জোট সরকারের পতন। সরকারের পতনের পরে তারা দেশে কোন ধরনের সরকার প্রতিষ্ঠা করবেন, তার রূপরেখা কি হবে, কীভাবে গণতন্ত্রকে সার্থক করে তুলবেন, কীভাবে জনগণের দুর্দশা দূর করবেন, কীভাবে কালো টাকা ও সন্ত্রাস দূর করবেন–এসব সম্পর্কে কোনো একটি বাক্য তাদের মুখে উচ্চারিত হয়নি। ক্ষমতাসীন সরকারের পতন ঘটলে তারা ক্ষমতার দুর্গের অধিপতি হবেন–এইটি তাদের আকাঙ্ক্ষা। অর্থাৎ সরকারের প্রতি তীব্র ঘৃণা আর ক্ষমতার প্রতি সীমাহীন লোভ–এই হল এই আন্দোলনের দুটি উপাদান। পূর্ব পরিকল্পনা না থাকার ফলে ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের পরে যা হয়েছিল অর্থাৎ আর এক দফা সামরিক শাসন, তাও আইয়ূব খানের বদলে ইয়াহিয়া খানের মতো এক রক্তপিপাসু জেনারেলের শাসন। জনগণের তাতে কি লাভ হবে? যারা আজ ক্ষমতাসীন তারাও এদেশের মানুষ। তাদেরও সমর্থক গোষ্ঠী রয়েছে। ধরে নেয়া যাক– তাদের পতন হল এবং আন্দোলনকারীরা হল ক্ষমতাসীন। তখন কি হবে? বর্তমানের প্রধান বিরোধী দলের ভূমিকাও তো সবার জানা। তারা সরকার দিনক্ষণ পতনের ঠিক করেছেন আড়াই বছরের মাথায়। ভবিষ্যতের বিরোধী দল একইভাবে সরকার পতনের দিনক্ষণ ঠিক করবে বছরখানেকের মাথায়। তখন কি হবে? জনগণের কথা বলে তারাও তখন একই পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন। জনকল্যাণের নামে তখনও তারা আজকের বিরোধী দলগুলি যা কিছু করছে অথবা সরকার পতনের জন্যে যা যা প্রয়োজন হবে তাই করা হবে বলে যে উক্তিসমূহ বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে, তখনকার বিরোধী দলসমূহ ঠিক তাই করবে। অন্য কথায়, যে সাধের বাংলাদেশের ভিত্তি লাখো লাখো শহীদের পবিত্র রক্তের ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে, তা হবে এক ধরনের মাৎস্য ন্যায়। হয়ে পড়বে নৈরাজ্যের এক নরক। এটি তো কাম্য হতে পারে না।

অনাস্থা ভোটে সরকারকে পরাস্ত করা সম্ভব নয়। বর্তমান অবস্থায় সম্ভব নয় কোনো গণঅভ্যুত্থান ঘটানো। ক্ষমতার মোহে দেশে সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে দেশটাকে শাসনের জন্যে অনুপযুক্ত করে তুলে অনিয়মতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় ক্ষমতার হস্তান্তর কি তাহলে তারা চান? এমনিতেই দেশটি ধীরে অথচ অব্যাহত গতিতে ধাবিত হচ্ছে একটি ব্যর্থ রাষ্ট্রের (failed state) দোরগোড়ায়। এরই মধ্যে ব্যর্থ রাষ্ট্র সম্পর্কে বিরাট সাহিত্য গড়ে উঠেছে। এসব ব্যর্থ রাষ্ট্রের তালিকায় রয়েছে আফগানিস্তান, বুরুন্ডি, ক্যাম্বোডিয়া, কঙ্গো, হেইটি, জর্জিয়া, ইরাক, লাইবেরিয়া, রুয়ান্ডা, সিয়েরা লিওন, সোমালিয়া, সুদান, বসনিয়া-হার্জেগোভিনা, ক্রোয়েশিয়া, কসোভো এবং আরো অনেক।

www.pathagar.com

এদেশের অভ্যন্তরে এবং দেশের বাইরে বাংলাদেশকে এমনি ধরনের রাষ্ট্রে রূপান্তরিত করার উদ্যোগে একদল কৃতবিদ্য ব্যক্তি কর্মরত রয়েছেন। অনেক বিদেশী পর্যালোচক এরই মধ্যে বলতে শুরু করেছেন, জার্মান দার্শনিক কান্টের (Kant) সেই বিখ্যাত উক্তি–"অব্যাহত শান্তির" সেই তৃতীয় উপাদান–"বিশ্বজনীন আতিথেয়তা" ['Third article of perpetual peace–Universal hospitality'] বাংলাদেশ থেকে ক্রমে ক্রমে অপসারিত হচ্ছে। সরকার পতনের আন্দোলনকারীদের লক্ষ্য নিশ্চয়ই তেমন নয়। বাংলাদেশ কোনো এক আশ্রিত রাজ্যে পরিণত হোক–তা তারা চান কি?

সুনির্দিষ্ট দিনক্ষণ ঠিক করে সরকারের পতন সম্পর্কিত বক্তব্য, তাও দেশের একটি বৃহৎ রাজনৈতিক দলের শীর্ষস্থানীয় এক নেতার বক্তব্য যে দিক থেকেই পর্যালোচনা করুন, তা যে অরাজনৈতিক এতে কোনো সন্দেহ নেই। রাজনীতির ভাষা এমন হয় না। এই জাতির দুর্ভাগ্য, ঐ বক্তব্য শেষ পর্যন্ত শুধুমাত্র সেই নেতার বক্তব্য থাকেনি। দলীয় ওয়ার্কিং কমিটি তা অনুমোদনও করেছে। অনুমোদিত হয়েছে, সেই লক্ষ্যে যা কিছু প্রয়োজন তার সবকিছু করা হবে। এই ধরনের বক্তব্য শুধু অশোভন নয়, এর ইমপ্লিকেশনও বড় মারাত্মক। **এক.** এমনিতেই দেশে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি অত্যন্ত নাজুক। এই ধরনের বক্তব্যে এই পরিস্থিতির অবনতি ঘটতে পারে মারাত্মকভাবে। জনজীবন বিপর্যস্ত হয়ে উঠতে পারে। **দুই.** এর ফলে পেশাদার খুনী, সন্ত্রাসী ও বিভিন্ন স্তরের কু-কর্মকারীরা উৎসাহিত হয়ে উঠতে পারে। **তিন.** দেশের অভ্যন্তরে এবং বাইরে যারা বাংলাদেশের ভাবমূর্তি ম্লান হলে খুশি হয় তারাও উৎসাহিত হবে এবং সমগ্র ভূখণ্ড হয়ে উঠতে পারে ষড়যন্ত্রের এক কালো কক্ষ (black chamber)।

যেকোনো বিরোধী দল ক্ষমতাসীন সরকারের পতন চাইতে পারে। সরকারের ব্যর্থতা শত মঞ্চ থেকে প্রচার করতে পারে। সরকারের ওপর চাপ প্রয়োগ করে মিড-টার্ম নির্বাচন দাবি করতেও পারে। কিন্তু বৈধ নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতাসীন সরকারের বিরুদ্ধে "যা যা প্রয়োজন তাই করা হবে" প্রক্রিয়ায় তার পতনের উদ্যোগ গ্রহণ কখনো গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। রাজনীতি বিশ্বময় স্বীকৃত হয়েছে আইনানুগ, কল্যাণমূলক এক যৌথ কর্ম হিসেবে। জে ডি বি মিলারের কথায়, "রাজনীতি হল নৈতিকতাবোধে উদ্বুদ্ধ এক সুদৃঢ় প্রত্যয়ে কোনো কল্যাণমূলক কর্ম সম্পন্ন করা।" ["Politics is a means of getting things done, often with a strong sense of moral urgency."] এই মহান দায়িত্বে নিয়োজত ব্যক্তিবর্গের মুখে এমন সব কথা কি শোভা পায়? ক্ষমতাসীন জোট সরকারের পতনই তাদের মুখ্য বিষয়, তাদের প্রতিদিনের ধ্যান-জ্ঞান, তাদের পরম কাম্য বিষয়। কিন্তু যে রাজনীতি সমাজে দুর্নীতির শাখা-প্রশাখার বিস্তার ঘটায়, যে রাজনীতি ক্ষমতার রাজনীতিতে রূপান্তরিত হয়, আইনের শাসনের পরিবর্তে যা ব্যক্তিগত ও পারিবারিক প্রভাবের শত শাখা পল্লবিত করে, যে রাজনীতি জনগণকে শুধুমাত্র ক্ষমতাসীনদের ক্ষমতার সোপানরূপে ব্যবহার করেই নিশ্চিন্ত, যে রাজনীতি সব দলকে সম্মিলিত করে এক মঞ্চে টেনে এনে জনকল্যাণের শত বাতায়ন উন্মুক্ত করতে পারে, ৩০ এপ্রিলের মধ্যে সরকার পতনে উদ্যোগীদের ভাবনায় এসবের কোনো প্রতিফলন নেই। তাই প্রকৃত প্রস্তাবে সরকার পতনের এই আন্দোলন নিছক

www.pathagar.com

প্রতিহিংসামূলক, নেহাত ক্ষমতার রাজনীতি প্রসূত। এতে কোনো মহৎ উদ্দেশ্য নেই। এতে ভবিষ্যতের উজ্জ্বল স্বপ্ন নেই। ৩০ এপ্রিলের মধ্যে আওয়ামী লীগের সংসদ সদস্যগণ পদত্যাগ করে সরকারকে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক চাপের মুখে টেনে আনতে পারেন। অতীতেও এমন দৃষ্টান্তের সাক্ষাৎ মেলে। ১৯৯৪ সালের ২৮ ডিসেম্বর বিরোধী দলীয় তিন জোটের সদস্যবৃন্দ পদত্যাগ করেছিলেন এবং সেই সংখ্যা ছিল উল্লেখযোগ্য। মোট সংসদ সদস্য সংখ্যার অর্ধেকের প্রায় কাছাকাছি। পদত্যাগ করার পর পরই তারা সাধারণ নির্বাচন পরিচালনার জন্যে নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা দাবি করেছেন, এটা জেনেশুনেই যে নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্যে প্রয়োজন সংসদ সদস্যদের দুই-তৃতীয়াংশের ভোট। অন্য কথায়, তখন বিরোধীদলসমূহ চেয়েছেন দেশে "সরকারবিহীন" (a no-government) অবস্থা সৃষ্টি করতে। একদিকে সংসদ সদস্যদের পদত্যাগ, অন্যদিকে বেসামরিক প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের সহযোগে "জনতার মঞ্চ" খাড়া করা এবং নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রতিষ্ঠার দাবি–সব মিলিয়ে এক নৈরাজ্যের রূপরেখা তৈরি হয়। ভ্রাক্ষাকুঞ্জের সরব গুঞ্জন, তাদেরই উদ্যোগে উত্তর পাড়াতেও কিছুটা প্রস্তুতি চলছিল–যার প্রতিফলন দেখা গেল মাত্র ক'মাস পরে ১৯৯৬ সালের মে মাসে। বিএনপির দুঃসাহসিক পদক্ষেপ ছিল তখন হাজারো দোষে দুষ্ট ষষ্ঠ সংসদের নির্বাচন অনুষ্ঠান এবং নির্বাচনের পরে তেরতম সংবিধান সংশোধন ১৯৯৬ প্রণয়ন। তা না হলে দীর্ঘ সংগ্রামের মধ্য দিয়ে ১৯৯১ সালে দেশে যে গণতন্ত্রের পুনর্বাসন ঘটে তার ধারাবাহিকতা বিনষ্ট হত। এবার বিরোধী দলীয় সংসদ সদস্যদের পদত্যাগের ফলে তেমন অবস্থারও সৃষ্টি হবে না। হবে না কোনো ধরনের সরকারবিহীন অবস্থার সৃষ্টি। তবে দেশের অভ্যন্তরে সৃষ্টি হবে রাজনৈতিক নেতাদের সম্পর্কে তীব্র অনীহা। রাজনীতি হবে পরাজিত। আর দেশের বাইরে বাংলাদেশ সম্পর্কে সৃষ্টি হবে উপেক্ষা, ভ্রুকুটিপূর্ণ উপহাস। জনগণের জীবন হয়ে উঠবে দুর্বিষহ। হত্যাকাণ্ড বৃদ্ধি পাবে। সন্ত্রাসীরা লাভ করবে নতুন উৎসাহ। বাংলাদেশের ভাবমূর্তি কলঙ্কিত হলে যারা খুশি হন তারা হাসাহাসি করবে। স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ সৃষ্টিতে যাদের অবদান সর্বাধিক তারা বহু দূরে থেকেও বাংলাদেশের রাজনীতিকদের ধিক্কার দেবেন।

সরকার কাঠামোয় প্রয়োজনীয় সংস্কার সাধনের পরিকল্পনা ব্যতীত সরকার পতনের আন্দোলনে ক্ষতিগ্রস্ত হবেন না আন্দোলনকারীরা। ক্ষতিগ্রস্ত হবেন না ক্ষমতাসীনরা। ক্ষতিগ্রস্ত হবে এদেশের সাধারণ মানুষ। ক্ষতিগ্রস্ত হবে বাংলাদেশ। সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে বাংলাদেশের রাজনীতি। এই রাজনীতিকে তখন পদতলে দলিত মথিত করে অনিয়মতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় কোনো ক্ষমতাশালী শাসন দণ্ড ধারণ করতে পারেন। গণতান্ত্রিক বাংলাদেশের জন্যে সংগ্রাম শুরু করতে হবে তখন আবারো গোড়া থেকে। কেউ বলবেন না যে, বাংলাদেশে গণতন্ত্র সফলভাবে চলছে। প্রতিপদে তা হোঁচট খাচ্ছে, কিন্তু তার পরেও তা অব্যাহত রয়েছে। অনেকের প্রত্যাশা, একদিন হয়ত শক্ত মাটিতে পা রেখে তা চলা শুরু করবে। এমনি সময়ে, নিছক হঠকারিতার মাধ্যমে, একটি বৈধ সরকারের পতন ঘটিয়ে দেশময় নৈরাজ্যের আমন্ত্রণ কোনোক্রমে কাঙ্ক্ষিত নয়।

www.pathagar.com

বাংলাদেশ রাজনীতি ক্ষেত্রে তৃতীয় পন্থা

[এক]

বাংলাদেশ রাজনীতি ক্ষেত্রে তৃতীয় শক্তি অথবা তৃতীয় পন্থার আবেদন সম্পর্কে দেশময় একটি প্রবল বিতর্ক প্রায় সবাইকে সংশ্লিষ্ট করে ফেলেছে। এই বিতর্কে উত্তাপও সৃষ্টি হয়েছে যথেষ্ট। কিন্তু সেই পরিমাণ আলোর সৃষ্টি এখনো হয়নি। দেশের প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক দলগুলির নেতৃবৃন্দ কথা বলে চলেছেন তারস্বরে। বুদ্ধিজীবীদের উচ্চকণ্ঠও শোনা যাচ্ছে। প্রায় প্রতিদিন সংবাদপত্রেও প্রকাশিত হচ্ছে এ সম্পর্কে লেখালেখি। এই লেখাটিও সম্ভবত সৃষ্টি করবে কিছুটা কনফিউশন। তারপরেও লিখছি এজন্যে যে, বাংলাদেশ রাজনীতিতে এখন সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন কিছুটা সুস্থতা। এই বিতর্কে উত্তাপ সৃষ্টি হোক। সাথে সাথে সৃষ্টি হোক কিছুটা আলোও। আলোর পথে জাতীয় রাজনীতি অগ্রসরমান হলে এর অন্ধকার দিকটাও আলোকিত হবে। দেশের অসুস্থ রাজনীতি লাভ করবে সুস্থতার শুভ আশীর্বাদ।

অনেকের মনে থাকতে পারে, ১৯৯৮ সালের মাঝামাঝি নিউইয়র্কের 'তৃতীয় পন্থা' ("Third Way") শিরোনামে একটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। এই সেমিনারে ইউরোপের রাজনৈতিক হালচাল সম্পর্কেই বিশদ আলোচনা হয়। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী টনি ব্লেয়ার উপস্থাপন করেন মূল প্রস্তাবনা (Keynote Paper)। ইতালির প্রধানমন্ত্রী রোমানো প্রোদিসহ বেশ কয়েকজন সরকার প্রধান সেমিনারে বক্তব্য রাখেন। বক্তব্য রাখেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটন এবং হিলারী ক্লিনটনও। তখন থেকেই ইউরোপে তৃতীয় পন্থা প্রত্যয়টি খুব জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। ঐ সময় আয়ারল্যান্ড ও স্পেন ছাড়া ইউরোপীয় ইউনিয়নের অন্যান্য রাষ্ট্রে বামপন্থী সরকার ছিল ক্ষমতাসীন। স্ক্যান্ডিনেভিয়ান দেশগুলোতে বামপন্থী সরকার আগে থেকেই ক্ষমতাসীন ছিল। ঐ সময়ে ব্রিটেনে টনি ব্লেয়ার, ফ্রান্সে জসপাঁ এবং জার্মানিতে গেরহার্ড শ্রোডোরের বিজয় ইউরোপে বামপন্থীদের বিরাট বিজয়রূপে চিহ্নিত হয়।

ইউরোপের প্রায় সকল সরকার বামপন্থী হলেও এই বাম কিন্তু সেই ক্লাসিক্যাল বাম নয়। উৎপাদনের সকল উপাদানকে রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে এনে পরিকল্পিতভাবে "কম্যান্ড" অর্থনীতির মাধ্যমে বণ্টন ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের একচেটিয়া অধিকার প্রতিষ্ঠিত করে, পুঁজিবাদের গতি রুদ্ধ করে এবং রাজনীতি ক্ষেত্রে সর্বহারাদের প্রতিনিধিত্বকারী দলকে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা প্রয়োগের দায়িত্বে যে বামের কথা মাত্র দেড় দশক আগেও বিশ্ব জানত, ইউরোপের বাম সেখান থেকে সরে এসেছে কয়েক'শ যোজন দূরে। এমনকি ক্লাসিক্যাল বামরূপে পরিচিত হতেও তারা কোনোক্রমে আর রাজি নয়। ফ্রান্সের প্রধানমন্ত্রী তাদের বামকে বললেন 'গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্র' ('Democratic Socialism')। শ্রোয়েডার

www.pathagar.com

বললেন 'নতুন মধ্যপন্থা' ('New Centre')। টনি ব্লেয়ার তার বামকে চিহ্নিত করলেন 'তৃতীয় পন্থা' ('Third Way') রূপে। তার পুরনো লেবার পার্টিকে বললেন 'নতুন লেবার পার্টি' ('New Labour')। এসব বাম-শাসিত দেশে অর্থনীতি ক্ষেত্রেও নেই কোনো সমরূপতা। ইতালিতে প্রধানমন্ত্রী প্রোদি ধনাঢ্যদের ওপর কর আরোপের প্রস্তাব করলেও, ব্রিটেন ও ফ্রান্সে ধনী ব্যক্তিদের ওপর আয়কর কমিয়ে দেয়া হয়েছে। ফ্রান্সে বামপন্থী প্রধানমন্ত্রীর আমলেই সর্বাধিক সংখ্যক সরকারি স্থাপনা বেসরকারি নিয়ন্ত্রণে ছেড়ে দেয়া হয়েছে। এই বাম প্রকৃত প্রস্তাবে সমাজতন্ত্র এবং পুঁজিবাদের সমন্বয় নয়। এই বাম উদারবাদ (Liberalism) এবং সোসাল ডেমোক্র্যাসির সমন্বয়। এই বাম এখনো ইউরোপের তৃতীয় পন্থারূপে চিহ্নিত। বাংলাদেশে এখন যে তৃতীয় পন্থা বা বিকল্প পন্থার কথা বলা হচ্ছে তা কিন্তু ইউরোপের তৃতীয় পন্থার ধারে-কাছেও নেই।

তৃতীয় শক্তি বলতে তা হলে কি দেশের বামপন্থী দলগুলির ঐক্যজোটকে বোঝানো হচ্ছে? দেশের বামপন্থী দলগুলির দিকে দৃষ্টি দিন, অনুধাবনে এতটুকু অসুবিধা হবে না, এদেশে বাম রাজনীতির ভবিষ্যৎ তেমন উজ্জ্বল নয় এবং তাও অনেক কারণে। বাম রাজনীতি মূলত বঞ্চিতদের রাজনীতি। সর্বহারাদের রাজনীতি। উৎপাদন বৃদ্ধির রাজনীতি এবং সুষম বণ্টনের রাজনীতি। এদিক থেকে বাংলাদেশে বাম রাজনীতির ক্ষেত্র উর্বর হওয়া সত্ত্বেও ঘটেনি এদেশে বাম রাজনীতির বিকাশ। বাম চিন্তাভাবনা বঞ্চিত ও সর্বহারাদের অনুভূতিকে ধারণ করে, সংগ্রামী ঐতিহ্যের তীর ঘেঁষে সমাজ জীবনের দু'কূল ছাপিয়ে ওঠেনি। নেতৃত্বের যে স্ফুলিঙ্গ গণমনে আত্মশক্তির অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করে তা এ সমাজে প্রাণ পায়নি। এমনকি যাদের জন্যে এই বাম রাজনীতি তাদের মধ্যেও অনুরণিত হয়নি দীপ্ত সংগ্রামী চেতনা। বাম নেতৃত্বের আবেদন তাদের মধ্যে সৃষ্টি করেনি তেমন প্রাণঢালা আনুগত্য ও বিশ্বাস। এর কারণ একদিকে যেমন নেতৃত্বের দৈন্যদশা, অন্যদিকে তেমনি তত্ত্বের অপ্রতুলতা। বাম-সুবিধাবাদিতা (Left oppportunism) কোনো কোনো ক্ষেত্রে অত্যন্ত প্রকট। নেতৃবর্গের কাজকর্ম ও তাদের বক্তব্যের সাথে অনেক সময়ই দেখা যায় অসঙ্গতি। যারা বিপ্লবের কথা বেশি বলেছেন তাদের অনেকেই তাদের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার করিডোরে ঘোরাফেরা করে ব্যক্তিগত সুবিধা আদায় করেছেন। কেউ কেউ অগণতান্ত্রিক সরকারের দোসর হয়েছেন। সংগঠনকে ব্যবহার করে ব্যক্তিগত সুবিধা আদায় করেছেন।

এই অভিযোগগুলি উত্থাপন করছি এজন্যে যে, জাতীয় সঙ্কটকালে বামপন্থার বাণীই হতে পারত জনগণের বাণী। তারাই ধারণ করতে পারতেন জনস্বার্থের পতাকা। ক্ষমতাশ্রয়ী সরকারি ব্যবস্থাপনার অনাচার এবং নির্যাতনের বিরুদ্ধে তারাই জনগণকে সচেতন করতে পারতেন। পারতেন তাদের প্রতিবাদমুখর করতে এবং চূড়ান্ত পর্যায়ে প্রতিরোধের আগুন জ্বালাতে সামাজিক উপত্যকার সর্বস্তরে। না, তা হবার নয় অন্তত অদূর ভবিষ্যতে। বাম নেতৃত্বের কোনো প্রস্তুতি নেই এক্ষেত্রে। দেশের বামপন্থার নেতৃবৃন্দের অনেককেই আমি চিনি এবং শ্রদ্ধা করি। অনেকের চিন্তার সততা এবং কর্মের দৃঢ়তা আদর্শস্থানীয় বটে, কিন্তু এদেশের রাজনৈতিক শক্তি (Political force) হিসেবে তারা এখনো পুরোপুরি প্রস্তুত হতে পারেননি।

www.pathagar.com

[দুই]

বাংলাদেশের মতো অনগ্রসর জনপদে তৃতীয় শক্তি বলতে বুঝায় সামরিক বাহিনীর কর্তৃত্বকে। কিন্তু এ তো রাজনীতি নয়। রাজনীতির যেখানে সমাপ্তি ঘটে, সামরিক শাসনের শুরু সেখান থেকেই হয়। রাজনীতির ক্ষেত্রে সামরিক বাহিনীর হস্তক্ষেপ নতুন নয়। নতুন নয় সামরিক বাহিনীর রাজনৈতিক ভূমিকা। এটি সাম্প্রতিক ঘটনাও নয়। দীর্ঘদিন থেকেই এই ধারা প্রবহমান। সার্বভৌম রাষ্ট্রের উদ্ভব এবং স্থায়ী সামরিক বাহিনীর (Standing Army) জন্ম প্রায় একই সূত্রে গ্রথিত। মধ্যযুগে এ ধরনের ঘটনা ঘটেনি, কেননা মধ্যযুগে রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত স্থায়ী সামরিক বাহিনীও ছিল না। ছিল না প্রাচীনকালেও। রোম সাম্রাজ্যের শেষ পর্যায়ে সামরিক বাহিনীর খানিকটা সংহত রূপ চোখে পড়ে এবং সাথে সাথে চোখে পড়ে সামরিক বাহিনীর রাজনৈতিক ভূমিকাও। প্রিটোরিয়ান গার্ড (Praetorian Guard) কর্তৃক রোমান সাম্রাজ্যের রাজনীতি ক্ষেত্রে এমনি হস্তক্ষেপের সূচনা তখন থেকেই।

বিশ শতকের সূচনালগ্নে বিশ্বে সর্বমোট স্বাধীন রাষ্ট্র ছিল ৪৮টি। ১৯০০ থেকে ১৯১৭ সালের মধ্যে আরো ৩টি স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্ম হয়। এই ৫১টি রাষ্ট্রের ৩২টি রাষ্ট্রে ঘটেছে সামরিক বাহিনীর হস্তক্ষেপ। ১৯১৭ থেকে ১৯৫৫ পর্যন্ত আরো ২৮টি রাষ্ট্রের জন্ম হয়। তাদেরও ১৩টি কোনো না কোনো পর্যায়ে নিয়ন্ত্রিত হয় সামরিক বাহিনী কর্তৃক। ১৯৯০ এর জুন পর্যন্ত জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্র ছিল ১৫৯টি। তাদের ৮২টি অর্থাৎ প্রায় অর্ধেক রাষ্ট্র কোনো না কোনো পর্যায়ে সামরিক শাসনের মধ্য দিয়ে পথ চলেছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর এই সমস্যা প্রকট হয়ে ওঠে।

তৃতীয় বিশ্ব বা উন্নয়নশীল বিশ্বের প্রায় সর্বত্রই এই ঘটনা ঘটেছে। তবে চারটি অঞ্চলে সামরিক বাহিনীর হস্তক্ষেপ দেখা দেয় অনেকটা মহামারীর মতো। ল্যাটিন আমেরিকা, আফ্রিকা, মধ্যপ্রাচ্য এবং দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া হল এই চারটি এলাকা। ১৯৪৫ সাল থেকে ১৯৮৪ সাল পর্যন্ত সমগ্র বিশ্বে সফল অভ্যুত্থানের সংখ্যা ৩১৬টি। ব্যর্থ অভ্যুত্থান বা অভ্যুত্থান প্রচেষ্টা এই হিসেবে আনলে মোট সংখ্যা দাঁড়ায় ৬১৫টি। এর ২০৩টি অভ্যুত্থান ঘটে আফ্রিকায়, ২০৭ টি ল্যাটিন আমেরিকায়. ৭৩টি মধ্যপ্রাচ্যে এবং ১১৩টি ঘটে দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায়। ইউরোপেও ঘটেছে এই ধরনের ১৯টি ঘটনা।

বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে সামরিক বাহিনীর রয়েছে তিনটি বিশেষ সুবিধা। **এক.** সাংগঠনিক ক্ষেত্রে রয়েছে তাদের কাঠামোগত শ্রেষ্ঠত্ব। পদসোপান, অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা, নির্দেশদানের সরল রেখা এবং প্রাতিষ্ঠানিক আনুগত্য। রাজনৈতিক দলের এই সুবিধা নেই, সুবিধা নেই অন্যকোনো সংগঠনের। **দুই.** এসব দেশে সামরিক বাহিনী হল সার্বভৌমত্বের প্রতীক। জাতীয় নিরাপত্তার অতন্দ্র প্রহরী হিসেবে রয়েছে তাদের এক আবেগজড়িত অবস্থান। **তিন.** দেশের অত্যাধুনিক অস্ত্রশস্ত্রের ওপর রয়েছে সামরিক বাহিনীর একচেটিয়া অধিকার। তা সত্ত্বেও সামরিক বাহিনী সব সময় রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় হস্তক্ষেপ করে না অথবা করতে পারে না। এরও কতকগুলি কারণ রয়েছে। **প্রথমত,**

www.pathagar.com

অত্যন্ত আদিম বা সনাতন সমাজ ছাড়া উন্নয়নের স্পর্শ লেগেছে এমন সমাজকে শাসন করার ক্ষমতা বা দক্ষতা সামরিক বাহিনীর নেই। তাই ক্ষমতা দখলে আগ্রহী হলে তাদের খুঁজতে হয় অংশীদার। কোনো ক্ষেত্রে সিভিল সার্ভিসকে কাছে নিয়ে, কোনো কোনো সময়ে কোনো রাজনৈতিক দল বা দলের কিছু নেতাকে কাছে পেয়ে তাদের এ কাজটি করতে হয়। **দ্বিতীয়ত,** সামরিক বাহিনীর শাসনব্যবস্থা পরিচালনার নেই কোনো বৈধ অধিকার। নেই কোনো নৈতিক দায়িত্বও। **তৃতীয়ত.** যেসব কারণে সামরিক বাহিনী এত বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হতে পেরেছে, ক্ষমতা দখল করলে অথবা ক্ষমতায় টিকে থাকতে চাইলে ঐসব গুণের বিকৃতি ঘটে। বিনষ্ট হয় সাংগঠনিক সংহতি। প্রাতিষ্ঠানিক ঐক্যও। তাই সামরিক বাহিনী বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে অত্যন্ত সুবিধাজনক পরিস্থিতিতে অভ্যুত্থান ঘটায়।

এজন্যে যতটুকু দায়ী সামরিক কর্মকর্তারা, তাদের উচ্চাভিলাষ ও উচ্চাকাঙ্ক্ষা, ঠিক ততটুকু দায়ী রাজনৈতিক নেতৃত্বের ব্যর্থতা। দায়ী রাজনৈতিক নেতৃত্বের অদক্ষতা। প্রায় ২০০টি অভ্যুত্থানের ঘটনা বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে (*Military Rule and Myth of Democracy*, Dhaka, UPL : 1988), সামরিক বাহিনীর প্রাতিষ্ঠানিক স্বার্থ ক্ষুণ্ন হলে, অথবা রক্ষীবাহিনী বা ফেডারেল সিকিউরিটি ফোর্সের মতো সামরিক বাহিনীর সমান্তরাল কোনো বাহিনীর জন্ম হলে, অথবা সামরিক বাহিনীর অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে রাজনৈতিক নেতৃত্বের হস্তক্ষেপ ঘটলে সামরিক বাহিনী ক্ষমতা দখলের সংকল্প গ্রহণ করে। কিন্তু ঐ পর্যন্তই। ক্ষমতা দখলের ইচ্ছা এক কথা, ক্ষমতা দখল কিন্তু সম্পূর্ণ ভিন্ন। ক্ষমতা দখল হিসেব-নিকেশ করে করা হয়। লাভ-লোকসানের মানদণ্ডে সম্পূর্ণ বিষয়টিকে মূল্যায়ন করা হয়। ক্ষেত্রটি উত্তমরূপে প্রস্তুত না হলে কোনো সময় কোথাও সামরিক অভ্যুত্থান ঘটে না। ক্ষেত্র অবশ্য তৈরি করে রাজনৈতিক নেতৃত্ব। রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের দুর্নীতি, অর্থনৈতিক অবস্থার অব্যবস্থাপনা, সন্ত্রাস ও বিশৃঙ্খলার কালো ছায়া অধিকাংশ ক্ষেত্রে বৈদেশিক চক্রান্ত–সব মিলে যখন রাজনৈতিক নেতৃত্বের জনপ্রিয়তা ভীষণভাবে হ্রাস পায়, শুধু তখনই ঘটে সামরিক অভ্যুত্থান। কোনো কোনো সময় বিরোধী দল বা দলসমূহের বা সিভিল সার্ভিসের আমন্ত্রণও সে পথকে সহজ করে তোলে। তাই দেখা যায়, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সামরিক অভ্যুত্থান হয় রক্তপাতহীন এবং বেশির ভাগ সময়ই তা সমাজের একাংশ কর্তৃক হয় অভিনন্দিত। কোনো রাজনৈতিক ব্যবস্থায় তৃতীয় শক্তির ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার বিবরণ এই লেখায় নেই। শুধু এটুকু বলব, বাংলাদেশের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে সম্প্রতি যে তৃতীয় পন্থা অথবা তৃতীয় শক্তি অথবা বিকল্প মঞ্চের কথা আলোচিত হচ্ছে এবং যাদেরকে কেন্দ্র করে এই বিতর্কের সূচনা হয়েছে সে প্রেক্ষিতে তৃতীয় শক্তির সংশ্লিষ্টতা প্রাসঙ্গিক বলে মনে হয় না, যদিও যে অনিশ্চয়তার অন্ধকারে এমন দুর্ঘটনা ঘটে থাকে তা সৃষ্টির অপপ্রয়াসে লিপ্ত রয়েছে এই সমাজের বেশকিছু ব্যক্তি। তৃতীয় শক্তির কথা, তা সত্ত্বেও, বারে বারে উচ্চারণ করা সত্য সত্যই তৃতীয় শক্তির প্রতি আমন্ত্রণের নামান্তর, যদিও গণতন্ত্রমনা ব্যক্তিবর্গ সামরিক অভ্যুত্থানকে কোনোক্রমে গ্রহণযোগ্য বিকল্প হিসেবে গ্রহণ করে না।

www.pathagar.com

[তিন]

ডা. এ কিউ এম বদরুদ্দোজা চৌধুরী অথবা ড. কামাল হোসেনের যেসব কথাবার্তা পত্রপত্রিকায় এসেছে তা তৃতীয় পন্থা বা তৃতীয় শক্তির কথা নয়। সামরিক বাহিনী ছাড়া দেশের বৃহৎ দুটি দল–বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল এবং বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ নেতানেত্রীদের বাদ দিয়ে অন্যান্য সকল বিরোধী দলের সমন্বয়ে কোনো "ঐক্যজোট" বা "যুক্তফ্রন্ট" গঠন করলেও দেশে কার্যকর কোনো তৃতীয় শক্তির জন্ম হবে বলে মনে হয় না। ১৯৯১ সালের পর থেকে যে সকল সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে সেদিকে দৃষ্টি দিন, সিদ্ধান্ত আপনার। ডা. বি চৌধুরী বা ড. কামাল হোসেনের বক্তব্যে এমন ধারার কোনো কথা নেই। প্রথমে ডা. বি চৌধুরীর কথাই বলি। তিনি একজন সজ্জন, মিষ্টভাষী, মেধাবী ব্যক্তি। বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের (বিএনপি) প্রতিষ্ঠাতাদের একজন তিনি। শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের ছিলেন ঘনিষ্ঠ সহকর্মী। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পর্যায়ে বিএনপির রাজনীতির সাথে তিনি সংশ্লিষ্ট ছিলেন অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে, বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায়। সর্বশেষে তিনি রাষ্ট্রপতির পদও অলংকৃত করেন। যেভাবে তিনি এই সম্মানজনক রাষ্ট্রপতির পদটি ছেড়ে আসেন তা তিনি পছন্দ করেননি। পছন্দ করার কথাও নয়, কেননা তিনি বিএনপির কার্যত দ্বিতীয় ব্যক্তি হওয়া সত্ত্বেও তাকে সরে আসতে হয় প্রচুর অবমাননার মধ্য দিয়ে। অনেকের মতো আমারও মনে হয়েছিল, তিনি এটিকে রাজনৈতিক জীবনের স্বাভাবিক উত্থান-পতনের মতোই গ্রহণ করে স্বেচ্ছা নির্বাসনে গেছেন। প্রায় বছরখানেক চুপচাপ থেকে, সম্ভবত রাজনীতির যে সহজাত দুর্নিবার আকর্ষণ রয়েছে তারই টানে, আবারও রাজনীতির মাঠে নেমেছেন ভিন্ন অবস্থান নিয়ে। ক্ষমতাসীন জোট সরকারের সমালোচনায় মুখর হয়ে, যদিও এই জোট সরকারকে ক্ষমতাসীন করার ক্ষেত্রে তার অবদান ছিল গুরুত্বপূর্ণ। সত্যি বটে, তিনি এই স্বেচ্ছা-নির্বাসন থেকে বেরিয়ে আসতে চাচ্ছেন রাজনীতির বৃহত্তর রঙ্গমঞ্চে, নিজেদের জন্যে সুনির্দিষ্ট "তৃতীয় মঞ্চ" বা "বিকল্প প্ল্যাটফরম" তৈরি করে। ভালো কথা, স্বাধীন দেশের রাজনৈতিক এক ব্যক্তি হিসেবে তিনি তা করতে পারেন। হয়ত দেখা যাবে তার কথিত "তৃতীয় মঞ্চ" বা "বিকল্প প্ল্যাটফরম"একদিন একটি রাজনৈতিক দল হিসেবে দেশের অসংখ্য রাজনৈতিক দলের সংখ্যা বৃদ্ধি করবে।

বর্তমানে তার ঘনিষ্ঠ সহযোগী ড. কামাল হোসেন। সুজন, সদাচারী, সৎ ব্যক্তি হিসেবে খ্যাত ড. কামাল হোসেন। ডা. বি. চৌধুরী যেমন দেশের শীর্ষস্থানীয় চিকিৎসক, ড. কামাল হোসেন তেমনি শীর্ষস্থানীয় আইনজ্ঞ এবং সাংবিধানিক আইন বিশেষজ্ঞ। স্বাধীন বাংলাদেশের সংবিধান রচনায় তিনিই অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন গণপরিষদের সদস্য হিসেবে। তিনিও বাংলাদেশের প্রাথমিক পর্যায়ের আওয়ামী লীগের একজন শীর্ষস্থানীয় নেতা হিসেবে বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করেছেন এবং ১৯৭৫ সালের আগস্ট মাস পর্যন্ত ছিলেন মন্ত্রিপরিষদের সদস্য এবং আওয়ামী লীগের গুরুত্বপূর্ণ নীতি-নির্ধারকদের অন্যতম। আশির দশকের প্রথম দিকে আওয়ামী লীগের এক সংকটকালে দলীয় ঐক্য বজায় রাখার লক্ষ্যে আওয়ামী লীগের বর্তমান সভাপতি শেখ হাসিনাকে ভারত থেকে ফিরিয়ে এনে আওয়ামী লীগের সভাপতি পদে বসানোর ক্ষেত্রেও ছিল তার বিরাট

www.pathagar.com

ভূমিকা। দলের অভ্যন্তরে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ও অন্যান্য বিষয়ে মতানৈক্য হওয়ায় তিনি দল ত্যাগ করেন। বর্তমানে তিনি গণফোরাম নামক দলটির সভাপতি। সম্প্রতি "ঐক্য প্রচেষ্টা"র প্রবক্তা।

ডা. বি. চৌধুরী এবং ড. কামাল হোসেন উভয়ই অত্যন্ত কৃতী ব্যক্তিত্ব। স্ব স্ব ক্ষেত্রে দু'জনই শীর্ষস্থানীয়। দুজনই অত্যন্ত আলোকিত। পেশাগত দিক থেকে বিশেষজ্ঞ। দুজনই বাংলাদেশের বিশিষ্ট নাগরিক। দুজনেরই অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার পরিপূর্ণ। তার পরেও অত্যন্ত বিনীতভাবে বলতে চাই, বাংলাদেশ রাজনীতির যে সমস্যা সমাধানের কথা তারা বলছেন এবং যেভাবে বলছেন, যদিও এখনো তাদের সুনির্দিষ্ট কর্মসূচি জনসমক্ষে তেমন সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়নি, তথাপি যেসব বাক্য উচ্চারিত হয়েছে, তা বাংলাদেশের রাজনীতিকে কতটুকু সুস্থ করবে? কীভাবে রাজনীতির গতিপ্রকৃতি সহজ, সরল ও স্বচ্ছ হবে? কোনো বৃহৎ দল থেকে বেরিয়ে এসে সেই সব দলকে সুস্থ রাজনীতির পাঠ কীভাবে তারা দেবেন? রাতারাতি কি তারা বাংলাদেশের রাজনীতির মূল নিয়ামক হবার প্রত্যাশা করছেন? যে "তৃতীয় মঞ্চের" কথা ডা. বি চৌধরী বলছেন অর্থাৎ বিএনপি ও আওয়ামী লীগের রাজনীতির বিকল্প হিসেবে নিজেদের উপস্থাপিত করতে চাচ্ছেন তা কতটুকু বিশ্বাসযোগ্য? যে "ঐক্যপ্রচেষ্টার" উদ্যোগে ড. কামাল হোসেন অহর্নিশ ছুটাছুটি করছেন তারই বা কি হবে? জাতীয় পর্যায়ে, বিশেষ করে গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় বা জনগুরুত্বপূর্ণ সমস্যার ক্ষেত্রে কতটুকু ঐকমত্য প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হবেন? জাতীয় পর্যায়ে অসুস্থ রাজনীতির দৌরাত্ম্যের একালে ডা. বি চৌধুরীর প্রেসক্রিপশন বা ড. কামাল হোসেনের এ্যাডভোকেসি কতটুকু কার্যকর হবে? এমনি হাজারো প্রশ্ন জনমনকে আলোড়িত করে চলেছে এই মুহূর্তে। প্রথম ও দ্বিতীয় মঞ্চে যখন নাটকের নান্দনিক মাধুর্য পরিস্ফুট হচ্ছে না তখন নাটকের বিষয়বস্তু ও কাঠামোর দিকে দৃষ্টি না দিয়ে শুধু পারিপার্শ্বিক অবস্থা পাল্টানো কি বড় হল? সত্যি বটে, দেশে গণতান্ত্রিক রাজনীতি দীর্ঘ তিন দশকেও গতিশীল হল না। এই দীর্ঘ সময়ে জনগণ স্বাভাবিক আইন-শৃঙ্খলার আশীর্বাদ লাভ করেনি। সুশাসন বলতে যা বোঝায় তা বরাবর এদেশে রয়ে গেছে প্রত্যাশিত এক সোনার হরিণের মতো। সুশাসনের অবস্থা অনেকটা হাত-পা বাঁধা করুণ চাহনির এক কোরবানীর পশুর মতো। সন্ত্রাসের উন্মত্ততায় জনজীবন বিপর্যস্ত। চাঁদাবাজি এবং পেশীশক্তির অভিশাপে জর্জরিত সমাজের সকল স্তর। সন্ত্রাসকবলিত এই জনপদে শিক্ষার অবস্থা ভালো নয়। ভালো নয় ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষকদের অবস্থা। দারিদ্র্যে জর্জরিত এই জনপদের বিরাট জনগোষ্ঠী মানবেতর জীবনযাপনে বাধ্য হয়েছে।

অর্থনৈতিক অবস্থা যেসব কারণে গতিশীল হতে পারে তাদের অধিকাংশ অনুপস্থিত। শিল্পায়নের গতি অনেকটা স্থবির। বিনিয়োগ, তা দেশী হোক আর বিদেশী হোক, দিনে দিনে হ্রাস পাচ্ছে আশঙ্কাজনকভাবে। বাড়তি জনসংখ্যার জন্যে তৈরি হচ্ছে না উপযুক্ত এবং পর্যাপ্ত কর্মসংস্থান। এসবই গভীর উদ্বেগের বিষয় এবং এসব শুধু বর্তমান সময়ের সমস্যা নয়, বাংলাদেশের জন্মের পর থেকেই এসব সমস্যা এক একটা প্রশ্নবোধক চিহ্নের মতো ফণা উদ্যত করে রয়েছে। প্রকৃত প্রস্তাবে এগুলো ব্যাধি নয়। এগুলো হল

www.pathagar.com

ব্যাধির উপসর্গ মাত্র। ব্যাধিটি হল অসুস্থ রাজনীতি। রাজনীতিকে সুস্থ করে তুলতে না পারলে, ক্ষমতার আবর্ত থেকে বের করে এনে রাজনীতিকে কল্যাণমুখী না করতে পারলে, ব্যক্তি বা দলীয় স্বার্থের ঊর্ধ্বে রাজনীতিকে টেনে তুলে গণতান্ত্রিক পরিমণ্ডলে জনস্বার্থের লক্ষ্যে আইনের দুর্গে রাজনীতিকে বন্দী না করতে পারলে, বিশেষ করে ব্যক্তি-প্রাধান্যের শ্বাসরুদ্ধকর পরিবেশ থেকে রাজনীতিকে মুক্ত করে আইনের আকাশ ছোঁয়া উদার পরিবেশে তার বৃদ্ধি ও প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত না করতে পারলে রাজনীতির স্বাভাবিক গতি কিছুতেই ফিরবে না। রাজনীতি সুস্থ হবে না কিছুতেই। জাতীয় সংসদ কিছুতেই কার্যকর হবে না। হবে না জাতীয় সমস্যাসমূহের আলোচনা-পর্যালোচনার কেন্দ্রবিন্দু। হবে না ক্ষমতাসীন ও বিরোধী দলসমূহের এক সাথে বসে সিদ্ধান্ত গ্রহণের মিলন ক্ষেত্র। প্রশাসন যন্ত্রও ক্ষমতার রাজনীতির কুপ্রভাব থেকে মুক্ত হবে না। ডা. বি চৌধুরীর বিকল্প প্ল্যাটফর্মের প্রস্তাবে এই মৌল বিষয়গুলো উপেক্ষিতই রয়েছে। প্রথম ও দ্বিতীয় প্ল্যাটফরম যখন ব্যর্থ হয়েছে, দেখি না আর একটি প্ল্যাটফরম তৈরি করে! ভাবখানা এমনি। বিকল্প প্ল্যাটফরম তৈরি করলে রোগের কোনো কোনো উপসর্গের হয়ত নিরাময় ঘটবে, কিন্তু অসুস্থ রাজনীতির সুস্থ হবার সম্ভাবনা তেমন বাড়ে না। সেটিও হয়ত রাজনীতি ক্ষেত্রে প্রাধান্য বিস্তারের জন্যে কালে ক্ষমতার রাজনীতির দিকেই ছুটবে। জনগণ এখন যেমন উপেক্ষিত রয়েছে, শুধুমাত্র ক্ষমতাসীনদের ক্ষমতা লাভের সোপান হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে, তখন তারাও জনগণকে ক্ষমতারোহণের মই হিসেবে ব্যবহার করবে।

ড. কামাল হোসেনের ঐক্যপ্রচেষ্টাই বা কতটুকু কার্যকর হবে এক্ষেত্রে? দেশের বহু বুদ্ধিজীবী জাতীয় এবং জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহে ঐকমত্যের অপরিহার্যতার কথা তুলে ধরেছেন বিভিন্ন ফোরামে, জাতীয় দৈনিকের হাজারো কলামে, বিভিন্ন মঞ্চে। কিন্তু হয়েছেটা কি? দেশের রাজনৈতিক দলসমূহের মধ্যে যে ঘন অবিশ্বাস, গভীর সন্দেহ এবং পারস্পরিক বিশ্বাসহীনতা বিদ্যমান তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ তো তেরোতম সংশোধনী আইনের সৃষ্ট নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার নিজেই। কিছুসংখ্যক মনোনীত ব্যক্তির প্রতি বরং আস্থা রাখা যায়, কিন্তু যে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরা পাঁচ বছর দেশ পরিচালনা করেছেন তাদের কিছুতেই বিশ্বাস করা যায় না। দেশের প্রধান রাজনৈতিক দলসমূহের নেতৃবৃন্দের পারস্পরিক আস্থাহীনতার মাত্রা যখন এই পর্যায়ের, তখন কীসের ঐক্য প্রচষ্টা। সেমিনার বা ওয়ার্কশপে এসব কথা বলা যায় এবং বললে তা সুধীমহলে প্রশংসিত হবে, কিন্তু যাদের জন্যে এসব কথা অর্থাৎ যারা ক্ষমতাসীন এবং যারা ক্ষমতা লাভের উদগ্র কামনায় ক্ষমতাসীনদের টেনে-হেঁচড়ে নামাতে চান তাদের নিকট এসব খুব অর্থবহ হবে বলে মনে হয় না।

২০০১ সালের ১ অক্টোবরের নির্বাচনের পূর্বে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট কার্টার ঢাকায় এসে এই দেশের দুই প্রধান দলের নেতানেত্রীর নিকট যে প্রতিশ্রুতি আদায় করেছিলেন সে সম্পর্কে সবাই আমরা অবহিত। নির্বাচনে জয় আছে। আছে পরাজয়ও। জয় সানন্দে গ্রহণ করব, কিন্তু পরাজয়? না আমাদের রাজনীতির অভিধানে পরাজয় বলে কিছু নেই। পরাজয় যদি ঘটে তাহলে বুঝতে হবে ভোট কারচুপি হয়েছে অথবা কোনো ষড়যন্ত্র

www.pathagar.com

হয়েছে। নির্বাচনে যারা জয়লাভ করলেন তারাও উদার হতে শেখেননি। আবার বিদেশীদের কথায়, "Winners take all" হয় নিয়ম। আর পরাজিতদের পবিত্র দায়িত্ব হয়ে ওঠে প্রথম দিন থেকে ক্ষমতাসীনদের ক্ষমতার দুর্গে আঘাতের পর আঘাত করে নিজেদের অস্তিত্ব প্রাণবন্ত রাখা। এই তো হয়ে আসছে দীর্ঘদিন ধরে এই পোড়ার দেশে। এই ঝোড়ো আন্দোলনে কিন্তু ক্ষমতাসীনদের তেমন ক্ষতি হয় না। ক্ষতি হয় না যারা ঝড় তোলেন তাদেরও। ক্ষতি হয় এই জাতির কাঙ্ক্ষিত আদর্শ গণতন্ত্র। ক্ষতিগ্রস্ত হয় সাধারণ মানুষ। ক্ষতিগ্রস্ত হয় এই দেশের ভাবমূর্তি। দেশের ভাবমূর্তি এমনভাবে কালিমালিপ্ত হয়ে ওঠে যে, বিদেশের কূটনীতিকরা পর্যন্ত জাতির শিক্ষক হয়ে ওঠেন। শুধু উপদেশ নয়, পরামর্শ ও নির্দেশ পর্যন্ত খয়রাত করতে থাকেন অহরহ তখন।

এই প্রেক্ষিতে ডা. বি চৌধুরী এবং ড. কামাল হোসেনের মতো সম্মানীয় ব্যক্তিত্বের নিকট আমার আবেদন, আসুন না, দেশে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে কার্যকর করার জন্যে কিছু কার্যকর পদক্ষেপের পশরা সাজিয়ে আহ্বান জানাই ক্ষমতাসীন ও বিরোধী দলসমূহের নিকট যেন দ্বি-দল ভিত্তিক [bi-partisan] বা বহুদল ভিত্তিক শাসনব্যবস্থার শুভ আশীর্বাদ জাতি লাভ করতে পারে। বহু দল ভিত্তিক bi-partisan ব্যবস্থাই কিন্তু গণতন্ত্রের আসল রূপ। সংখ্যাগরিষ্ঠ দল শাসন কার্য পরিচালনা করবে ঠিক, কিন্তু সংখ্যালঘু দলগুলোকে সাথে নিয়ে। সংখ্যালঘু দলগুলিকেও অনুধাবন করতে হবে যে, সংখ্যাগরিষ্ঠরাই তাদের মেজর পার্টনার। তাই নিজেদের স্বার্থ সংরক্ষণ করে সংখ্যাগরিষ্ঠদের লম্বা হাত প্রসারিত করার সুযোগ যেন সীমিত না হয় তাও তাদের দেখতে হবে। দু-এ মিলেই তো সরকার। বিশেষ করে গণতান্ত্রিক সরকার।

[চার]

তত্ত্ব কথা বলতে চাই না। তারপরেও বলব, গণতন্ত্র এক ধরনের ব্যবস্থা। বৈশিষ্ট্যপূর্ণ এক সমাজ ব্যবস্থা। এক ধরনের সিস্টেম (a system)। সবার আশা-আকাঙ্ক্ষা ধারণ করে গণতন্ত্র। গণতন্ত্র সবার জীবনকে স্পর্শ করে। সবার জন্যে রচনা করে এক বলিষ্ঠ জীবনবোধ। সমস্বার্থের মোহনায় সবাইকে করে সম্মিলিত। সমস্বার্থের সুষম বন্ধনে সবাইকে করে সংগ্রথিত। সাম্য, মৈত্রী ও সৌভ্রাতৃত্বের উপত্যকায় সকলকে করে সংগঠিত। এই ব্যবস্থায় সংখ্যাগুরু যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তেমনি গুরুত্বপূর্ণ সংখ্যালঘুও।

অন্যদিক থেকে গণতন্ত্র এক প্রক্রিয়াও বটে। এই প্রক্রিয়ায় ব্যক্তি স্বীকৃত হয় স্বতন্ত্র, অনন্য, এককরূপে। কারো ওপর নির্ভরশীল সে নয়। নয় কারো মুখাপেক্ষি। আপন মহিমায় সবাই ভাস্বর। তার সম্মতি ব্যতীত তাকে শাসন করার কারো অধিকার নেই। তার সম্মতি ব্যতীত তার ওপর কর ধার্য করার ক্ষমতা নেই কারো। তাছাড়া, যেকোনো নীতি নির্ধারণে এই প্রক্রিয়ায় সর্বাধিক সংখ্যক ব্যক্তির ইচ্ছা হয় প্রতিফলিত। সবার সম্মতি নিয়েই সমাজ ব্যবস্থা হয় পরিচালিত। সংখ্যাগুরু আর সংখ্যালঘু তাই একত্রে কাজ করে।

www.pathagar.com

আর এক দিক থেকে বলা যায়, গণতন্ত্র এক ধরনের নৈতিকতা। পরিশীলিত এক কর্ম প্রবাহ। রুচিকর এক যৌথ উদ্যোগ। পরিচ্ছন্ন ও সচেতন এক পদক্ষেপ। গোপনীয়তার জমাট বাঁধা অন্ধকার ছাপিয়ে গণতান্ত্রিক কার্যক্রমের সূচনা হয় সর্বসাধারণের সমক্ষে, মুক্ত আলোয়। ষড়যন্ত্রের অন্ধকার গুহা থেকে বেরিয়ে আসে সামগ্রিক কর্মকাণ্ড। বেরিয়ে আসে প্রকাশ্য দিবালোকে। সবাইকে সাথে নিয়ে চলতে হয় বলে সম-মানসিকতা প্রতিফলিত হয় রাজনৈতিক কার্যক্রমে। অন্যের দিকে তাকিয়ে সবাই নির্ধারণ করে নিজেদের পদক্ষেপ। সংযত করে রসনা। নিয়ন্ত্রণ করে নিজেদের আচার-আচরণ। আমার জন্যে যা পীড়াদায়ক অন্যের নিকট তা সুখকর হতে পারে না। আমি যা খুশি, অন্যেরও তা প্রাপ্য। যে কথা শুনে আমি কষ্ট পাই, অন্যের নিকটও তা কষ্টকর হবে। এই সত্যের ভিত্তিতে তৈরি হয়েছে গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি। এই সংস্কৃতির চর্চা ব্যতীত গণতন্ত্রের চর্চা সম্ভব নয়। গণতন্ত্রের কৌশল রুচিসম্মত। তার চর্চা হয় অবাধ ও মুক্ত পরিবেশে। নীরবে নয়, তারস্বরে। নির্জনে নয়, জনারণ্যে। সুতরাং একটি রাজনৈতিক ব্যবস্থা হিসেবে গণতন্ত্র হল উন্নত জীবনের প্রতিশ্রুতি। সুরুচির প্রতীক। স্বাচ্ছন্দ্য ও স্বাতন্ত্র্যের প্রতিচ্ছবি। সাম্য, মৈত্রী ও সৌভ্রাতৃত্বের নিশ্চিত নীড়। প্রক্রিয়া হিসেবে গণতন্ত্র হল সহযোগিতার সূত্র। আস্থা ও বিশ্বাসের অন্তরঙ্গ সুর। সমঝোতার ক্ষেত্র। মুক্তবুদ্ধির বিস্তীর্ণ অঙ্গন। এদিক থেকে গণতন্ত্র যেমন উপায়, তেমনি উপেয়। সমাজ জীবনের যেমন লক্ষ্য, তেমনি মাধ্যমও। গন্তব্য ও পথ দুইই।

সফল গণতন্ত্রের কটি অঙ্গীকার রয়েছে। **এক.** গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সরকার যে ক্ষমতা প্রয়োগ করে তা জনগণের ক্ষমতা। সরকার আমানত হিসেবে সেই ক্ষমতা ধারণ করে প্রয়োগ করে রাজনৈতিক সমাজের অনুমোদিত পন্থায়, ঐকমত্যের ভিত্তিতে। সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনে ব্যর্থ হলে অথবা সমাজ কর্তৃক অনুমোদিত পন্থা অনুসরণে ব্যর্থ হলে সরকার ক্ষমতাচ্যুত হয়। গণতান্ত্রিক এই সত্য স্বীকৃত হতে হবে। **দুই.** গণতন্ত্রে ব্যক্তি প্রাধান্যের পরিবর্তে প্রতিষ্ঠিত হয় আইনের প্রাধান্য। প্রতিষ্ঠিত হয় আইনের রাজত্ব। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় আইন সর্বজনীন। আইনের প্রতি আনুগত্য কোনো ব্যক্তির প্রতি নয়, তা তিনি যতই প্রভাবশালী হোন না কেন অথবা যত উঁচু পদে অধিষ্ঠিত থাকুন না কেন। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার আর একটি অঙ্গীকার। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় আইন মেনে চলতে হবে, যদিও তা খারাপ আইন হয়ে থাকে। আইন প্রণয়ন করেন জনপ্রতিনিধিরা। আইন পরিবর্তনও করেন তারা। গণতন্ত্রে সবাই আইন মেনে চলে। মন্দ আইন হলে তা পরিবর্তিত হয় কিন্তু যত দিন তা পরিবর্তিত না হচ্ছে ততদিন তা মানতেই হবে। **তিন.** গণতন্ত্রের পরিবেশ সম্পূর্ণ ভিন্ন। এখানে জোরের যুক্তির পরিবর্তে যুক্তির জোর কার্যকর হয়। সামাজিক বন্ধন সুদৃঢ় হয় সমঝোতা ও বিশ্বাসের ভিত্তিতে।

সুষ্ঠু গণতন্ত্রের জন্যে যেমন প্রয়োজন গণতান্ত্রিক কাঠামো, তেমনি প্রয়োজন গণতান্ত্রিক মন। প্রয়োজন কাঠামোর সর্বস্তরে স্পন্দিত অন্তঃকরণ। কাঠামোকে সিক্ত করার জন্যে গণতান্ত্রিক চেতনার ঘন আস্তরণ। গণতান্ত্রিক সমাজ গঠনে দুইই অপরিহার্য। কাঠামো সৃষ্টি করে নৈতিক এক পরিমণ্ডল। রচনা করে গণতান্ত্রিক সমাজের প্রাথমিক পর্যায়। কিন্তু গণতান্ত্রিক কাঠামোয় গণতান্ত্রিক মনের প্রসার ঘটানো, কাঠামোকে প্রাণোচ্ছল

www.pathagar.com

করাই চূড়ান্ত পর্ব। চূড়ান্ত পর্বেই গণতান্ত্রিক সমাজের সূচনা হয়। সমাজ জীবনে এর চেয়ে বড়ো প্রাপ্তি আর নেই।

গণতান্ত্রিক সমাজ গঠিত হয় না এক বছরে। হয় না এক যুগেও। যুগ যুগ ধরে জলধারায় সঞ্চিত পলি যেমন গড়ে তোলে স্বর্ণদ্বীপ, গণতান্ত্রিক সমাজও গড়ে ওঠে যুগ যুগ ধরে অর্জিত সাফল্যে ও গণতন্ত্র চর্চার উজ্জ্বল ঐতিহ্যে, সহযোগিতা ও মিলনের গৌরবময় কর্মকাণ্ডে। গণতান্ত্রিক কাঠামো ও গণতান্ত্রিক কর্মকাণ্ডের যে চারাটি আজ রোপিত হল তা ফুলে ফলে ভরে উঠবে বহুদিন পরে, যদি তা হৃদয়বান এক মালির সেবা লাভ করে। মালি তার মনের সবটুকু রঙ মিশিয়ে ক্ষেত্র প্রস্তুত করবে। আশপাশ থেকে আগাছা দূর করবে। গাছটির অপ্রয়োজনীয় ডালপালা ছেঁটে দেবে এবং সুনির্দিষ্ট উচ্চতার জন্যে অধীর আগ্রহে দিন গুনবে। ফুলে-ফলে গাছটি হেসে উঠলে মালি বিজয়ীর হাসি হাসবে। তবে মালির বিজয় কতটুকু হল তা বড় কথা নয়, বড় কথা–এটি একটি সামাজিক অর্জন। একটি প্রতিষ্ঠা। একটি গৌরবময় সামাজিক সৃষ্টি। তার ফুলে ফুলে সৌরভ। ফলে ফলে সেবার সামগ্রী। ডালপালার ছায়ায় সবার প্রশান্তি। সামাজিক স্থিতিশীলতা, রাজনৈতিক অগ্রগতি, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য এভাবেই নিশ্চিত হয়।

[পাঁচ]

বাংলাদেশে কিন্তু গণতন্ত্রের বেহাল অবস্থা। এজন্যে দায়ী অসুস্থ রাজনীতি। গণতন্ত্রকে গতিশীল করতে হলে রাজনীতিকে কল্যাণমুখী করা প্রয়োজন সর্বাগ্রে। প্রয়োজন রাজনীতিকে ক্ষমতার-রাজনীতির পুঁতি গন্ধময় গহ্বর থেকে উদ্ধার করা। প্রয়োজন ব্যক্তি-প্রাধান্যের নিগড় থেকে মুক্ত করে আইনের রাজত্বে ফিরিয়ে আনা। রাজনীতি একবার তার সনাতন বিশুদ্ধ রূপ ফিরে পেলে আজকে সমাজ জীবন যে ঝোড়ো হাওয়ার কবলে পড়ে অহর্নিশ ছটফট করছে তা থেকে অব্যাহতি পাবে। সন্ত্রাসের কবল থেকে মুক্তি লাভ করবে। সংঘাতময় পরিবেশের অবসান ঘটবে। শুচিতা ফিরে আসবে। যুক্তিবুদ্ধির প্রভাব বৃদ্ধি পাবে। জনগণ আবারো হয়ে উঠবে শাসন-প্রশাসনের প্রধান নিয়ামক।

এই অবস্থা আপনা আপনি আসবে না। এজন্যে প্রয়োজন সচেতন উদ্যোগ। সমাজের বুদ্ধিজীবী, সংস্কৃতিসেবী-জ্ঞানী-গুণী ও সচেতন অংশের সচেতন উদ্যোগ। এই উদ্যোগ দুই খাতে প্রবাহিত হতে হবে। **এক.** রাজনৈতিক ব্যবস্থার কাঠামোগত পরিবর্তন সাধনে উদ্যোগী হতে হবে। **দুই.** যারা রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে সংশ্লিষ্ট রয়েছেন তাদের ওরিয়েটেশন বা মন-মানসিকতায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনতে হবে। বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার কাঠামো রচিত হয়েছে বটে, কিন্তু সেই কাঠামোয় বিরোধী দলগুলির সম্পৃক্ততার তেমন সুযোগ এখনো সৃষ্টি হয়নি। উন্নত গণতান্ত্রিক সমাজে গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি সেই শূন্যস্থান পূরণ করে। আমাদের দেশে বিধিবিধানের মাধ্যমে তা সম্পূর্ণ করতে হবে। জাতীয় সংসদ কার্যকর হচ্ছে না তার অন্যতম প্রধান অভিযোগ হল মাননীয় স্পীকার নিরপেক্ষ নন। ফলে বিরোধী দলের সদস্যগণ কথা বলার তেমন

www.pathagar.com

সুযোগ পান না। অধিকাংশ সময় তারা উপেক্ষিত হন। এই অভিযোগ যে সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন তাও নয়। সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের মনোনীত প্রার্থী একদিকে দলীয় আনুগত্য অক্ষুণ্ন রেখে, পরবর্তী নির্বাচনে যে নির্বাচিত হয়ে আসতে পারেন তা দৃষ্টিতে রেখে, পুরোপুরি নিরপেক্ষ হনই বা কীভাবে? সুতরাং তাকে নিরপেক্ষ রাখতে হলে পরবর্তী নির্বাচন সম্পর্কে যেমন তাকে ভাবনাহীন রাখতে হবে, তেমনি সংসদে ভারসাম্য রক্ষা করার জন্যে বিরোধী দলগুলি থেকে একজন ডেপুটি স্পীকার নির্বাচন করাও যুক্তিযুক্ত। তা হলে সংসদের কার্যক্রমে বিরোধী দলেরও একটা স্টেক সৃষ্টি হয়। তাছাড়া, সংসদের যেসব স্থায়ী কমিটি রয়েছে সেগুলির সদস্য এবং সভাপতি নিয়োগ সম্পর্কেও সংখ্যানুপাতে নিয়োগ দানের সুস্পষ্ট বিধান অপরিহার্য। এসব ক্ষেত্রে সংসদ বিধি প্রণয়ন করলে এই মুহূর্তে না হোক অদূর ভবিষ্যতে জাতীয় সংসদ কার্যকর হতে পারে বলে আমার বিশ্বাস। ড. কামাল হোসেন এই অন্ধকার ক্ষেত্রটিকে কীভাবে আলোকিত করা যায় ভাববেন কি?

দেশের প্রধানমন্ত্রী অথবা সাবেক প্রধানমন্ত্রী দলীয় নেতা হিসেবেই ক্ষমতাসীন হয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী হবার পরেও কিন্তু তারা দলের শীর্ষপদটি ত্যাগ করেননি। উন্নত গণতান্ত্রিক সমাজে কিন্তু প্রক্রিয়াটি ভিন্ন। দল থাকে দলের অবস্থানে আর সরকার তার ভিন্ন অবস্থানে। দলীয় কর্মসূচি আর সরকারের কর্মসূচির মধ্যে যে পার্থক্য তা ক্রমে ক্রমে নিশ্চিহ্ন হয় তা সঠিক নয়। দলীয় নেতৃত্ব দলের জন্যে কাজ করবে, কিন্তু সরকার কাজ করবে সবার জন্যে। বাংলাদেশের রাজনৈতিক সমাজে এই পার্থক্য সুস্পষ্ট হওয়া উচিত এবং অবিলম্বে। জাতীয় পর্যায়ে ঐকমত্য সৃষ্টি অথবা জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহে জাতীয়ভিত্তিক সহমত প্রতিষ্ঠা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সাফল্যের যেমন পূর্বশর্ত, ঠিক তেমনি রাজনৈতিক অগ্রগতিরও পরিচায়ক। কিন্তু কীভাবে তা সম্ভব? বক্তব্য-বিবৃতির মাধ্যমে যে সম্ভব নয় তা প্রমাণিত। সেই সংস্কৃতি এদেশে জোরদার হয়নি। তবে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, আইন-শৃঙ্খলা, পররাষ্ট্রীয় ও জাতীয় নিরাপত্তা প্রমুখ বিষয়ে উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করে এবং ঐসব পরিষদে সংখ্যানুপাতে বিরোধী দল থেকে নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের সংশ্লিষ্ট করে ঐসব বিষয়ে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেয়া যেতে পারে। উল্লেখ যে, পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি চুক্তি সম্পাদনের ক্ষেত্রে এমন ব্যবস্থা থাকলে আজকে যেসব সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে এ জাতি তা থেকে অব্যাহতি পেতে পারত।

ক্ষমতার বিষক্রিয়া রয়েছে এবং চূড়ান্ত ক্ষমতার বিষক্রিয়া মারাত্মক। লর্ড এ্যাকটন (Lord Acton) তাই বলেছেন, গণতন্ত্র কিন্তু সীমিত ক্ষমতার এক ব্যবস্থা। একদিকে জনগণের অধিকার, অন্যদিকে জনগণের নিকট সরকারের দায়িত্বশীলতা এবং সরকার কর্তৃক গৃহীত নীতি ও কর্মসূচির স্বচ্ছতা, বিশেষ করে বিরোধী দলসমূহের ওয়াচডগ ভূমিকা–সব মিলে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সরকারের ক্ষমতা সীমিত হয়ে আসে। এদেশে কিন্তু সরকার হল সর্বক্ষেত্রে দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। পরম পরাক্রমশালী শক্তিধর। এর কারণ বাংলাদেশের সরকারি ব্যবস্থাপনায় নেই কোনো চেক (check), নেই কোনো ব্যালান্স। ডা: বি চৌধুরী তার প্রস্তাবিত একাধিক উপ-প্রধানমন্ত্রী ও একাধিক উপ-

www.pathagar.com

রাষ্ট্রপতির পরিবর্তে যদি এ ধরনের check and balance এর কথা ভেবে ভারসাম্যের সরকারি ব্যবস্থাপনার কথা বলতেন তা হলে দেশের অনেক উপকার হত। যেসব প্রস্তাব উত্থাপিত হয়েছে তা দৃষ্টান্তমূলক। এই তালিকা দীর্ঘ করা যায়। এসব বিষয়ে ভেবে-চিন্তে সরকারের কাঠামো সুসমন্বিত করা যেতে পারে এবং এক্ষেত্রে ডা: বি চৌধুরী ও ড. কামাল হোসেন যদি অবদান রাখতে পারেন তাহলে উন্নত মানব সম্পদের এই দেশে অগ্রগতির ধারা প্রবহমান হতে বাধ্য। দরকার কিন্তু মঞ্চ বদলের নয়, দরকার হল রাষ্ট্রীয় জাহাজটিকে সচল করে, গতিশীল করে, শত সম্ভাবনার সমুদ্রে ভাসিয়ে দেয়া। কিন্তু আপনারা প্রথম বা দ্বিতীয় মঞ্চের প্রতিদ্বন্দ্বী হবেন কেন? গণতন্ত্রে প্রতিযোগিতা রয়েছে। নেই কিন্তু তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা। নেই বৈরিতার কোনো স্থান। তাই বলি, সহযোগী হিসেবে আসুন। কার প্রতিদ্বন্দ্বী হবেন আপনারা? আপনাদের অভিজ্ঞতা, প্রজ্ঞা দেশের কাজে লাগুক। সবার বান্ধব হয়ে থাকুন। হোন জাতীয় পর্যায়ের উপদেষ্টা। হোন জাতীয় স্বার্থের অভিভাবক।

www.pathagar.com

জাতীয় নেতৃত্বের কঠিন পরীক্ষা

দেশের প্রধান বিরোধী দল আওয়ামী লীগের পূর্ব নির্ধারিত মিছিলে ২১ আগস্টে বিরোধী দলের নেতৃবৃন্দের ওপর গ্রেনেড হামলা শুধুমাত্র কিছুসংখ্যক অমূল্য প্রাণ কেড়ে নিয়েছে তাই নয়, দেশের রাজনীতিকে কলঙ্কিত করেছে। জাতীয় পর্যায়ে নেতানেত্রীর মধ্যে বিদ্যমান পারস্পরিক অবিশ্বাসকে আরও গাঢ় করেছে। দেশে ১৯৯১ সাল থেকে নতুনভাবে প্রবর্তিত সংসদীয় গণতন্ত্রের ধীর পদে চলার গতিকে স্তব্ধ করেছে। এমনকি দেশের নিরাপত্তা এবং সার্বভৌম সত্তার প্রতিও বিরাট হুমকি হয়ে দেখা দিয়েছে। এমন সঙ্কটে বাংলাদেশকে পড়তে হয়েছিল শুধু একবারই এবং তা ছিল ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট থেকে ৭ নভেম্বরব্যাপী সময়কালে। তারপর বাংলাদেশ এমন সঙ্কটে আর পড়েনি। তখন শুধু যে সরকার ব্যবস্থা বিধ্বস্ত হয়েছিল তাই নয়, শাসন-প্রশাসনের সব কাঠামো দুমড়ে-মুচড়ে গিয়েছিল। নতুনভাবে গড়ে তুলতে হয়েছিল সবকিছু। তখনকার সুবিধা ছিল আদর্শিক অঙ্গীকারের ভিত্তিতে দুই পরাশক্তিকেন্দ্রিক দ্বিধাবিভক্ত বিশ্বব্যবস্থা। আজকে বিশ্ব রাজনীতির কাঠামো পাল্টেছে। দুই পরাশক্তির পরিবর্তে একমাত্র পরাশক্তি যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে বিশ্ব এখন এককেন্দ্রিক বিশ্বে রূপান্তরিত হয়েছে। বাজারভিত্তিক অর্থনীতির অবাধ গতির ফলে বিশ্বায়নের শত বাতায়ন উন্মুক্ত হয়েছে। তথ্যপ্রবাহের অভাবিত অগ্রগতির ফলে সবকিছু সবার কাছে উন্মুক্ত হয়েছে। ষড়যন্ত্রের শত পথও খুলে গেছে। আঞ্চলিক ক্ষমতার কেন্দ্রগুলোও (Regional Power Centres) এককেন্দ্রিক শক্তিস্তম্ভের সঙ্গে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা পড়েছে। এমন পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের মতো দুর্বল একটি রাষ্ট্রে ঘটে চলেছে একটার পরে একটা গ্রেনেড-বোমা হামলার মতো দুর্ঘটনা।

রাষ্ট্র হিসেবে দুর্বল বা প্রান্তিক হলেও বাংলাদেশের কৌশলগত অবস্থান কিন্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ–ভারত মহাসাগরের উপকণ্ঠে বঙ্গোপসাগরের উপকূলে, অর্থনৈতিক দিক থেকে বিরাট সম্ভাবনার দক্ষিণ এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও পূর্ব এশিয়ার মাঝখানে। এই স্থানটির ওপর অনেকের প্রলুব্ধ দৃষ্টি রয়েছে। আমরাই শুধু বসে রয়েছি চোখ বন্ধ করে। অনুধাবনে ব্যর্থ হয়েছি রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের কৌশলগত অবস্থানের গুরুত্ব। ব্যর্থ হচ্ছি এই গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানের ফায়দা তুলে জাতীয় অগ্রগতির ধারাকে অগ্রসরমান করতে। ১৯৯১ সালে বাংলাদেশে যখন নতুনভাবে সংসদীয় গণতন্ত্রের যাত্রা শুরু হয়; দীর্ঘ ষোল বছর পরে, তখন এদেশের অধিকাংশ জনসমষ্টি আশায় বুক বেঁধেছিলেন। প্রত্যাশা দৃঢ় হয়েছিল শুধুমাত্র সংসদীয় গণতন্ত্রের পুনঃপ্রবর্তনে নয়, যে প্রক্রিয়া ও উষ্ণ সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে দেশের দুটি প্রধান রাজনৈতিক দলের শীর্ষপর্যায়ের নেতৃবৃন্দ একই প্লাটফরমে দাঁড়িয়ে, ঐকমত্যের ঘন আস্তরণের মধ্য দিয়ে, বিশেষ করে দুই শীর্ষ নেতার আশীর্বাদ মাথায় নিয়ে সেই ঐতিহাসিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেন তাও ছিল

www.pathagar.com

ঐতিহাসিক। একবার পথভোলা মানুষ সঠিক পথের সন্ধান পেলে সে যেমন চলার পথে সব ল্যান্ডমার্ক (landmark) সব সময় স্মরণে রেখে পথ চলে, ১৯৯১ সালের পরে সবার প্রত্যাশা ছিল বাংলাদেশের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ সংসদীয় গণতন্ত্রের পথের সব ল্যান্ডমার্ক স্মরণে রাখবেন। অন্য কথায়, সংখ্যাগরিষ্ঠ দল শাসন-প্রশাসন পরিচালনা করবে বটে, সংখ্যালঘু দলগুলোর স্বার্থও তাতে প্রতিফলিত হবে। সংখ্যালঘুর এই অধিকার সংরক্ষণ হয়ে উঠবে সংখ্যাগুরুর দায়িত্ব। সামগ্রিকভাবে জাতীয় রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপে প্রতিফলিত হয়ে উঠবে জোরের যুক্তির পরিবর্তে যুক্তির জোর। পরিবেশ হয়ে উঠবে সহযোগিতার, সমঝোতার, পারস্পরিক বিশ্বাসের। সংখ্যালঘু এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ দলগুলোর সমন্বয়েই সরকারি কার্যক্রম বিন্যস্ত হবে। প্রধানমন্ত্রীর হাতে যেমন থাকবে রাষ্ট্রীয় জাহাজের হালটি, সংসদে বিরোধীদলীয় নেতার হাতে থাকবে প্রধান দাঁড়টি। সঙ্কটকালে দু'জনে মিলেই জাহাজটির গতি এবং গতিপথ নির্ধারণ করবেন।

এ জাতির দুর্ভাগ্য, পথভোলা রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ সঠিক পথের সন্ধান পেয়েও ভুলে গেছেন পথের চারপাশে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা পথ নির্দেশসমূহ। হারিয়ে ফেলেছেন সবকিছু নিজেদের আত্মম্ভরিতা, সবজান্তার অরুচিকর মানসিকতা এবং জমাটবাঁধা পারস্পরিক অবিশ্বাসের ঘন অন্ধকারে। চলা শুরু করেছেন দ্বিধা ও সন্দেহের সর্পিল পথে। বারবার হোঁচট খাচ্ছেন পরস্পরের প্রতি তীব্র ঘৃণার শিলা খণ্ডে। ব্যথা তারা পাচ্ছেন বটে; কিন্তু অহমবোধে উদ্দীপ্ত আমাদের রাজনীতিকরা তারপরও শিষ্য-সাগরেদের উচ্চকণ্ঠে বলে চলেছেন–সব ঠিক আছে। এটাই সঠিক পথ। অন্তরাত্মার সায় না পেলেও এবং নিজেরা জনরায়ে নির্বাচিত হয়েও ভিন্ন দলের নির্বাচিত নেতাদের প্রতি এতটুকু আস্থা রাখেন না। নির্বাচনকে তারা শুধুমাত্র জয়লাভের মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করতে শিখেছেন। পরাভব মানার উদারতা তাদের আয়ত্তে আসেনি। সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনী আইন আমাদের রাজনীতিকদের পারস্পরিক অবিশ্বাসের ফল। রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের পারস্পরিক অবিশ্বাস, নির্বাচনে হার না মানার উষ্ণ মনোভাব, রাজনীতিকে শুধুমাত্র ক্ষমতা লাভ এবং ক্ষমতাপ্রসূত সুযোগ-সুবিধা আদায়ের মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করার মানসিকতা, অসহিষ্ণুতা এবং সবকিছুকে গ্রাস করার দৃষ্টিভঙ্গি এভাবে বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিমণ্ডলকে করে তুলেছে এক ধরনের প্রাণহীন শুষ্ক মরুভূমি।

এই মরুভূমিতে ফলে না সোনালি ফসল। জন্মে শুধু কণ্টকময় ক্যাকটাস। এই মরুভূমিতে হিংসা-প্রতিহিংসার বিষবৃক্ষের বৃদ্ধি হয় অতি দ্রুত, সৃজনশীলতা হয় পরাভূত। এই মরুভূমিতে ঘৃণা রাজত্ব করে। সহযোগিতা, সহমর্মিতা এবং সমবেদনার কোনো মরূদ্যান রচিত হয় না। ক্ষমতা প্রদর্শন এবং দুর্নীতির অবাধ বিস্তার ঘটে এই মরুভূমিতে। যুক্তি, সুনীতি, সুরুচি এবং কল্যাণ চিন্তা হয় নির্বাসিত। সবচেয়ে মারাত্মক–এ মরুভূমিতে দৈত্যের মতো বেড়ে ওঠে ষড়যন্ত্র। এই ষড়যন্ত্র একদিকে যেমন হতে পারে ব্যক্তির বিরুদ্ধে, তেমনি হতে পারে কোনো দলের বিরুদ্ধে। এমনকি জাতীয় স্বার্থের বিরুদ্ধেও। ষড়যন্ত্রের নায়ক হতে পারে অভ্যন্তরীণ কোনো কুচক্রী গ্রুপ।

www.pathagar.com

হতে পারে বাংলাদেশের বাইরেরও কোনো মহল, যারা এদেশের ভাবমূর্তি ম্লান হলে খুশি হয় অথবা বাংলাদেশ অস্থিতিশীল হলে খুশি হয়।

২১ আগস্টে সংঘটিত দুর্ঘটনা সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দেবে তদন্ত কমিটির ফাইন্ডিংস। ২১ আগস্টের গ্রেনেড হামলাকে এক ষড়যন্ত্ররূপে চিহ্নিত করা যায় এ কারণে যে, এটি কোনো দলের তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া নয়, বরং পূর্ব পরিকল্পিত। দুর্ঘটনাটি ঘটানো হয়েছে এমন মারণাস্ত্র দিয়ে যা বাজারে প্রাপ্ত আর দশটা পণ্যের মতো সহজলভ্যও নয়। তেমন সস্তাও নয়। দুর্ঘটনার পরিবেশ এমনভাবে তৈরি করা হয়েছে, এই নারকীয় নাশকতামূলক কর্মে পারদর্শী দস্যুরা হাজার হাজার লোকের চোখে ধুলো দিয়ে আত্মগোপনে সক্ষম হয়েছে। তাছাড়া এই দুর্ঘটনা কোনো বিচ্ছিন্ন কিছু নয়। এর এক দীর্ঘ ধারাবাহিকতা রয়েছে। শুধু তাই নয়, এমনি দুর্ঘটনার আবরণ হিসেবে আজকের বিশ্বে অধুনা ব্যাখ্যাত কিছু তাত্ত্বিক খোলস এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট রয়েছে। 'সন্ত্রাসী রাষ্ট্র', 'ব্যর্থ রাষ্ট্র', 'অকার্যকার রাষ্ট্র', 'সমস্যাসঙ্কুল রাষ্ট্র'– এমনি ধরনের তত্ত্বগত কথামালার সঙ্গে সাযুজ্য রেখে বাংলাদেশে শুরু হয়েছে জীবননিবিনাশী বোমা-গ্রেনেড হামলার অধ্যায় ১৯৯৯ সালের ৬ মার্চ থেকে। হামলা সংঘটিত হয়েছে মসজিদে, গির্জায়, মাজারে। সংঘটিত হয়েছে বিনোদনমূলক অনুষ্ঠানে। রাজনীতির মূল চত্বরে। প্রত্যন্ত গ্রামে। জেলা শহরে। খোদ রাজধানী ঢাকার কেন্দ্রস্থলে–রমনার বটমূলে, পল্টন ময়দানে। ২১ আগস্টে তেমনি বীভৎস ঘটনা ঘটে দেশের প্রধান বিরোধী দল আওয়ামী লীগের প্রধান কার্যালয়ের অঙ্গনে।

কিছু সংখ্যক কুচক্রীর মাধ্যমে যখনই এ ধরনের নারকীয় দুর্ঘটনা ঘটেছে এর প্রতিক্রিয়াস্বরূপ শুধু ঘটনাস্থলেই নয়, দেশব্যাপী ধর্মঘট, হরতাল, বিক্ষোভ মিছিল আর ভাঙচুর, সম্পদ ধ্বংসকরণ–সব মিলিয়ে এক ধ্বংসযজ্ঞ যা দুর্বল অর্থনীতির এদেশের পক্ষে বহন করা প্রায় অসম্ভব। যখন থেকে এদেশে এসব বীভৎস ঘটনার সূত্রপাত তার কিছুদিন পর থেকেই শুধু আন্তর্জাতিক পর্যায়েই নয়, দেশের ভেতরেও শুরু হয়েছে এক ধরনের প্রচারণা। ২০০২ সালের মাঝামাঝি হংকং থেকে প্রকাশিত Far Eastern Economic Review পত্রিকার প্রচ্ছদ কাহিনীর ওপর চোখ বুলান এবং বার্টিল লিন্টনারের সেই হেডলাইনে- 'Beware of Bangladesh : A Cocoon of Temor' - দৃষ্টি দিন সেই ধারাবাহিকতায় ব্রিটেনের চ্যানেল ফোর (Channel Four) এবং দিল্লি থেকে প্রকাশিত Time Magazine-এ Alex Perry কর্তৃক লিখিত প্রতিবেদনের হেডলাইনে- MV Mecca জাহাজে আলকায়দার Deadly Cargo'-এর চট্টগ্রামে অবতরণ এবং সাম্প্রতিককালে Time Megazine-এ লিখিত জনৈক আদিত্যের বাংলাদেশকে Dysfunctional বা অকার্যকর রাষ্ট্ররূপে চিহ্নিত করার অপপ্রয়াসে, দেখবেন, সবকিছুতে জড়িয়ে রয়েছে বাংলাদেশের এক ভীষণ ছবি। এই ছবি স্যামুয়েল হান্টিংটনের 'যুদ্ধংদেহী ইসলামের' (Militant Islam) ছবি, যার বিরুদ্ধে পাশ্চাত্যের বর্তমান মুখপাত্র জর্জ ডব্লিউ বুশের সূচনা করা ক্রুসেড, অতীতের সেই ক্রুসেড (crusade) যেন। এসব ঘটনা আবেগ দিয়ে অনুভব না করে যুক্তি-বুদ্ধি দিয়ে অনুধাবন করা প্রয়োজন এবং প্রয়োজন যে বাংলাদেশ অযুতপ্রাণের বিনিময়ে

www.pathagar.com

মুক্তিযুদ্ধের রক্তাক্ত প্রান্তরে জন্ম লাভ করেছে তার আধ্যাত্মিক সত্তাকে সবার ওপরে স্থান দিয়ে দেশের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের এবং রাজনীতি সচেতন জনসমষ্টির সহায়তায় সেই কুচক্রী মহলের মুখোশ উন্মোচন করা।

বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা বেঁচে গেছেন। সৌভাগ্য তার দলের। সৌভাগ্য সমগ্র জাতির। এমন ভয়ঙ্কর ষড়যন্ত্রের কবল থেকে জাতি অব্যাহতি লাভ করেছে সাময়িকভাবে; কিন্তু এর ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া দেশব্যাপী যে অস্থিরতার জন্ম দিয়েছে তা মারাত্মক। এই অবস্থায় দেশের জন্য প্রয়োজন দূরদর্শী এবং সৃজনশীল নেতৃত্ব। প্রয়োজন এমন এক নেতৃত্ব যে চারপাশে ছড়িয়ে থাকা বিষের ভাণ্ডার থেকে সবটুকু পান করে নিজে নীলকণ্ঠ হয়ে জনগণকে বলতে পারে–বাংলাদেশ চলবে মাথা উঁচু করে, সহজ, সরল পথে। বাংলাদেশের গণতন্ত্র চিরঞ্জীব। এমনই পরিস্থিতিতে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিংকন ১৯৬৩ সালের ১৯ নভেম্বরে সদর্পে ঘোষণা করেছিলেন–'এই জাতি, ঈশ্বরের কৃপায়, স্বাধীনতার মন্ত্রপূত হয়ে নতুন জন্মলাভ করবে এবং জনগণের সরকার, জনগণ কর্তৃক পরিচালিত সরকার ও জনকল্যাণে নিয়োজিত সরকার বিশ্ব থেকে মুছে যাবে না।' [That this nation, under God, shall have a new birth of freedom, and that government of the people, by the people, for the people, shall not perish from the earth.]

আমাদের আব্রাহাম লিংকন নেই। কিন্তু আছে সব সংগ্রামে বিজয় মুকুটদারী সংগ্রামী জনতা। বাংলাদেশে ক্ষমতাসীনরা, বিরোধী দলের দেশপ্রেমিকরা এবং দেশের রাজনীতি সচেতনরা একবার যদি একই প্ল্যাটফরম থেকে গর্জে ওঠেন, তাহলে ষড়যন্ত্রকারীরা, তা যতই শক্তিশালী হোক তারা, শেকড় তাদের যতই গভীরে প্রোথিত থাকুক না কেন, বাংলাদেশের এই 'দুর্জয় ঘাটি' থেকে পালানোর পথ পাবে না। তাই বলি, এ সময়ে এ জাতির জন্য সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন জাতীয় ঐক্যের। প্রয়োজন জাতীয় সমস্যা সমাধানকল্পে জাতীয় নেতৃবৃন্দের সমঝোতা। প্রয়োজন আত্মসমালোচনা ও আত্মোপলব্ধির। এ সঙ্কট থেকে উত্তরণের জন্য প্রয়োজন যুক্তিবাদিতার। পারবেন কি আমাদের নেতৃবৃন্দ জাতীয় স্বার্থ সংরক্ষণে কঠিনতম সিদ্ধান্তে উপনীত হতে?

www.pathagar.com

বাংলাদেশের প্রয়োজন এক বুদ্ধিবৃত্তিক আন্দোলন

বাংলাদেশের রাজনৈতিক চত্বর সব সময় এত উত্তপ্ত কেন? এখানে যুক্তির পরিবর্তে আবেগের প্রাচুর্য কেন এত বেশি? যারা প্রতিনিয়ত রাজনীতির মাঠ গরম করে রাখছেন, কেন তারা এত সংকীর্ণমনা? এসব প্রশ্নের উত্তর কি কারো জানা আছে? স্বাধীনতার তিন দশক পরেও বাংলাদেশ রাজনীতি লাভ করল না এতটুকু স্থৈর্য্য। এতটুকু স্থিতিশীলতা। বিন্দুমাত্র সৃজনশীলতা। এভাবে চলতে থাকলে এদেশের বেহাল অর্থনীতির কি হবে? কোন অবস্থায় পৌঁছুবে নাগরিকদের জীবনযাত্রার মান? মুক্তিযুদ্ধে প্রাণ পাওয়া বাংলাদেশ কোন পর্যায়ে উপনীত হবে? জনগণের প্রাত্যহিক জীবন কি এভাবেই অনিশ্চয়তার অন্ধকারে নিমজ্জিত থাকবে?

একটি দেশের অবস্থা আর একটি জনপদের অবস্থার সাথে তুলনা করা শুধু কঠিন নয়, পুরোপুরি সঠিকও নয়। তা জেনেও, কিছুটা বাস্তব ধারণার লক্ষ্যে আজকের বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে ১৮৬১-৬৪ সময়কালীন গৃহযুদ্ধের পরবর্তী পর্যায়ে আমেরিকার রাজনৈতিক অবস্থার সাথে তুলনা করা যেতে পারে। ঐ সময়ের আমেরিকার পরিস্থিতিকে ঠাট্টা করে বলা হত 'সোনালি যুগ' ('Gilded Age')। এই নামটি গৃহীত হয় ১৯৭৩ সালে প্রকাশিত মার্ক টোয়েনের একটি উপন্যাসের শিরোনামের অনুকরণে। আজকের বাংলাদেশ যেমন বছরের পর বছর ধরে দুর্নীতি ক্ষেত্রে সমগ্র বিশ্বে শীর্ষস্থানের অধিকারী হচ্ছে, সেই 'সোনালি যুগে'ও আমেরিকা দুর্নীতি ক্ষেত্রে ছিল শীর্ষস্থানীয়। মার্ক টোয়েনের কাহিনীতে এমনি বিবরণ রয়েছে। কংগ্রেসের সদস্যবৃন্দ অর্থের বিনিময়ে নিজেদের প্রভাব বিক্রয় করতেন। অর্থের বিনিময়ে রেলপথ নির্মাতাদের কনট্রাক্ট দিতেন। দিতেন অর্থের বিনিময়ে বিভিন্ন সংস্থায় চাকুরি ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা। Credit Mobilier Scandal-এর মতো ঘটনা এরই সাক্ষী। শুধু তাই নয়, সেই 'সোনালি যুগে'র রাজনীতিও ছিল তীব্রভাবে দলীয়। গৃহযুদ্ধের পরে আমেরিকার রিপাবলিকান ও ডেমোক্র্যাটিক এই প্রধান দুটি দলের সম্পর্ক ছিল সাংঘর্ষিক, অনেকটা বাংলাদেশের আওয়ামী লীগ এবং বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের মধ্যে বিদ্যমান সম্পর্কের মতোই।

দুই দলের শীর্ষ পর্যায়ের নেতাদের পারস্পরিক সম্পর্কও ছিল মূলত শত্রুভাবাপন্ন। তাদের মধ্যে বাক্যালাপ ও আলোচনা হত ক্বচিত, যেমন বাংলাদেশে সরকার প্রধান ও বিরোধী দলীয় নেত্রীর মধ্যে দেখা-সাক্ষাৎ বা পারস্পরিক আলাপ-আলোচনা হয় কদাচিৎ। বাংলাদেশের দুটি প্রধান দলের শীর্ষস্থানীয় নেতানেত্রী যেভাবে তাদের প্রতিপক্ষকে মারাত্মক ধরনের শত্রু হিসেবে চিহ্নিত করে থাকেন এবং হাজারো সত্য-অসত্য অভিযোগের ডালা সাজিয়ে একে অপরকে সম্বোধন করেন, আমেরিকার দুই

www.pathagar.com

প্রধান দলের নেতৃবৃন্দ প্রায় তেমনি করতেন। কোনো দলের পক্ষেই সামগ্রিকভাবে আমেরিকার শাসনব্যবস্থায় দীর্ঘদিন নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়নি। রিপাবলিকানরা প্রেসিডেন্সি (Presidency) দখলে রেখেছিলেন ১৮৬৮ সাল থেকে শুরু করে ১৯১২ সাল পর্যন্ত। এ সময়ে শুধুমাত্র গ্রোভার ক্লিভল্যান্ড ডেমোক্র্যাটদের পক্ষে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। অন্যদিকে, ডেমোক্র্যাটদের দখলে থেকেছে কংগ্রেস এবং অধিকাংশ অঙ্গরাজ্যের আইন পরিষদ।

বাংলাদেশের অধিকাংশ রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ যেমন বর্তমান ও ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি না দিয়ে, অতীতকে মূলধন করে নির্বাচন পরিচালনা করে থাকেন, বিশেষ করে একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে তাদের কি ভূমিকা ছিল তা হাজার বার উচ্চারণ করে, এমনকি মুক্তিযুদ্ধের চেতনার দোহাই দিয়ে অতীতকে বারে বারে টেনে আনেন, আমেরিকার রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড তেমনি প্রায় তিন দশক পর্যন্ত অতীতমুখীই থেকে 'রক্তাক্ত শার্টের' ('Bloody Shirt') প্রদর্শনী এবং এর মাধ্যমে দক্ষিণের ভোটদাতাদের স্মরণ করানো হত যে তারাই বিচ্ছিন্নতাবাদী। তারাই গৃহযুদ্ধ সংঘটনের প্রধান হোতা। তারাই যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় ঐক্যের শত্রু। তাদের দেশপ্রেম প্রশ্নবিদ্ধ। অন্যদিকে, ডেমোক্র্যাটদের প্রচারণার মূল বিষয় হত রিপাবলিকানদের সীমাহীন দুর্নীতি, ক্ষমতার অপব্যবহার এবং প্রশাসনে অরুচিকর দলীয়করণ। নির্বাচিত রিপাবলিকান প্রেসিডেন্ট যেন সফলকাম হতে না পারেন সেই লক্ষ্যে, ডেমোক্র্যাট-প্রাধান্যের কংগ্রেস অনেক সময় প্রকাশ্যে এবং অধিকাংশ সময় গোপনে ব্যবস্থা গ্রহণ করত, যেমন বাংলাদেশে ক্ষমতাসীন সরকারকে পর্যুদস্ত করতে বিরোধী দল সর্বাত্মক উদ্যোগ গ্রহণ করে থাকে। বাংলাদেশে শীর্ষ পর্যায়ের নেতা-নেত্রীরা পরস্পরের বিরুদ্ধে যেভাবে অকথ্য ভাষা প্রয়োগ করে, অসত্য তথ্যের সম্ভার সাজিয়ে, মিথ্যা পরিসংখ্যান গুছিয়ে, এমনকি সরকার পতনের জন্যে সুনির্দিষ্ট দিন-ক্ষণ নির্ধারণ করে সজ্ঞাতভাবে দেশময় এক অনিশ্চিত পরিবেশ সৃষ্টি করেন, আমেরিকাতেও প্রায় তেমনি অবস্থা বিরাজ করত। এদিক থেকে বিচার করলে গৃহযুদ্ধ-পরবর্তী কালের আমেরিকার রাজনীতি এবং স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশের রাজনীতির মধ্যে দেখা যাবে ভয়ঙ্কর রকম মিল। দুটিই সম্ভাবনাময় দেশ, কিন্তু রাজনীতিকদের ভাষা ও কার্যক্রমে তার কোনো প্রতিফলন দেখা যায়নি। দুটি দেশেই বিদ্যমান গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার কাঠামো, কিন্তু কোনো দেশেই এই সময়কালে রাজনীতিকদের মন গণতন্ত্রের জন্যে তৈরি হয়নি। দুটি দেশেই রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ বসবাস করেছেন অতীতে। আমেরিকার ক্ষেত্রে সেই গৃহযুদ্ধ (Civil War) এবং বাংলাদেশে একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ। ফলে উভয় ক্ষেত্রেই ব্যর্থতা প্রকট হয়ে উঠেছিল। অনিশ্চয়তা মূর্ত হয়েছে। কল্যাণমুখী পদক্ষেপ হয়েছে বিরল।

তিন দশক পরে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে গভীর এক পরিবর্তন সূচিত হয়। এই পরিবর্তনের মূলে ছিল বৌদ্ধিক বা বুদ্ধিবৃত্তির এক আন্দোলন ('An Intellectual Movement')। এই আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছেন বহু জ্ঞানী-গুণী-দার্শনিক

www.pathagar.com

এবং চিন্তাবিদ। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন উইলিয়াম জেমস্ (William James), চার্লস পিয়ার্স (Charles Pierce), মার্ক টোয়েন (Mark Twain) এবং পরবর্তীতে জন ডিউয়ি (John Dewey), অলিভার ওয়েন্ডেল হোমস্ (Oliver Wendel Holmes) প্রমুখ খ্যাতনামা ব্যক্তিবর্গ। সেই আন্দোলন ছিল প্রয়োগবাদী (Pragmatism)। কোনো বক্তব্য বা উক্তি বা ধারণা বা নীতি মানব কল্যাণের ক্ষেত্রে কতটুকু প্রাসঙ্গিক সেই মানদণ্ডে তার বিচার হবে, অন্যকোনো মানদণ্ডে নয়। রাজনীতিকদের ব্যর্থতায় ক্লিষ্ট হয়ে, তাদের আবেগতাড়িত আত্মম্ভরিতায় ক্ষুব্ধ হয়ে, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তাদের অনীহায় ব্যথিত হয়ে, বিশেষ করে তাদের অতীত-প্রিয়তায় বিরক্ত হয়ে প্রয়োগবাদিতায় (Pragmatism) এই দর্শন এসব চিন্তাবিদ তুলে ধরেন জাতির সামনে। প্রয়োগবাদিতার রাজনীতিকদের সামনে এই প্রশ্ন তুলে ধরা হত : "যা বলেছেন তা যে সঠিক তা প্রমাণ করুন।("Show me")। অসত্য উচ্চারণ পরিহার করুন। আপনাদের দুই দলের সমর্থক যতজন, তার একশোগুণ বেশি জনসমষ্টি আপনাদের আওতার বাইরে। আপনাদের ঝগড়া সমগ্র দেশকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে না। জনগণের নামে জনগণকে ধোকা দেয়ার কোনো অধিকার নেই কারো।" এই প্রয়োগবাদের (Pragmatism) অন্যতম লক্ষ্য ছিল দেশের রাজনীতিকে অতীত থেকে টেনে এনে বর্তমানের বাজারে প্রতিযোগিতার জন্যে উপস্থাপন করা। এর লক্ষ্য ছিল কর্মসূচি বা আদর্শের এক বাজার তৈরি করা (Create "a market place of ideas"), যে বাজারে ঐসব কর্মসূচি বা আদর্শের যাচাই-বাছাই হতে পারে মুক্তাঙ্গনে, গোপনে নয়। সরবে, বাক-বিতণ্ডার মাধ্যমে, নীরবে নয়। এভাবে চিন্তাবিদদের বুদ্ধিবৃত্তির আন্দোলনের ফলে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের সমাজের বহু বাচনিক (Pluralism) বৈশিষ্ট্য, রাজনীতির ওপর জনসমষ্টির অভিভাবকত্ব (Public Oversight), বিশেষ করে রাজনীতির বস্তুনিষ্ঠতার (Political neutrality) সূচনা হয় গৃহযুদ্ধের (Civil War) প্রায় তিন দশক পরে। বাংলাদেশেও এমনি এক বৌদ্ধিক আন্দোলনের (Intellectual Movement) প্রয়োজন অনুভূত হচ্ছে তীব্রভাবে। বাংলাদেশে রাজনীতিকে হতে হবে সৃজনশীল এক কর্মপ্রবাহ। হতে হবে যুক্তিভিত্তিক কর্মসূচির মাধ্যম। হতে হবে পরিশীলিত এবং রুচিকর এক যৌথ কার্যক্রম।

বাংলাদেশের দুর্ভাগ্য, এদেশের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের বিরাট অংশ এখনো আঁটকে রয়েছেন 'বৈধতার' সংকীর্ণ গুহায়। দক্ষতা বা সুষ্ঠু নীতির মানদণ্ডে কোনো রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের মূল্যায়নে প্রবৃত্ত হতে আমাদের অধিকাংশ নেতা এখনো শেখেননি। শেখেননি বলেই নিজেদের মনগড়া 'বৈধতার' প্রশ্নটি সারাক্ষণ আওড়াতে থাকেন। সবার মনে থাকার কথা, ১৯৯৬ সালের সাধারণ নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে আওয়ামী লীগ ক্ষমতাসীন হবার পরে তখনকার প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঘোষণা দিয়েছিলেন, ১৯৭৫ সালের পরের সকল সরকার ছিল অবৈধ। এই ধারণা পোষণ করেই তিনি ১৯৯১ সালে বিরোধী দলীয় নেত্রী হিসেবে ১৯৯১ সালের সাধারণ নির্বাচনে বিজয়ী বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের সরকার সম্পর্কে বলেছিলেন, এ সরকারকে এক দিনের জন্যেও শান্তিতে থাকতে দেয়া হবে না। অন্যদিকে, ১৯৯৬ সালে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ

www.pathagar.com

সরকারের প্রতি বিএনপির নেতানেত্রীর প্রচণ্ড ক্ষোভের প্রকাশ ঘটেছিল সপ্তম জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনের প্রথম দিনের ওয়াক আউটে। এই অসহিষ্ণু অসহযোগিতার মূলে রয়েছে এই জাতির ইতিহাসের শ্রেষ্ঠতম অধ্যায় যে মুক্তিযুদ্ধ, সেই মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে আওয়ামী লীগ ও বিএনপির নেতৃবৃন্দের এক ধরনের বিশ্বাস এবং বদ্ধমূল ধারণা। সেই মুক্তিযুদ্ধকে বিভিন্ন প্ল্যাটফরম থেকে হাজারো লেখক, বুদ্ধিজীবী, ইতিহাসবিদ জনযুদ্ধ রূপে চিত্রিত করলেও আওয়ামী লীগের বেশ কিছু নেতার বিশ্বাস, তা আওয়ামী লীগের অর্জন। তাই তাদের বিশ্বাস, মুক্তিযুদ্ধের ফসল বাংলাদেশকে শাসন করার বৈধ অধিকার একমাত্র আওয়ামী লীগের। অন্য কোনো দলের নয়। আওয়ামী লীগের নেতা শেখ মুজিবুর রহমান, তাদের বিশ্বাস, স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশের একক সৃষ্টিকর্তা। এক্ষেত্রে জনগণের ভূমিকা, প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী বা ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি অথবা মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক বা বিভিন্ন সেক্টর কমান্ডারদের ভূমিকা নেহায়েত গৌণ। গৌণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে মুক্তিযুদ্ধে জনগণের ভূমিকা। এই একদেশদর্শী ভাবনা-চিন্তার তীব্র প্রতিক্রিয়া হিসেবে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলসহ সমমনা দলগুলির অবস্থান অর্থাৎ ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চের রাত্রিতে মেজর জিয়াউর রহমানের পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা, পরবর্তীতে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা দান, সেক্টর প্রধান হিসেবে মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্ব দান এবং জেড-ফোর্সের সংগঠন, এমনকি ১৯৭৫ সালের ৭ নভেম্বরে সংঘটিত সিপাহী-জনতার বিপ্লবের মাধ্যমে ক্ষমতাসীন হয়ে আধুনিক বাংলাদেশ রচনায় অগ্রণী ভূমিকার বিষয়সমূহ বাংলাদেশ রাজনীতি ক্ষেত্রে বৈধতার তীব্র সঙ্কট সৃষ্টি করেছে। এই সঙ্কট এতই তীব্র যে, ক্ষমতাসীন বিএনপি সরকারের সাথে কোনো সহযোগিতা অথবা ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ সরকারের সাথে কোনো সহযোগিতা বাংলাদেশের রাজনৈতিক নেতৃত্বের কগনিটিভ মানচিত্রে (Cognitive map) একে অপরের অবস্থানের প্রতি স্বীকৃতি হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আসছে সেই ১৯৭৫ সাল থেকেই। এভাবে যেমন ১৮৬১-৬৪ সালের গৃহযুদ্ধের (Civil War) সময়কাল আমেরিকার রাজনীতিকে সংঘাতময় করে তুলেছিল প্রায় তিন দশক, বাংলাদেশ রাজনীতিও তেমনি সাংঘর্ষিক ও সংঘাতময় হয়ে উঠেছে ১৯৭১ এর মুক্তিযুদ্ধের এবং ১৯৭৫ সালের শেখ মুজিবুর রহমানের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের সময়কাল থেকে। বাংলাদেশে বৈধতার প্রশ্নটি এমনি জটিল ও দৃঢ়মূল যে, শুধু রাজনৈতিক মহল নয়, দেশের বুদ্ধিজীবী, পেশাজীবী, এমনকি সংস্কৃতিসেবীরাও এর সাথে সংশ্লিষ্ট হয়ে সমগ্র জনসমষ্টির এক বৃহৎ অংশকে দ্বিধাবিভক্ত করে ফেলেছে। দেশের প্রতিটি সামাজিক শক্তি এই ইস্যুতে বিভক্ত। ফলে জাতি হয়ে উঠেছে বিভক্ত। বিএনপি সরকার যাই করুক না কেন, ভালো হোক আর মন্দ হোক আওয়ামী নেতৃত্ব ও সহযোগীরা তার তীব্র সমালোচনা করবেই। অন্যপক্ষে আওয়ামী লীগ যা করবে তার বিরোধিতা বিএনপি ও তার সহযোগীদের পক্ষ থেকে আসবেই। আমেরিকাতেও অনেকটা এমনি হয়েছিল ঐ সময়ে।

আমেরিকা ঐ সঙ্কট থেকে অব্যাহতি লাভ করেছিল উনিশ শতকের শেষদিকে গড়ে ওঠা তাদের বুদ্ধিবৃত্তিক আন্দোলনের মাধ্যমে। আমরা কি তেমন কিছু করতে পারি না?

www.pathagar.com

সত্যি বটে, যে বৈধতার প্রশ্নটি আজ আমাদের জাতীয় জীবনে এক অভিশাপ রূপে দেখা দিয়েছে, তার কেন্দ্রবিন্দু হল শেখ মুজিবুর রহমান এবং জিয়াউর রহমান। একটু সুস্থভাবে ভাবলে কেউ দ্বিমত পোষণ করবেন না যে, এই দুই মহান নেতা আমাদের জাতীয় সম্পদ। এই অর্থে এ কে ফজলুল হক, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী এবং মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী আমাদের যেমন জাতীয় সম্পদ, তেমনি জাতীয় সম্পদ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং কাজী নজরুল ইসলাম। জাতীয় জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে এমন প্রতিভাবান দিশারী আরো আছেন এবং সবাই আমাদের জাতীয় সম্পদ। তাঁরা সকল দলের ঊর্ধ্বে। সকল সম্প্রদায়ের ঊর্ধ্বে। ঊর্ধ্বে সকল সংকীর্ণতার। তার পরেও আমরা এ সম্পর্কে কোনো ঐকমত্য গঠনে সক্ষম হইনি। হয়ত হবেও না অদূর ভবিষ্যতে।

আমেরিকার বুদ্ধিজীবীরাও তাদের বৃহৎ দুটি দলের নেতৃত্বকে কাছাকাছি আনতে চেষ্টা করেননি, কেননা তাদের ধারণা ছিল, চেষ্টা করলেও কোনো লাভ হবে না। তাই তারা পরামর্শ দিয়েছিলেন, প্রয়োগবাদের মাধ্যমে জনস্বার্থ সম্পর্কিত এবং জাতীয় স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলিকে যুক্তির কষ্টিপাথরে যাচাই করে বিরোধী দল বিরোধিতা করবে কি না করবে তা ঠিক করুক এবং ক্ষমতাসীনরা আকাশছোঁয়া উদারতার আলো চারদিকে ছড়িয়ে দিক এবং বর্তমানকে মহান ও ভবিষ্যতকে মহত্তর করুক। গৃহযুদ্ধের চার দশকের মাথায় এই আন্দোলনের সেরা সৃষ্টি উড্রো উইলসন এভাবে নতুন নেতৃত্বের প্রতিনিধিরূপে আমেরিকার সংঘাতময় রাজনীতিকে ঘৃণাভরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ১৯১৩ সালে তার The New Freedom শীর্ষক বক্তৃতায় বলতে পেরেছিলেন : "এই শ্রেষ্ঠ জাতির শক্তি ও উদ্যোগকে পুরোপুরি মুক্ত করে দিতে হবে। এভাবেই আমেরিকার ভবিষ্যৎ তার অতীত থেকে উজ্জ্বলতর হয়ে উঠবে এবং আমেরিকার গৌরব বৃদ্ধি পাবে নতুন নতুন অর্জনের মাধ্যমে। যতদিন যাবে আমেরিকা টের পাবে যে এক প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্মের সুসন্তানরা নিয়ে আসবে নতুন নতুন গৌরব গাঁথা। কেননা এই প্রজন্মের সুসন্তানরা অতীতের থেকে অনেক বেশি আলোকিত এবং সমগ্র মানব জাতির প্রতি আমেরিকার যে প্রতিশ্রুতি তা সে পালন করবেন।" ["We have got to set the energy and the initiative of this great people absolutely free, so that the future of America will be greater than the past, so that the pride of America will grow with achievement, so that America will know as she advances from generation to generation that each brood of her sons is greater and more enlightened than that which preceded it, know that she is fulfilling the promise that she has made to mankind....."] আমেরিকার বুদ্ধিবৃত্তিক আন্দোলনের ফলে আমেরিকার রাজনৈতিক নেতৃত্ব মাটির কলকোলাহল থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে, তারা ভরা আকাশের দিকে দৃষ্টি দিয়ে উজ্জ্বল ভবিষ্যতকে আবাহন করতে শিখেছে। অতীতের সংঘাতময় দিনগুলি ভুলে বর্তমানের কর্মময়তাকে ভালবাসতে শিখেছে। অরুচিকর পরিবেশের জেদ বিস্মৃত হয়ে পারস্পরিক সহযোগিতা ও সহমর্মিতার পাঠ নিয়েছে। এভাবে পারস্পরিক দ্বন্দ্বে বিধ্বস্ত

www.pathagar.com

আমেরিকা সংকীর্ণতার ধূলিমলিন আবরণ ছুঁড়ে ফেলে বিশ্বজয়ের শত সম্ভাবনায় সচকিত হয়ে ওঠে। আজকের বাংলাদেশের রাজনৈতিক নেতৃত্ব আমেরিকার সেই বৌদ্ধিক আন্দোলন (Intellectual Movement) থেকে কিছু শিখবে কি? শিখবে কি আমেরিকার রাজনৈতিক নেতৃত্বের মতো ক্লেদাক্ত বর্তমানকে ভুলে উজ্জ্বল ভবিষ্যতের স্বপ্নে সচকিত হতে? শিখবে কি আজকের মাটির হাজারো সমস্যার মধ্যেও খানিকটা আকাশচারিতার অভিযানে প্রবৃত্ত হতে? জানি তো সবাই, মাত্র দুহাজার ফিট উপর থেকে দেখলেও এই ধূলির ধরণীকে কত সুন্দর ও সুষমামণ্ডিত দেখায়। এই মুহূর্তে এটির প্রয়োজন সবচেয়ে বেশি।

www.pathagar.com

বিশ্বায়নের একালে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস

আজকের বিশ্বায়নের প্রবল স্রোতধারায় শুধুমাত্র জাতি-রাষ্ট্র, জাতীয় স্বাতন্ত্র্য, জাতীয়তাবোধ যে নীরবে নিঃশব্দে ক্ষয়ে যাচ্ছে তাই নয়, জাতীয় ভাবধারার মাধ্যমে যে ভাষা তাও ক্রমে ক্রমে ক্ষয়িষ্ণু হয়ে উঠেছে। বিশ্বায়নের একালে বহুজাতিক কর্পোরেশনের স্বার্থে বিশ্বব্যাপী এককেন্দ্রিক সংস্কৃতির বিজয় নিশ্চিত করতে সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের পরিবর্তে সাংস্কৃতিক ঐক্য প্রতিষ্ঠা অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। যেহেতু সংস্কৃতির অন্যতম মাধ্যম হল ভাষা, তাই ভাষার ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সাধিত হচ্ছে। বেশ কিছু ভাষার অপমৃত্যু ঘটেছে এরই মধ্যে। ২০০১ সালের এক হিসাবে দেখা যায়, বর্তমানে প্রায় ৪০ কোটি জনসমষ্টি ইংরেজিকে ব্যবহার করছে তাদের প্রথম ভাষা হিসেবে। আরো ২৫ কোটি মানুষের নিকট ইংরেজি দ্বিতীয় ভাষা। প্রায় ১০০ কোটি মানুষ এ মুহূর্তে ইংরেজি শিক্ষায় গভীরভাবে মনোযোগী। অনেকের ভবিষ্যদ্বাণী, ২০৫০ সালে বিশ্বের প্রায় অধিক লোকের ভাষা হবে ইংরেজি। বিশ্বায়নের এ যুদ্ধে বিশ্বময় যোগাযোগের মাধ্যম হয়েছে ইংরেজি। ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালিত হচ্ছে ইংরেজিতে। কম্পিউটার ও ইন্টারনেটের ভাষা হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে ইংরেজি। তাই আজ ইংরেজি শুধুমাত্র একটি ভাষা নয়, এটি এখন এক নব্য সংস্কৃতিতে পরিণত হয়েছে। এভাবে আজকের এককেন্দ্রিক বিশ্বে একদিকে যেমন বিশ্বের একক ভাষা হিসেবে ইংরেজির অবস্থান ক্রমে ক্রমে অপ্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠেছে, অন্যদিকে তেমনি বিশ্বের প্রায় ৭০০০ ভাষার মধ্যে প্রতি সপ্তাহে দুটি এবং প্রতি বছরে শতাধিক ভাষা অপমৃত্যুর কবলে পড়ছে। অনেক বিজ্ঞজনের ধারণা, এই শতাব্দীর শেষ প্রান্তে বিশ্বের শতকরা ৬০ থেকে ৯০ ভাগ ভাষার ভাগ্য বিড়ম্বনা ঘটতে পারে। এ পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৯৯ সালের ১৭ নভেম্বরে প্যারিসে অনুষ্ঠিত জাতিসংঘের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি সংক্রান্ত সংস্থা ইউনেস্কোর অধিবেশনে ২১ ফেব্রুয়ারিকে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসেবে স্বীকৃতি একটি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। তাই ২০০০ সাল থেকে জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্রগুলিতে (বর্তমানে এই সংখ্যা ১৯১) ২১ ফেব্রুয়ারি পালিত হয়ে আসছে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে। ইউনেস্কোর এই সিদ্ধান্তের ফলে বাংলাদেশের একটি বিশিষ্ট অর্জন আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি লাভ করল এবং বাংলাদেশের ভাষা আন্দোলনের উজ্জ্বল অধ্যায়টি বিশ্ব ইতিহাসে এক গৌরবময় অধ্যায়ে পরিণত হল।

২০০০ সাল থেকে বিশ্বের ১৯০টি রাষ্ট্রে মাতৃভাষার দাবিতে সংগ্রামরত পূর্ববাংলার দামাল ছেলেদের কথা উচ্চারিত হচ্ছে। শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করা হচ্ছে সেই সব তরুণদের আত্মদানের কথা। স্মরণ করা হচ্ছে রফিকউদ্দিন, আবুল বরকত, আব্দুল জব্বার, আবদুস সালাম, শফিকুর রহমান, ওয়ালিউল্লাহসহ নাম না-জানা আরো অনেক

www.pathagar.com

শহীদদের, পরম শ্রদ্ধার সাথে, গর্বের সাথে। ঢাকার শহীদ মিনার এখন শুধুমাত্র ঢাকার নয়, এই শহীদ মিনার এখন সারা বিশ্বের। হয়ে উঠেছে নতুন নতুন সংগ্রামের পবিত্র স্মারক, বিজয়ের প্রতীক, অনুপ্রেরণার উৎস। এই শহীদ মিনার এখন কম্পিত হচ্ছে দেশ-বিদেশের লক্ষ লক্ষ জনের পদচারণায়। আজো যারা বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে নিজেদের মাতৃভাষার দাবিতে সংগ্রামরত রয়েছেন, বিশ্বায়নের অশুভ প্রক্রিয়ায় নিজেদের ভাষাকে অপমৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাবার সংগ্রামে রত রয়েছেন, তারা বারে বারে স্মরণ করবেন পূর্ববাংলার ছাত্র-জনতার সংগ্রামী চেতনাকে। উদ্বুদ্ধ হবেন রক্তদানের মধ্য দিয়ে অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনে। তাই এখন রফিক, বরকত, সালাম, জব্বাররা শুধুমাত্র বাংলাদেশের কৃতী সন্তান নন, তারা আজ সমগ্র বিশ্বের, যেমন ১৮৮৬ সালের ১লা মে চিকাগো নগরীর হে মার্কেটে ৮ ঘণ্টা শ্রমকালের দাবিতে আত্মদানকারী শ্রমিকরা শেষ পর্যন্ত শুধুমাত্র চিকাগো নগরীর থাকেননি। তারাও বিশ্বময় শ্রমজীবীদের প্রতিনিধিতে রূপান্তরিত হন। এদিক থেকে বলতে কোনো দ্বিধা নেই, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসরূপে একুশে ফেব্রুয়ারির তাৎপর্য এখন বিশ্বময় বিস্তৃত। তা শুধু বিশ্বের ২৫ কোটি বাংলাভাষীর অমূল্য সম্পদ নয়, এখন একুশে ফেব্রুয়ারি নিজেদের ভাষার মর্যাদা সংরক্ষণের দাবিতে উচ্চকণ্ঠ প্রায় দু'শ কোটি মানুষের আস্থার প্রতীক, সংগ্রামী চেতনার স্মারক।

ভাষা হল সাহিত্য ও সংস্কৃতির মাধ্যম। ইতিহাস ও ঐতিহ্যের বাহন। শিল্পকর্ম ও অগ্রগতির ধারক। ভাষার ওপর তাই কোনো আঘাত এলে সমগ্র জাতি শঙ্কিত হয়ে ওঠে। হয় আতঙ্কিত। উদ্যোগ গ্রহণ করে সেই আঘাত প্রতিহত করতে। যুক্তিবুদ্ধির সহায়তায় তা সম্ভব হলে ভালো। তা না হলে অগ্রসর হয় রক্তাক্ত পথে। এগিয়ে যায় আত্মদানের পথে। পূর্ববাংলায় যে ভাষা আন্দোলনের সূচনা হয় ১৯৪৮ সালে তার মধ্যে এই জাতির সংকল্পই প্রতিফলিত হয়। একুশে ফেব্রুয়ারি তারই চূড়ান্ত রূপ। একুশে ফেব্রুয়ারির জন্ম একদিনে হয়নি, হয়নি এক যুগেও। তাছাড়া, একুশে ফেব্রুয়ারি শুধুমাত্র ভাষা সংরক্ষণের আন্দোলন ছিল না। ভাষার সাথে সংশ্লিষ্ট জীবনবোধ, সাহিত্য-সংস্কৃতির স্বাতন্ত্র্য, জাতির আধ্যাত্মিক সত্তা সংরক্ষণের সংগ্রামের মূর্ত রূপ ছিল একুশে ফেব্রুয়ারি। বাংলাদেশের জনগণের নিকট তাই এ দিনের গুরুত্ব এমন হৃদয়গ্রাহী। একুশের সংগ্রাম একদিকে যেমন এই জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক, তেমনি তার স্বপ্নসাধ পূর্ণ করার নির্দেশকও।

বিশ্বায়নের প্রবল স্রোতে যখন একটি একটি করে ভাষার অপমৃত্যু ঘটছে তখন ঐসব ভাষাভাষী বিচ্ছিন্ন হচ্ছেন তাদের ইতিহাস-ঐতিহ্য থেকে। বিচ্ছিন্ন হচ্ছেন তাদের শিল্প-সংস্কৃতির মূল গ্রন্থি থেকে। সাম্প্রতিককালে মাতৃভাষার সারিতে এল ম্যাসাচুসেটসের ক্যাটওয়া। আলাস্কার এয়াক, লাটভিয়ার লিভোনিয়ান প্রভৃতি। এসব ভাষা ব্যবহারকারীগণ দেশজ সংস্কৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে সংস্কৃতি ক্ষেত্রে তারা এক ধরনের যাযাবর গোষ্ঠীতে পরিণত হচ্ছেন, কেননা তারা না পারবেন বিদেশী আচার-অনুষ্ঠানকে পুরোপুরি আত্মীকরণ করতে। তাই নিজস্ব ভাষা সংরক্ষণের দাবি অনেকটা সহজাত, মৌলিক, আদিম। এ দাবি যতদিন শক্তিশালী থাকবে একুশের প্রেরণা ততদিন থাকবে চিরঞ্জীব এবং তাও সমগ্র বিশ্বে।

www.pathagar.com

বাংলা ভাষা সম্পর্কে অবশ্য নেই তেমন কোনো হতাশা। কেননা, বিশ্বায়নের একালে বাংলাভাষীদের বাংলা ছাড়াও শিখতে হবে অন্য ভাষা, বিশেষ করে ইংরেজি। ইংরেজি শিখেই তীব্র প্রতিযোগিতার এই সময়ে শুধু টিকে থাকতে হবে তাই নয়, বিজয়ী হতে হবে। সমান তালে পা মিলিয়ে দ্রুতগতিতে চলতে হবে। কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জন করতে হবে। তাই বাংলাদেশেও ইংরেজি শেখার গতি ত্বরান্বিত হবে। বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের আকর্ষণ ইংরেজির প্রতি বৃদ্ধি পাবে ভীষণভাবে। কিন্তু সেই ঝড়ে অথবা টর্নেডোতে বাংলা ভাষা উড়ে যাবে না। একশ' বছর পরেও বাংলা ভাষা এদেশে প্রথম ভাষা হিসেবে টিকে না থাকলেও দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে এর স্ট্যাটাসের কোনো হেরফের হবে না। কিন্তু বাংলাদেশে বসবাসকারী অন্যূন ৫৭টি উপজাতীয় জনগোষ্ঠীর যে স্বতন্ত্র শব্দাবলি রয়েছে এবং এসব শব্দের পেছনে যে ইতিহাস রয়েছে, বৈশিষ্ট্যপূর্ণ আচার-অনুষ্ঠানের জীবন্ত কাহিনী রয়েছে, তার ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হয়ে যেতে পারে ইংরেজির ব্যাপক প্রভাবে। অথচ এই শব্দাবলি বাংলা ভাষাকে বিভিন্নভাবে সমৃদ্ধ করেছে এবং ভবিষ্যতেও সমৃদ্ধ করবে ভয়ঙ্করভাবে। এ বিষয়ে এদেশের বুদ্ধিজীবী ও সংস্কৃতিসেবীদের ভেবে দেখতে হবে।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার মাত্র এক মাস পরে ১৯৪৭ সালের ১৫ সেপ্টেম্বরে অধ্যাপক কাজী মোতাহার হোসেন, আবুল মনসুর আহমদ এবং অধ্যাপক আবুল কাশেমের তিন নিবন্ধের সমন্বয়ে একটি পুস্তিকা প্রকাশিত হয়। "পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা : বাংলা না উর্দু?" শীর্ষক এই পুস্তিকায় বাংলাকে পাকিস্তানের রাষ্টাভাষা করার উদাত্ত আহ্বান জানানো হয়। ১৯৪৭ সালের নভেম্বরে ড. মুহাম্মদ এনামুল হক 'পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষার পরিপ্রেক্ষিতে উর্দু ও বাংলা' শীর্ষক প্রবন্ধে লিখেছিলেন : উর্দু বহিয়া আনিবে পূর্ব পাকিস্তানীদের মরণ–রাজনৈতিক, রাষ্ট্রীক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক মৃত্যু। এই রাষ্ট্রীয় ভাষার সূত্র ধরিয়া শাসন, ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদি সর্ববিষয়ে পূর্ব পাকিস্তান হইবে উত্তর ভারতীয় পশ্চিম পাকিস্তানী উর্দুওয়ালাদের শাসন ও শোষণের ক্ষেত্র।' ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ, আবুল কালাম সামসুদ্দিন প্রমুখ পণ্ডিত পাকিস্তানে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলার যথার্থতা সম্পর্কে লিখেছেন জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধ-নিবন্ধ। তাদের সবার লেখায় জাতীয় মানস তৈরি হয় নতুন সৃষ্টির জন্য। প্রস্তুত হয় ভাষা সংগ্রামের উর্বর ক্ষেত্র। বুদ্ধিজীবীদের যুক্তিবিচার মাথায় নিয়ে তারুণ্য উদ্দীপ্ত হয়। তারুণ্য প্রস্তুত হয় ঐক্যবদ্ধ, সংহত, অজেয় প্রাণ প্রাচুর্যের ভাণ্ডার নিয়ে সংগ্রামের জন্য। চল্লিশ দশকের মাঝামাঝি থেকে চিন্তাবিদ-বুদ্ধিজীবীদের কলমের সরু খোঁচায় যে স্বপ্নের সূচনা, পঞ্চম দশকের প্রথম ভাগেই সংগ্রামী তরুণদের তাজা রক্তের স্পর্শে তা প্রাণবন্ত হয়ে উঠল।

একুশে ফেব্রুয়ারি পূর্ব-বাংলায় যে অসম্ভবকে সম্ভব করেছে, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে এখনো যেসব জনপদে মাতৃভাষার দাবিতে সংখ্যাহীন তরুণ-তরুণী সংগ্রামে লিপ্ত রয়েছেন, বিশেষ করে বিশ্বায়নের এই কালে, একুশে ফেব্রুয়ারি শুধুমাত্র বাংলাভাষীদের অহঙ্কার হয়ে না থেকে প্রতিবাদী একুশ শুধু কোনো অন্যায়ের নিকট মাথা না নোয়ানোর প্রত্যয়রূপে জাগ্রত থাকতে পারবে কি? একুশে ফেব্রুয়ারির ইতিহাস কিন্তু সাধারণ ছাত্র-জনতার ইতিহাস। এই ইতিহাসের নায়ক অথবা মহানায়ক তারাই।

www.pathagar.com

কোনো দল অথবা দলীয় নেতার নেতৃত্বে এর জন্ম হয়নি। দেশের চিন্তাবিদ-বুদ্ধিজীবীরা তাদের যুক্তিবাদী সৃজনশীল লেখনীর দ্বারা সমাজজীবনে এর ক্ষেত্র রচনা করেন। দেশের স্বাধীনচেতা মৃত্যুঞ্জয়ী তরুণরা সেই উর্বর ক্ষেত্রে রক্তবীজ বপন করেন। ফলে এই সোনালি ফসল। এই তরুণদের সংগ্রামী চেতনা সমগ্র সমাজব্যাপী ছড়িয়ে পড়ে গড়ে তোলে এক অজেয় শক্তি। তাই পরবর্তীতে রাজনীতিকে দান করে নতুন দ্যোতনা। সংস্কৃতি ক্ষেত্রে সৃষ্টি হয় এক নতুন চিৎশক্তি। সৃষ্টি হয় নতুন ইতিহাস।

সম্প্রতি পশ্চিম আফ্রিকার আটলান্টিক মহাসাগরের উপকূলে অবস্থিত সিয়েরালিওনে বাংলাদেশের তরুণরা আর একটি ঐতিহাসিক অর্জনের মাধ্যমে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করেছেন। ১৯৬১ সালে স্বাধীনতা লাভ করেও এই দেশটি এখনো শান্তিপূর্ণ সমাজ জীবনের আশীর্বাদ লাভ করেনি। জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের সাথে চুক্তির মাধ্যমে ঐ অশান্ত দেশটিতে ২০টি দেশের শান্তিরক্ষী বাহিনী কর্মরত রয়েছেন। বাংলাদেশ থেকেও একটি শান্তিরক্ষী বাহিনী যোগদান করে ২০০০ সালের মে মাসে। বাংলাদেশের শান্তিরক্ষী বাহিনীর কার্যক্রমে খুশি হয়ে ২০০২ সালের ২৭ ডিসেম্বর সেই দেশের সরকার সিয়েরালিওনে ইংরেজির পাশাপাশি বাংলাকে ঘোষণা করেছেন রাষ্ট্রভাষা হিসেবে। সে দেশেও রফিক, বরকত, সালাম, জব্বারদের কীর্তিগাথা প্রচারিত হচ্ছে একুশে ফেব্রুয়ারিতে। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে তাই গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করি ঐসব শহীদ এবং বীরযোদ্ধাদের যাদের রক্ত, অশ্রু ও ত্যাগের বিনিময়ে আমরা একুশে ফেব্রুয়ারির মতো এই স্মরণীয় দিবসটি লাভ করেছি। এ দিনের সৃষ্টিতে এদেশের তরুণরা রক্তাক্ত অবদান রাখলেও এখন তা বিশ্বজনীন হয়ে উঠেছে। বিশ্বময় এর ব্যাপ্তি এবং সুখদ তুষ্টির কারণ হোক–এই মুহূর্তে তাই আমাদের কামনা।

www.pathagar.com

মে দিবসের তাৎপর্য

পহেলা মে এখন বিশ্বময় পালিত হচ্ছে মে দিবস (May Day) অথবা আন্তর্জাতিক শ্রম দিবস (International Labour Day) রূপে, যেমন ২১ ফেব্রুয়ারি ২০০০ সাল থেকে পালিত হচ্ছে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস (International Mother Language Day) হিসেবে। দুটোরই পেছনে রয়েছে রক্তাক্ত ইতিহাস। মে দিবসের উৎপত্তি মূলত শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষার জন্যে, কিন্তু আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের মূলে রয়েছে ভাষার দাবি প্রতিষ্ঠার সর্বাত্মক সংগ্রামের উদ্দীপ্ত চেতনা। একটি উৎপাদনমুখী শ্রমিকদের সংগ্রামের ফসল, অন্যটি কিন্তু জাতীয় সংস্কৃতি-সাহিত্য, ইতিহাস-ঐতিহ্য সমুন্নত রাখার মৃত্যুঞ্জয়ী প্রয়াস।

১৮৮৬ সালের ১ মে একটি শ্রমিক সংগঠন যুক্তরাষ্ট্রের চিকাগো শহরে ধর্মঘটের ডাক দেয়। ধর্মঘটিদের দাবি ছিল প্রতিদিন শ্রমিকদের সর্বোচ্চ আট ঘণ্টা কাজের দাবি, উচ্চতর মজুরি, উন্নত কর্ম পরিবেশের দাবি। এই দাবি ছিল ন্যায়সঙ্গত, কিন্তু দাবি ন্যায়সঙ্গত হলে কি হবে, যে পুঁজিবাদী সমাজে শ্রমের অপব্যবহারের মাধ্যমে শুধুমাত্র পুঁজিপতিদের স্ফীত হবার সুযোগ যথার্থ, সেখানে কোনোরূপ ধর্মঘট সহ্য করা হবে কেন? প্রথম দিন অত্যন্ত নৃশংসভাবে নির্যাতনের মাধ্যমে ধর্মঘটিদের সরিয়ে দেয়া হয়। ৩ মে শ্রমিকরা প্রতিবাদের জন্যে সম্মিলিত হলে চিকাগো পুলিশের গুলিতে ৬ জন শ্রমিক নিহত হন। এর প্রতিবাদে শ্রমিকরা হে মার্কেটে জমায়েত হলে মিল মালিকদের বোমা বিস্ফোরণে আরো ৪ জন শ্রমিকের মৃত্যু ঘটে। পরবর্তীতে ধর্মঘট আহবানের অপরাধে শ্রমিক নেতা অগাস্ট স্পাইসের (August Spice) ফাঁসি দেয়া হয় এবং যুক্তরাষ্ট্রের সর্বত্র ধর্মঘট বেআইনি ঘোষিত হয়।

শ্রমিকরা কিন্তু তাদের দাবি পরিত্যাগ করেননি। বরং রক্তদানের মাধ্যমে তাদের সংকল্প আরো সুদৃঢ় হয়। ১৮৮৯ সালের ১৪ জুলাই-এ অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক সমাজতান্ত্রিক কংগ্রেসে (The International Socialist Congress) পহেলা মে-কে শ্রম দিবস (Labour Day) হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। ১৮৯০ সালের ১ মে আমেরিকান ফেডারেশন অব লেবার (American Federation of Labour) বিরাট এক বিক্ষোভ মিছিলের মাধ্যমে এর স্বীকৃতি জ্ঞাপন করে। যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট আইজেনহাওয়ার (Dwight D. Eisenhower) ১৯৫৫ সালে এই দিবসকে আনুগত্য দিবস (Loyalty Day) রূপে চিহ্নিত করেন। তখন থেকে বিভিন্ন দেশে এই দিবসটি পালিত হয়ে আসছে। রাশিয়ায় এবং অন্যান্য কিছু সংখ্যক দেশে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পরে এই দিবসের গুরুত্ব ভীষণভাবে বৃদ্ধি পায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠিত হলে তারই এক বিশেষজ্ঞ প্রতিষ্ঠান আন্তর্জাতিক শ্রম সংগঠনের (International Labour

www.pathagar.com

Organization – ILO) জন্ম হয় এবং বিশ্বময় শ্রমিকদের অধিকারের স্বীকৃতি আসে। এই সংগঠনটি শ্রমিক এবং মালিক উভয়ের জন্যে বেশ কিছু নীতি নির্ধারণ করে। বাংলাদেশ ILO কর্তৃক নির্ধারিত কনভেনশনে স্বাক্ষর করেছে।

এমনিভাবে পূর্ব পাকিস্তানে বাংলা ভাষাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতির দাবিতে ১৯৪৮ সাল থেকে এদেশের ছাত্র-শিক্ষক-বুদ্ধিজীবীদের যে আন্দোলন দানা বাঁধে, ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারিতে এক রক্তাক্ত ঘটনার মধ্য দিয়ে তার সফল সমাপ্তি ঘটে। পাকিস্তানের ১৯৫৬ সালের সংবিধানে বাংলা ভাষা স্বীকৃতি লাভ করে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে। ঐ দিনটি ১৯৫৩ সাল থেকে পূর্ব পাকিস্তানে ভাষা দিবস হিসেবে পালিত হয়ে আসছিল। ১৯৯৯ সালে জাতিসংঘের আর একটি বিশেষজ্ঞ সংস্থা ইউনেস্কো [United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization – UNESCO] কর্তৃক আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসরূপে স্বীকৃতি লাভের পর এখন শুধু বাংলাদেশেই নয়, বিশ্বের ১৯১টি দেশে প্রতিপালিত হয়ে আসছে ২০০০ সাল থেকে। মে দিবসও ১৮৯০ সাল থেকে শুধু চিকাগো নগরী অথবা যুক্তরাষ্ট্রেই নয়, সমগ্র বিশ্বে প্রতিপালিত হয়ে আসছে শ্রম দিবস হিসেবে। মে দিবস এক অর্থে, নিজেদের স্বার্থ আদায়ের সংগ্রামে শ্রমিকদের বিজয় দিবস, যেমন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হল জনগণের সবচেয়ে প্রিয়, সবচেয়ে অন্ত রঙ্গ এবং সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ যে মাতৃভাষা সেই ভাষা প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে বিজয়ের দিন। এই দুই এর মধ্যে যে মিল তা উল্লেখযোগ্য। **এক.** বহুসংখ্যক ব্যক্তির প্রাণের বিনিময়ে অর্জিত এই বিজয়। **দুই.** তাই এই বিজয় স্থায়ী এবং ভৌগোলিক এলাকা ছাড়িয়ে বিশ্বময় বিস্তৃত হয়েছে। *তিন.* এই বিজয় চূড়ান্ত পর্যায়ে মানবতার বিজয়। ফলে মে দিবস এবং আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস বিশ্ব মানবতার জয় ঘোষণা করছে।

উৎপাদনের যে সকল মৌল উপাদান রয়েছে শ্রম তার অন্যতম–অন্যতম কেন সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। অথচ শ্রমের মর্যাদা এবং শ্রমিকদের অধিকারের স্বীকৃতির জন্যেও শ্রমিকদের রক্ত ঝরাতে হয়েছে। বিশ্বে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রবর্তিত না হলে কে জানে কখন, কীভাবে, সমাজের সবচেয়ে উৎপাদনশীল এই অংশের অধিকারের স্বীকৃতি মিলত! অধিকাংশ সমাজতান্ত্রিক দেশে মে দিবস পালিত হত অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে। সর্বহারাদের সবচেয়ে সচেতন অংশ হিসেবেই বিবেচিত হয়ে এসেছে দেশের শ্রমিক সংগঠনগুলি। কম্যুনিষ্ট পার্টিগুলির সবচেয়ে কর্মক্ষম অংশ হিসেবেই তা বিবেচিত হয়ে এসেছে। অষ্টম দশকের শেষ প্রান্তে সমাজতন্ত্রের পিতৃভূমি রাশিয়ায় এবং ক্রমে ক্রমে অন্যান্য দেশে সমাজতন্ত্রের অবসান ঘটলেও কিন্তু মে দিবসের গুরুত্ব কোনোক্রমে হ্রাস পায়নি। এখন বিশ্বের সর্বত্র এই দিবসটি পালিত হচ্ছে সাড়ম্বরে।

অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও এই দিবসটি পালিত হয় অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে। আইএলও (ILO)–এর কনভেনশনে স্বাক্ষর করার পূর্বেও এদেশে মে দিবস পালিত হত। এখন হয় আরো জোরে সোরে, যদিও নিয়মিত শ্রমিকদের সংখ্যা এদেশে এখনো মোট শ্রমশক্তির শতকরা ১৫ ভাগের মতো। এই দিবসের প্রাক্কালে রাষ্ট্রপতি এবং প্রধানমন্ত্রী শুভেচ্ছা বার্তা জ্ঞাপন করেন। শ্রম মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রীও শুভেচ্ছা

www.pathagar.com

বার্তা জানিয়ে থাকেন শ্রমিকদের প্রতি। দেশের বিভিন্ন জায়গায় শ্রমিক সমাবেশ ঘটে এবং চিকাগোতে ১৮৮৬ সালের ১ মের নৃশংস ঘটনা স্মরণ করে নিজেদের সেই রক্তাক্ত সংগ্রামে অর্জিত বিজয়ে উল্লসিত হয়ে ওঠে। দেশের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় ঐ দিনের তাৎপর্য তুলে ধরে প্রবন্ধ-নিবন্ধ প্রকাশিত হয়। দেশের বিভিন্ন শিল্প সংস্থার শ্রমিকরা রঙ-বেরঙয়ের ফেস্টুন সহকারে, মাথায় লাল পট্টি বেঁধে মিছিল করে। আলোচনা-পর্যালোচনা-সমালোচনায় মুখর হয়ে মে দিবসকে ছুটির দিন হিসেবে সানন্দে পালন করে থাকেন। কোনো অভিযোগ না রেখে, নতুন কোনো দাবি উত্থাপন থেকে বিরত থেকে, পরস্পরের সাথে মিলিত হয়ে, ১ মে তে যে বিজয় অর্জিত হয়েছিল তা স্মরণ করে বিজয় দিবস হিসেবে পালন করে থাকেন মহানন্দে।

আজকের বিশ্বায়নের একালে বিভিন্ন দেশের মধ্যে দূরত্ব যখন হ্রাস পেয়েছে, এক দেশের পুঁজিপতিরা অন্যদেশে যখন বিনিয়োগে উদ্যত হয়েছে, প্রযুক্তি এবং ব্যবস্থাপনা যখন জাতি রাষ্ট্রের সীমানা ছাড়িয়ে বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়ছে, পণ্যের বাজার যখন বিশ্বময় বিস্তৃত হয়েছে, তখনো কিন্তু শ্রমের বাজার সীমিত রয়েছে জাতি রাষ্ট্রের চার সীমানার মধ্যে। শ্রমিকদের, বিশেষ করে উন্নয়নশীল ও স্বল্পোন্নত দেশের শ্রমিকদের ভাগ্যের পরিবর্তনের শত সম্ভাবনার দ্বার এখনো অবরুদ্ধ। এসব দেশের শ্রমিকদের অধিক কর্মক্ষম করার জন্যে কোনো সুষ্ঠু ব্যবস্থা এখনো গৃহীত হয়নি। নতুন নতুন প্রযুক্তি ব্যবহারের জন্যেও আমাদের শ্রমিকদের তেমন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা হয়নি। ভিন দেশে কাজ করার জন্যে যে মানসিক ও ভাষাগত দক্ষতার প্রয়োজন হয় তাও আমাদের শ্রমিকদের নিয়ন্ত্রণে নেই। মে দিবসের মতো গুরুত্বপূর্ণ দিবস পালনের সময়ে শ্রমিকরা এসব বিষয়ে ভাবনা-চিন্তা না করলেও জাতীয় স্বার্থে সমাজপতি ও রাজনৈতিক নেতৃত্বের দায়িত্ব হল শ্রমিকদের বহুমুখী প্রতিভার বিকাশ ঘটানোর শত বাতায়ন উন্মুক্ত করা।

পুঁজিপতির পুঁজি রয়েছে। ব্যবস্থাপক ও উদ্যোক্তাদের রয়েছে নিজস্ব মেধা। আজকের দিনের তথ্য প্রযুক্তির বৈপ্লবিক বিকাশের ফলে উদ্যোক্তাদের তথ্যের ভাণ্ডার পরিপূর্ণ হয়েছে। শ্রমিকদের কিন্তু রয়েছে বিশ্বজয়ী শ্রমের গৌরব। রয়েছে তাদের সকল অবস্থায় সকল প্রযুক্তিকে কাজে লাগাবার ক্ষমতা, যদি সেসব ক্ষেত্রে তারা অর্জন করতে পারে প্রশিক্ষিত মন। এটি তাদের একদিকে যেমন বিজয় অর্জনের মাধ্যম, অন্যদিকে তেমনি সুনির্দিষ্ট বিজয়ও। তাদের হাতগুলি যদি একবার কর্মীর হাতে রূপান্তরিত হয়ে ওঠে, তাহলে তারাই একদিন বিশ্বজয়ে সক্ষম হবেন। তারাই সকল সভ্যতার জনক। তারাই এক পর্যায় থেকে সভ্যতার স্তরকে ভিন্ন পর্যায়ে উত্তরণ ঘটিয়ে বিশ্বসভ্যতাকে মাথায় করে রেখেছে। দক্ষতা, আত্মবিশ্বাস, নৈপুণ্য ও সৃজনশীলতার আশীর্বাদ একবার তারা লাভ করলে সবকিছু তাদের হাতের মুঠোয় চলে আসতে পারে। সব সময় তারা জয়ী হয়েছেন। জয়ী হয়েছেন ১৮৮৬ সালের ১ মে তে। জয়ী হবেন মহাকালের যেকোনো অধ্যায়ে। আজকের দিনে, তাদের সকল সৃষ্টিতে আমরা যারা ভাগ বসিয়েছি, তাদের সার্বিক বিজয় কামনা করছি। ১ মে-এর বিজয় তাদের জীবনের পাথেয় হোক।

www.pathagar.com

নতুন বছরের এই দিনটিতে

ইংরেজ কবি টেনিসনের (Alfred Lord Tennyson) সেই কবিতাটির প্রথম ক'টি লাইন :

প্রিয়তমা মা আমাকে জাগিয়ে দিও।
খুব ভোরে জাগিয়ে দিতে ভুলো না যেন।
আগামীকাল আসছে সবচেয়ে সুখের দিন হয়ে,
আমার জীবনের সবচেয়ে সুখকর দিন।
সবচেয়ে সুন্দর নতুন বছরগুলির মধ্যে সুন্দরতম হয়ে,
পাগল করা দিন। আনন্দমুখর দিনটি।
আমি বসন্তের রানী হব যে।
মা আমি হব বসন্তের রানী
You must wake and call me early,
Call me early, mother dear;
Tomorrow `ill be the happiest time of
all the glad New year;
Of all the glad New Year, mother,
The madest, merriest day;
For I'm to be queen o'the May,
Mother I'm to be queen o'the May
The May queen

সেই ছোট্ট মেয়েটির চিরন্তন আকৃতি। স্বপ্ন পূরণের দিন আগামীকাল কোনোক্রমেই সে দেরিতে উঠতে চায় না। সে পেতে চায় সবকিছুকে পূর্ণ করে। প্রভাতের কুয়াশা ঘেরা হালকা আঁধার ছাপিয়ে যখন ভোরের আলো উঁকি দেবে, তাকেও পেতে চায় সে। পেতে চায় বসন্তের আগমনী মুখর সে মাসের ফুল ফোটানো প্রথম দিনটির কোমল স্পর্শ। কোনোক্রমে যদি তার ঘুম না ভাঙে, তাই মা'র নিকট এই আকুতি। কিছুতেই যেন সে উঠে সেই মধুর দিনটির সূচনালগ্ন থেকে বঞ্চিত না হয়। ইংল্যান্ডের সেই ছোট্ট মেয়েটির কামনা কি বাংলাদেশের শিশুদের বাসনা থেকে স্বতন্ত্র? স্বতন্ত্র কি ইরাকের মতো মরুদেশের শিশুটির কামনা? স্বতন্ত্র কি যুক্তরাষ্ট্র অথবা স্পেন অথবা অষ্ট্রেলিয়ার শিশুর বাসনা? শুভ নববর্ষের এই দিনটিকে পরিপূর্ণরূপে পেতে চায় এদেশের শিশুরাও। তাই এই দিনে সবার জন্য রইল শুভেচ্ছা।

www.pathagar.com

সবার জন্য প্রাণঢালা শুভ নববর্ষ। এই জনপদ জীবনের জয়গানে মুখর হয়ে উঠুক। সকল প্রতিবন্ধকতার জটিল জাল ছিন্ন করে জীবন জীবন্ত হয়ে উঠুক। প্রতিষ্ঠিত হোক বিশ্বময় সুষ্ঠু জীবনবোধ। এই দিনে তাই আমাদের কামনা ঃ সমাজের সকল স্তরে, ধনী-নির্ধন নির্বিশেষে, মানবতার বিজয় ঘোষিত হোক। মানবতার জয়গানই হোক শুভ নববর্ষের শ্লোগান। জীবন মানেই যে যুদ্ধ এবং এই যুদ্ধের কাঙ্ক্ষিত পরিণতি যে বিজয় তা যেন সবার অহঙ্কারে পরিণত হয়। এই হোক এই দিনের কামনা।

কিন্তু কামনা করলে কি হবে, যে পরিবেশে জীবন আজ ক্লান্ত, শ্রান্ত, নিঃশেষ প্রায়- শুধু এ দেশে কেন, আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে, বিশেষ করে মধ্যপ্রাচ্যে, ইরাকের সমগ্র ভূখণ্ড জুড়ে, সে পরিবেশও রয়েছে আজকে সবার স্মৃতিজুড়ে। পুরনো বছরটা শেষ হল বটে, কিন্তু শেষ হয়নি গত কয়েক দিনে সংঘটিত দানবীয় ঘটনাক্রমের দুঃসহ যন্ত্রণার রেশ। বৈশাখ এসেছে নিশ্চয়, কিন্তু চৈত্রের দাবদাহের চণ্ডতার অনুভব এখনও চারদিককে পুড়িয়ে খাক করে রেখেছে। চারপাশে যেসব হিংস্র হায়েনা প্রশান্ত জীবনের মাংস-মেদকে খুবলে খুবলে রক্তাক্ত করছে, তাদের আস্ফালন এখনও থামেনি। এখনও তাদের পৈশাচিক উল্লাসে চারদিক থমথমে। পয়লা বৈশাখ তাই সেই চিরন্তন প্রশ্ন নিয়েই উপস্থিত হয়েছে এ দেশে। কীভাবে জীবন জীবন্ত থাকবে ? কীভাবে মানুষ পৌঁছুবে তার চূড়ান্ত গন্তব্যে?

যে ইংল্যান্ডের কবি টেনিসনের কবিতায় সেই ছোট্ট শিশুটির বসন্তের রানী হওয়ার স্বপ্ন বাস্তবায়িত হবে আগামীকাল, সেই দেশের প্রধান নির্বাহী টনি ব্লেয়ার একুশ শতকের প্রারম্ভে একই সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার বহনকারী জনপদ যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লিউ বুশের সাথে ষড়যন্ত্র করে ইরাকের মতো প্রাচীন সভ্যতার অন্যতম পীঠস্থানে আগামীকাল শিশুদের জন্য কোন স্বপ্ন উপহার দিচ্ছেন? মৃত্যু সব সময় ভয়ঙ্কর, কিন্তু উন্নততর আধুনিক প্রযুক্তি প্রয়োগ করে বিশ্বের সবচেয়ে বেশি ক্ষমতাশালী রাষ্ট্রগুলো যেসব ভীষণ মারাত্মক মারণাস্ত্র তৈরি করছে এবং পরের দেশ ও দেশের সম্পদ অপহরণের জন্য সেসব মারণাস্ত্র ব্যবহার করে যেভাবে আগ্রাসন পরিচালনা করছে তার ফলে মৃত্যু আরও ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে। কেউ কেউ প্রাণে বেঁচে যাচ্ছে বটে, কিন্তু সেই বেঁচে থাকা মৃত্যুর চেয়েও মর্মন্তুদ। পঙ্গুত্ব বরণ করে, আহত হওয়ার মুহূর্তে অমানবিক আক্রমণকে স্মরণ করে প্রতিমুহূর্তে বেঁচে থেকেও সে মৃত্যু কামনা করে চলে। আর এসব নির্মম আগ্রাসনে সমাজের সবচেয়ে অসহায় যে অংশ অর্থাৎ শিশু, নারী, বয়সের ভারে নূয়ে পড়া বৃদ্ধ-বৃদ্ধা অথবা প্রতিবন্ধীরা তারাই হয় মানব-সৃষ্ট নারকীয় যন্ত্রণার শিকার। ইরাকেও তাই হয়েছে। টেলিভিশনে যেটুকু দেখেছি এবং পত্র-পত্রিকায় যেটুকু জেনেছি তাতে মনে হয়েছে, বিশ্বের একমাত্র পরাশক্তি যুক্তরাষ্ট্র এবং বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ শক্তি যুক্তরাজ্যের নেতৃত্বে জোট শক্তির যে অবৈধ আগ্রাসন ইরাককে পর্যুদস্ত করেছে, তাতে মানবতা হয়েছে লাঞ্ছিত। সভ্যতার প্রত্যেকটি সূত্র হয়েছে ছিন্নভিন্ন। আগামী প্রজন্মের কাছ থেকে এই ভয়াবহ এবং অনৈতিক মধ্যযুগীয় নিষ্ঠুরতা কেড়ে নিয়েছে সব স্বপ্ন। টেনিসন বেঁচে থাকলে সেই ছোট্ট মেয়েটির ভাবনাকে কীভাবে চিত্রিত করতেন আজ? কীভাবে তার স্বপ্ন ভঙ্গকে উপস্থাপিত করতেন? বুশ-ব্লেয়াররা তা কখনও ভেবে দেখবেন না, কেননা তারা তো ক্ষমতার অধিকারী। তাদের রয়েছে

www.pathagar.com

দুর্দমনীয় ক্ষমতা। আর ক্ষমতার থাকে এক ধরনের স্পর্ধা। এক প্রকার ঔদ্ধত্য। এক ধরনের দুর্বিনীত আস্ফালন। স্পর্ধা বা ঔদ্ধত্যের ঘন আস্তরণ অতিক্রম করে মানবিক কোনো অনুভূতির কাছাকাছি হওয়া তাদের পক্ষে সম্ভব হবে কেন? তাই তো আমাদের রবীন্দ্রনাথ বৈশাখকে আহ্বান জানিয়েছেন তার গেরুয়া বস্ত্রাঞ্চল দ্বারা ঐসব হিংস্র হায়েনা-শ্বাপদদের ঢেকে দিতে।

কবি লিখেছেন :

তোমার গেরুয়া বস্ত্রাঞ্চল
দাও পাতি নভস্থলে বিশাল বৈরাগ্যে আবরিয়া
জরা মৃত্যু ক্ষুধা তৃষ্ণা। লক্ষ কোটি নরনারী হিয়া
চিন্তায় বিকল –
দাও পাতি গেরুয়া অঞ্চল।

বাংলাদেশের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম সম্ভবত এমনি পরিস্থিতিতে সবাইকে পথের দিশা দিয়ে লিখেছেন :

চারিদিকে এই গুণ্ডা এবং বদমায়েশির আখড়া দিয়ে
রে অগ্রদূত চলতে কি তুই পারবি
আপন প্রাণ বাঁচিয়ে?
পারবি যেতে ভেদ করে এই বক্রপথের চক্রব্যূহ?
উঠবি কি তুই পাষাণ ফুঁড়ে বনস্পতি মহীরুহ?

চিরন্তনী এসব প্রশ্ন নিয়ে বাংলাদেশে এবার বৈশাখ এসেছে। ডাক দিয়েছে সকলকে নিজেদের স্বাতন্ত্র্যের মূলধনকে সচল করে জীবন যুদ্ধে জয়লাভের প্রেরণার ডালা সাজিয়ে। এবারও পয়লা বৈশাখ এসেছে নববর্ষের শুভ বার্তা বহন করে। কিন্তু যাদের কাছে তা শুভ সংকেত হওয়ার কথা, চৈত্রের দাবদাহের স্মৃতি তারা ভোলেননি এখনও। বৈশাখকে আবাহন করছেন বটে, কিন্তু বছরব্যাপী যন্ত্রণার অনুভূতি নিয়ে। নববর্ষে তারাও মিষ্টি মুখ করেছেন, করভারের লোনা আস্বাদ বুকে চেপেই। কারও কারও কাছে পুণ্যার্হ-এর স্বাদ বড় তিক্ত। তাদের কথা স্মরণ করেই খুব সম্ভব কাজী নজরুল ইসলাম লিখেছেন :

হীরা মানিক চাস্‌নি ক'তুই,
চাস্‌নি তো মতিচুর,
একটি ক্ষুদ্র মৃৎপাত্র
ভরা অভাব তার।
চাইলি রে ঘুম শ্রান্তিহরা
একটি ছিন্ন যাদুর-ভারা
একটি প্রদীপ-আলো করা
একটু কুটির দোর।

যারা রমনা বটমূলে উচ্ছ্বাসভরে বাংলা নববর্ষ উদযাপন করে থাকেন তাদের চোখে কি এই হতভাগ্যদের ছবি কখনও ভেসে ওঠে? দেশের প্রতাপান্বিত নীতিক-নির্ধারকদের কাছে কি গ্রাম-বাংলার প্রতিদিনের পান্তাভাত গ্রহণকারীদের কথা মনে পড়ে?

www.pathagar.com

নতুন বছরে প্রত্যাশা

দু'হাজার তিন সালের সমাপ্তি ঘটেছে, কিন্তু তার জ্বালায় জ্বলছে এখনো বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে কোটি কোটি মানুষের নিরাপত্তাবোধ। সন্ত্রাসের কালো ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন বিশ্বের বৃহত্তম অংশ। পাশব শক্তির দুর্গন্ধময় আবহে নৈতিকতা এখনো ছটফট করছে। মানবতার বাণী নীরবে নিভৃতে অশ্রুসিক্ত নয়নে মুখ লুকিয়ে রয়েছে। দু'হাজার চার সাল কি পারবে এই অশান্ত বিশ্বে শান্তির প্রলেপ লাগাতে? পারবে কি অনৈতিকতার কণ্ঠরোধ করতে? নিরাপত্তাহীনতার শেকড় উপড়ে ফেলতে? মানবতাবোধের স্নিগ্ধ আবহে বিশ্বমানবের অনুভূতিগুলিকে সঞ্জীবিত করতে? কথাগুলি বলছি এজন্যে যে যারা দু'হাজার তিন ব্যাপী বিশ্বময় যে পাশব শক্তির নির্মম দাপটের আস্ফালন দেখেছে তা যেমন অনাকাঙ্ক্ষিত, তেমনি ভীতিপ্রদ। অনাকাঙ্ক্ষিত এজন্যে যে মানব সভ্যতার প্রধানতম গতিসূত্র (dynamics) রূপে যুক্তি যেভাবে শক্তির ওপর প্রভাব বিস্তার করে আসছিল তা থমকে দাঁড়িয়েছে যেন। সভ্য মানুষ এ কারণেই এত ভীত-সন্ত্রস্ত হয়েছে। সভ্যতার গতি সম্পর্কে সন্দিহান হয়ে পড়ছে।

আমি বিশ্বের একমাত্র পরাশক্তি যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষমতার দাপটের কথা বলছি। বলছি বিশ্বের অন্যতম বৃহৎশক্তি ব্রিটেনের ভূমিকার কথা। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আজ যে অনিশ্চয়তা ঘন কালো মেঘের মতো চারদিককে আচ্ছন্ন করে রেখেছে তার সূচনা হয় দু'হাজার তিনের প্রারম্ভেই। সূচনা করেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লিউ বুশ এবং যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী টনি ব্লেয়ারের নেতৃত্বে মিত্রশক্তি, ইরাকের মতো একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রকে জোরপূর্বক দখল করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে এমন ঘটনা ঘটেছে প্রচুর। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে এ ধরনের ঘটনা ছিল স্বাভাবিক। কিন্তু বিশ শতকের প্রথম থেকেই আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নতুন এক ধারার সূচনা হয়। জোরের যুক্তির পরিবর্তে শক্তিশালী হয়ে ওঠে যুক্তির জোর। রাষ্ট্রীয় পরিচালনার ক্ষেত্রে প্রাধান্য লাভ করে জনমত। ব্যক্তির প্রাধান্য ম্লান হয়ে আসে আইন ও বিধি-বিধানের প্রাধান্যের নিকট। ব্যক্তির অধিকার স্বীকৃত হতে থাকে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে শান্তি রক্ষার প্রয়াস গৃহীত হতে থাকে। সৃষ্টি হয় জাতিপুঞ্জ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে। জাতিসংঘ তার বহুমুখী প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোসহ আবির্ভূত হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে। বলদর্পী ঔপনিবেশিক শক্তির কবল থেকে একে একে মুক্ত হয় বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে জবর দখল করা উপনিবেশগুলি। মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে শুরু করে তারা স্বাধীন-সার্বভৌম রাজনৈতিক এককরূপে। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা স্বীকৃত হয় আদর্শ রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনার মাধ্যমরূপে। তখনো যুদ্ধ হয়েছে বটে, কিন্তু ঐসব সংঘটিত হয় জাতীয় মুক্তির লক্ষ্যে। চিহ্নিত হয় মুক্তি সংগ্রামরূপে। যুক্তরাষ্ট্রের কৃতী প্রেসিডেন্ট উড্রো উইলসন প্রথম বিশ্বযুদ্ধের

www.pathagar.com

শেষলগ্নে যুক্তরাষ্ট্রের যোগদানের পূর্বে কংগ্রেসে যে বক্তৃতা দিয়েছিলেন তাতেই প্রতিফলিত হয় এই পরিবর্তনের ধারা। তিনি বলেছিলেন : "আমরা চূড়ান্ত পর্যায়ে বিশ্বশান্তি ও জনগণের মুক্তির জন্যে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়ে খুশি হয়েছি। আমরা যুদ্ধ করছি ছোট ও বড় সকল জাতির অধিকারের জন্যে। আমরা যুদ্ধ করছি সর্বস্থানের জনগণের নিজস্ব জীবন ব্যবস্থা বাছাই-এর সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করতে। গণতন্ত্রের জন্যে বিশ্বকে নিরাপদ করতে হবে। রাজনৈতিক স্বাধীনতার পরীক্ষিত ভিত্তির ওপর শান্তিকে প্রোথিত করতে হবে।" ["We are glad to fight thus for the ultimate peace of the world and for the liberation of its peoples; for the rights of nations, great or small and the privilege of men everywhere to choose their way of life and of obedience, The world must be made safe for democracy, Its peace must be planted upon the tested foundations of political liberty."]।

উদ্রো উইলসনের বক্তব্যের সাথে সেই যুক্তরাষ্ট্রের বর্তমান প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশের আফগানিস্তানে তালিবান ও আল কায়েদা সংগঠনের নেতৃবন্দের প্রতি মৃত্যুবান নিক্ষেপে পূর্বের Justice Infinite কর্মসূচির তুলনামূলক পর্যালোচনা করুন, অথবা ইরাক আক্রমণের পূর্বে যুক্তরাষ্ট্রের চরমপত্রের মূল বক্তব্যের তুলনা করুন, দেখবেন জর্জ ওয়াশিংটন, ম্যাডিসন, জেফারসন, আব্রাহাম লিংকন বা উইলসনরা যুক্তরাষ্ট্রে নেতৃত্বের যে উচ্চমাত্রা বিনির্মাণ করেছিলেন জর্জ বুশের নেতৃত্বের মান সে তুলনায় কত নিম্ন পর্যায়ের। জর্জ বুশের নেতৃত্বে যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্ব যে কোন পর্যায়ে উপনীত হয়েছে তা জানার জন্যে ২০০৩ সালে এ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের বার্ষিক প্রতিবেদনের কয়েকটি পৃষ্ঠা উল্টালেই চলবে। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, "যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে পরিচালিত সন্ত্রাসবাদ বিরোধী যুদ্ধ বিশ্বকে নিরাপদ স্থানে পরিণত করার পরিবর্তে করে তুলেছে অনেকটা বাসের অযোগ্য। মানবাধিকার লঙ্ঘন এবং আন্তর্জাতিক আইনের ভিত্তিমূল শিথিল করে বিশ্বকে বসবাসের জন্যে আরো বিপজ্জনক করে তুলেছে। বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে সৃষ্টি হয়েছে অমানবিক ও অবমাননাকর অবস্থা।"

যে যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে দীর্ঘ চার দশকব্যাপী স্নায়ুযুদ্ধের কালে এবং স্নায়ুযুদ্ধোত্তরকালে মানবাধিকার লঙ্ঘন, নির্যাতন, বিনা বিচারে আটক, পক্ষপাতিত্বমূলক বিচার, বিরোধী দল বা গ্রুপের পীড়নের বিরুদ্ধে বিশ্বব্যাপী এক আন্দোলনের সৃষ্টি হয় তার পরিবর্তে বুশ-ব্লেয়ারের ইরাক দখলের পরে, এমনকি তার পূর্বে আফগানিস্তান দখলের পরে সৃষ্টি হয়েছে ভিন্ন এক অবস্থা। এই অবস্থা অনাকাঙ্ক্ষিত। এই অবস্থা সভ্যতা বিরোধী। এই অবস্থা মানবতা বিরোধী। এই প্রতিবেদনের সমর্থন মিলে The Atlantic Monthly পত্রিকার সম্পাদক মাইকেল কেলির বক্তব্যে। তিনি লিখেছিলেন : "বর্তমান বিশ্বের সবচেয়ে বড় সন্ত্রাসী রাষ্ট্র হল যুক্তরাষ্ট্র" ("The USA is now the world's leading rogue state.") অথচ এই যুক্তরাষ্ট্রই ছিল বিশ্বময় গণতান্ত্রিক চিন্তাভাবনা, গণতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থা, নাগরিকদের মৌলিক অধিকার, সুশাসন ও স্বশাসনের যোগ্যতম প্রবক্তা। যে জাতিসংঘ গত অর্ধশতাব্দী ধরে বিশ্বময় শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষায় এক

www.pathagar.com

ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করছিল তা নিঃশেষ হয়েছে। অপছন্দের শাসককে সরিয়ে দেবার লক্ষ্যে আগেভাগে আক্রমণ পরিচালনার (Pre-emptive attack for regime change) যে দৃষ্টান্ত বিশ্বের একমাত্র পরাশক্তি স্থাপন করেছে দু'হাজার তিনে তা শুধু আফগানিস্তান ও ইরাকে জনগণের দুর্দশা সীমাহীন করেছে তাই নয়, বিশ্বের প্রায় ১৫০টির মতো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রকে করেছে ভীত-সন্ত্রস্ত। ফিলিস্তিনী জনগণকে প্রত্যেক মুহূর্তে মৃত্যুর মুখোমুখি টেনে এনেছে। ধর্মীয় ভিন্নতা ও নৃতাত্ত্বিক ভিন্নতা আজ রক্তক্ষয়ী সংঘাতের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছে। নিরাপত্তার নামে রাজনীতি, বাণিজ্য ও মানবাধিকার কলঙ্কিত হয়েছে।

যে বিশ্বের এক-তৃতীয়াংশ মানব গোষ্ঠীর নিরাপত্তা যে কারণে প্রতিনিয়ত বিঘ্নিত হচ্ছে সেই সব কারণ দূর করার জন্যে তাদের কোনো মাথাব্যথা নেই। দারিদ্র্য, নিপীড়ন, দুর্নীতি, ব্যাধি-অপুষ্টির আঘাতে প্রতিদিন যে হাজার হাজার মানুষ নিশ্চিহ্ন হচ্ছে সে সম্পর্কে তাদের কোনো ভাবনা নেই। বিশ্বায়নের বাতাবরণে তারা অতীতের সেই নগ্ন ঔপনিবেশিকতার সূত্রগুলি সুকৌশলে নাড়াচাড়া করছে। ক্ষমতাই যে সবকিছু, ক্ষমতার মানদণ্ডেই যে সব নীতি-নৈতিকতা সুনির্দিষ্ট হয়, মানবাধিকার বা সুশাসনের কথা বা স্বশাসনের আত্মবিশ্বাস যে ক্ষমতার নিকট অত্যন্ত গৌণ তা আজকের পরাশক্তি ও তার ওপর নির্ভরশীল কিছু কিছু প্রধান শক্তির কার্যক্রমে তা সুস্পষ্ট হচ্ছে এবং দু'হাজার তিন সাল তার প্রধান সাক্ষী।

ইরাক দখলের পূর্বে একটি স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি সাদ্দাম হোসেনকে যেভাবে ইরাক ছেড়ে চলে যেতে বলা হয়েছিল অথবা ইরাকি জনগণের মুক্তির দোহাই দিয়ে জনগণকে অমানবিক নির্যাতন করা হল অথবা প্রাচীন সভ্যতার অন্যতম পীঠস্থান ইরাকের ইতিহাস-ঐতিহ্যের নিদর্শনগুলি লুটপাট করে যে ধ্বংসলীলার অবতারণা করা হল তার কোনো একটি সভ্য দুনিয়ায় গ্রহণযোগ্য নয়। সাদ্দাম হোসেন ধরা পড়লে খাঁচায় বন্দী কোনো প্রাণীকে যেমনভাবে পরীক্ষা করা হয় ঠিক তেমনি অত্যন্ত সচেতনভাবে, জেনেশুনে, বিশ্বময় প্রচারের লক্ষ্যে অমানবিকভাবে তার মুখের পরীক্ষা করা হয়েছে। তার দাড়ি কামানো হয়েছে। উদ্দেশ্য একটাই। পরাজিত শত্রুকে সর্বসাধারণের চোখে হেয় প্রমাণ করে নিজেদের দাপটকে আকাশছোঁয়া করা। কিন্তু সভ্য দুনিয়ায় কি এই রীতি চলে? চলে না। এই উপমহাদেশে প্রায় আড়াই হাজার বছর পূর্বে সভ্য গ্রীসের দিগ্বিজয়ী মহাবীর আলেকজান্ডার পাঞ্জাব-রাজন্য পরাজিত পুরুকে যখন জিজ্ঞাসা করেছিলেন, আপনি আমার নিকট থেকে কেমন ব্যবহার আশা করেন? সভ্য ভারতের সুসভ্য রাজা পুরুর উত্তর ছিল : একজন রাজার প্রতি আর একজন রাজা যে ব্যবহার করে থাকেন ঠিক তেমনি। আলেকজান্ডার পুরুর সাথে তেমনি ব্যবহার করেছিলেন। জর্জ বুশ বা তার কর্মচারীদের নিকট থেকে অবশ্য সাদ্দাম হোসেন কেন, বিশ্বের কেউ তেমন সভ্য আচরণ আশা করেন না।

একমাত্র পরাশক্তি যুক্তরাষ্ট্রের এ ধরনের পাশব শক্তি প্রদর্শনের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া বিশ্বময় বিস্তৃত হয়েছে। আশঙ্কা করা হচ্ছে, আফগানিস্তান ও ইরাক থেকে এই নোংরা ক্ষমতার খেলাটি বা ক্ষমতাকেন্দ্রিক আস্ফালন বিস্তৃত হতে পারে মধ্যপ্রাচ্যের বিস্তীর্ণ অঙ্গনে।

www.pathagar.com

ফিলিস্তিনিদের ঘর জ্বলছে। ইসরাইলী প্রধানমন্ত্রী এরিয়েল শ্যারন, যিনি নিজভূমিতেই চিহ্নিত একজন রক্তপিপাসু, নির্মম এবং গণহত্যায় পারদর্শী রাজনৈতিক নেতা হিসেবে, আখ্যায়িত হয়েছেন প্রেসিডেন্ট বুশ কর্তৃক "শান্তির দূত" রূপে। জনগণের নির্বাচিত ফিলিস্তিনি নেতা ইয়াসির আরাফাত যেহেতু এরিয়েল শ্যারনের অপছন্দের লোক তাই জর্জ বুশ ও তার সাঙ্গপাঙ্গরাও তার সাথে কোনো রকম যোগাযোগ রাখতে আগ্রহী নন। ফিলিস্তিনি জননেতারূপে তাকে স্বীকৃতি দিতেও রাজি নন। দু'হাজার তিন সাল পর্যন্ত তিনি কোনো রকমে বেঁচে রয়েছেন বটে, কিন্তু যেকোনো সময়ে নিহত হলেও কেউ অবাক হবেন না। সেই এরিয়েল শ্যারনের ইসরাইল সম্প্রতি ভারতের সাথে ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। ইসরাইলি মোশাদ বাহিনী ভারতীয় র'-এর সাথে হাত ধরাধরি করে কাজ করে চলেছে। ধৃত সাদ্দাম হোসেনের প্রহসনমূলক বিচারের ব্যবস্থাও পাকাপোক্ত হচ্ছে। সব মিলিয়ে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে দু'হাজার তিন সালের সমগ্র বিশ্ব অবাক বিস্ময়ে লক্ষ্য করেছে শক্তিমত্তার নির্লজ্জ আস্ফালন। আন্তর্জাতিক বিধি-বিধানের অপমৃত্যু, নীতি-নৈতিকতার অসহায়ত্ব, পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধের নির্মম হত্যাকাণ্ড। যে মিথ্যা অভিযোগে ইরাকের জবর দখল সম্পন্ন হয়েছে বিশ্বের একমাত্র পরাশক্তি কর্তৃক, সেই গণবিধ্বংসী অস্ত্র ইসরাইলের হাতে থাকলেও তা কোনোক্রমে আপত্তিকর নয়, যেমন আপত্তিকর নয় সেই ধরনের অস্ত্র ফ্রান্স বা ব্রিটেনের অস্ত্রাগারে। উত্তর কোরিয়ার নিয়ন্ত্রণে তা থাকলেও তা তেমন মারাত্মক কিছু নয়। মারাত্মক শুধুমাত্র কোনো মুসলিম রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণাধীন গণবিধ্বংসী অস্ত্র।

একমাত্র পরাশক্তি যুক্তরাষ্ট্র এবং বৃহৎ শক্তি ব্রিটেনের রাজনৈতিক নেতৃত্বের এই অবিমৃষ্যকারিতা শুধু ইরাক দখলেই সীমিত থাকছে না। সীমিত থাকছে না ইসরাইলের প্রকাশ্য গণহত্যায়। সীমিত থাকবে না ইসরাইলের মাধ্যমে দক্ষিণ এশিয়ায় ভারতকে সংশ্লিষ্ট করে নতুন এক অক্ষশক্তি নির্মাণেও অথবা আফগানিস্তানে স্থায়ী অবস্থানের মধ্যদিয়ে সমগ্র মধ্য এশিয়ায় ভারতকে সংশ্লিষ্ট করে নতুন এক ক্ষমতা ব্যূহ বিনির্মাণেও। আশঙ্কা করা হচ্ছে, সমগ্র একুশ শতকব্যাপী পরাশক্তিরূপে অবস্থানকে স্থায়িত্ব করার লক্ষ্যে বিশ্বের সকল গুরুত্বপূর্ণ কৌশলগত অবস্থানে নিজেদের অপ্রতিদ্বন্দ্বী রাখার মানসে যুক্তরাষ্ট্র সব কিছুর জন্যেই তৈরি। গণতন্ত্রের কোনো নীতিমালা তাদের পথ রুদ্ধ করতে সক্ষম নয়। সক্ষম নয় মানবাধিকার বা বিশ্ব জনমতের কোনো ইচ্ছা-অনিচ্ছা তাদের পথ রোধ করতে। নীতি-নৈতিকতার মৃদুমন্দ হাওয়া এক্ষেত্রে অসহায়। অসহায় যুক্তিবাদিতা অথবা সততার সকল প্রতিবন্ধক। ক্ষমতার রাজনীতিকে সফল করতে তারা সকল পদক্ষেপ গ্রহণে আগ্রহী। মৌলবাদের ধুম্রজাল সৃষ্টি করে, প্রয়োজন হলে প্রতিদ্বন্দ্বীদের ধর্ম বিশ্বাসকে সন্ত্রাসের সাথে ব্র্যাকেট করে, অন্য জনপদে চাপ দিয়ে হলেও মৌলবাদ নিয়ন্ত্রণের অজুহাত খাড়া করে তারা চায় নিজেদের আধিপত্যের সূত্রগুলিকে সুদৃঢ় করতে। দু'হাজার তিন সাল ক্ষমতাশালীদের এই অরুচিকর প্রবণতা লক্ষ্য করেছে। পারবে কি নতুন বছর এর মোড় ঘোরাতে? বিশ্বময় এই ক্ষমতাশ্রয়ী বদ্ধ প্রকোষ্ঠে নতুন বছর পারবে কি শান্তির উদার হাওয়ায় নির্মল পরিবেশ সৃষ্টি করতে? পারবে কি নতুন বছর দু'হাজার তিন সালের দু'মুখ বন্ধ করা অন্ধকার গুহায় আলোর

www.pathagar.com

রশ্মি সৃষ্টি করতে? সন্ত্রাসকে আমরা সবাই ঘৃণা করি, কিন্তু সন্ত্রাস দলনের নামে, নিছক স্বার্থসিদ্ধির লক্ষ্যে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের যে মহড়া রচনা করেছে বৃহৎ রাষ্ট্রসমূহ তা অনেক বেশি ঘৃণ্য। নতুন বছরে বিশ্বমানব এই অভিশাপ থেকে মুক্তি লাভ করবে কি? এমনি হাজারো প্রশ্নের ভিড়ে মনটা অশান্ত হয়ে পড়ে নতুন বছরের এই শুভ সূচনালগ্নে।

ইউনেস্কোর (UNESCO) সংবিধানে লিখিত হয়েছে : "যেহেতু মানব মনেই যুদ্ধের সূচনা হয়ে থাকে তাই মানব মনেই শান্তি সংরক্ষণের চেতনা দৃঢ়তর করতে হবে।" ["Since wars begin in the minds of men, it is in the minds of men that the defences of peace must be constructed."]। সত্যি বটে, যুদ্ধ বা সন্ত্রাসের জন্ম হয় মনে, এবং শান্তির জন্যে মানসিক প্রস্তুতি সম্পূর্ণ না হলে যুদ্ধ বা সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে অলঙ্ঘনীয় দেয়াল তোলা সম্ভব হয় না। কিন্তু জাতীয় পর্যায়ে হোক আর আঞ্চলিক অথবা আন্তর্জাতিক পর্যায়ে হোক, ক্ষমতার প্রতি অদম্য আকর্ষণ সৃষ্টি হলে অথবা প্রভাব-প্রতিপত্তিতে অপ্রতিদ্বন্দ্বী হবার লক্ষ্যে সংকল্পবদ্ধ হলে শান্তির বাণী মুখ লুকোয় অন্ধকারে। হারায় তার গতি আর ক্ষমতাপ্রীতি হয়ে ওঠে বিশ্বজয়ী। এর জবাব তখন হয়ে ওঠে শুধু ক্ষমতা এবং ক্ষমতার প্রভাব। সেই বিশ্বে নৈতিকতার কোনো স্থান নেই। নেই কোনো স্থান যুক্তিবাদিতার। এই প্রেক্ষাপটে অধ্যাপক হাচিনসের (Robert Maynard Hutchins) কথাগুলি অত্যন্ত অর্থপূর্ণ। ১৯৪৫ সালে চিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের দিকে দৃষ্টি দিয়ে সমাবর্তন বক্তৃতায় তিনি বলেছিলেন : " যে বিশ্বে তোমরা প্রবেশ করতে যাচ্ছ তার সবচেয়ে হতাশাব্যঞ্জক দিক হল সব যুগের মৌল বিষয় সম্পর্কে অর্থাৎ নৈতিকতা সম্পর্কে উদাসীনতা।" ["The most distressing aspect of the world into which you are going is its indifference to the basic issues, which now, as always, are moral issues."] বিশ শতকের চল্লিশের দশক আর একুশ শতকের প্রথম দশকের মধ্যে তাই নেই কোনো পার্থক্য, নেই কোনো ভিন্নতা। চল্লিশ দশকের পরে বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ক্ষমতার ক্ষেত্রে ভারসাম্য প্রতিষ্ঠিত হয়ে। আজকের একমাত্র পরাশক্তির বিশ্বে তেমন ভারসাম্য রচিত না হলে শান্তির আশাও হয়ত সুদূরপরাহত। দেখা যাক নতুন বছরে এর কোনো সূচনা হয় কি না!

www.pathagar.com

পহেলা বৈশাখের মিলন মেলা

পহেলা বৈশাখ এই জাতির নিজস্ব সম্পদ। জাতির নিজস্ব উৎসব। আমাদের জাতীয় উৎসব। ২৬ মার্চ এবং ১৬ ডিসেম্বরের মতোই পহেলা বৈশাখকে আমরা উদযাপন করি জাতীয়ভাবে। ধর্ম-বর্ণ-সম্প্রদায় নির্বিশেষে। মুসলমান হিসেবে ঈদুল ফিতর এবং ঈদুল আজহাকে যেভাবে আমরা গ্রহণ করি, অনুজ তুল্য নিমচন্দ্র ভৌমিক ঠিক তেমনিভাবে গ্রহণ করেন তাদের শারদীয়া দূর্গা পূজাকে। বন্ধু রোজারিও যেমন পালন করে থাকেন যীশু খৃষ্টের জন্মদিন ২৫ ডিসেম্বর বা বড়দিনকে, তেমনি আন্তরিকভাবে পালন করে থাকেন সন্তান তুল্য রবীন্দ্রলাল চাকমা বৌদ্ধ পুর্ণিমাকে। পহেলা বৈশাখ কিন্তু সবাইকে একসূত্রে গেঁথে জড়ো করে এক বটবৃক্ষের নিচে, পরম প্রশান্তি ভরা স্বস্তিতে। সকল প্রকার সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে তুলে, সব সংস্কারের জাল ছিন্ন করে, সবাইকে এক স্বর্ণসূত্রে গ্রথিত করে পহেলা বৈশাখ সকলকে কাছে টানে। বাংলা নববর্ষের মহিমা এমনি।

সমাজ জীবনে ধর্মীয় চেতনার পাশাপাশি জাতীয় চেতনা সমান্তরালভাবে প্রবাহিত হয়ে চলে অনেকটা তেল ও পানির মতো। এক সাথে থেকেও এক ও অভিন্ন হয় না। মিলে-মিশে এক হয়ে যায় না। প্রত্যেক সমাজে তাই দেখা গেছে, ধর্মভিত্তিক বিভাজন সত্ত্বেও জাতীয়তার সর্বগ্রাসী প্রভাবে বিভিন্ন ধর্মের, বিভিন্ন বর্ণের, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ব্যক্তিবর্গ এক পংক্তিতে দাঁড়িয়ে একাত্মতা অনুভব করে। জাতীয় স্বার্থের তীর ঘেঁষে সবাই এক হয়ে বিনির্মাণ করে জাতীয় জীবনের অন্তরঙ্গ একত্ব। সুদৃঢ় হয় জাতীয় ঐক্য। এই প্রক্রিয়া কিন্তু আপনা আপনি কার্যকর হয় না। সমাজ জীবনের কিছু কিছু উপাদান এই মিলনক্ষেত্র রচনা করে। জনগণের ভাষা, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, সমজাতীয় জীবনবোধ, বিশেষ করে অন্যদের থেকে নিজেদের স্বতন্ত্র ভাবধারা ও স্বাতন্ত্র্য–এসবই হল এই ঐক্য প্রতিষ্ঠার মাধ্যম। আমাদের দেশে জনমনে সংস্কৃতির পেলব প্রভাব যেভাবে সমাজব্যাপী এক ঐক্যানুভূতি সৃষ্টি করেছে তার প্রতিফলন ঘটেছে পহেলা বৈশাখের হৃদয়গ্রাহী আবেদনে। তাই পহেলা বৈশাখের তীর ঘেঁষে এদেশে সৃষ্টি হয়েছে ঐকমত্যের এক স্রোতস্বিনী। এই স্রোতস্বিনী আরো বেগবতী ও খরস্রোতা হলে কালে ধর্মকেন্দ্রিক সম্প্রদায়গুলির মিলনের পথও প্রশস্ত হবে। তাই পহেলা বৈশাখের উৎসবকে জাতীয় পর্যায়ে আরো প্রাণবন্ত করে তোলার প্রয়োজন রয়েছে এদেশে।

পহেলা বৈশাখের আবেদন এই সমাজে আরো একটি কারণে প্রবল এবং তা হল গ্রামীণ জীবন থেকে পহেলা বৈশাখের জাতীয় পর্যায়ে উত্তরণ। পহেলা বৈশাখ এ সমাজে গ্রামেই পালিত হত প্রথমে। কৃষি সভ্যতায় লালিত মানুষের কাজকর্মের সিংহভাগ সম্পন্ন হয়েছে কৃষিকাজের নানা প্রকরণের সাথে মিলে-মিশে। কীভাবে, কখন, কোন প্রক্রিয়ায় ভূমি কর্ষণ করলে ভালো ফসল লাভ করা যায়, কখন ফসলহানির সম্ভাবনা

www.pathagar.com

দেখা দেয়, কীভাবে খরা, অতিবৃষ্টি, জলোচ্ছ্বাস, কাল বৈশাখী, ঘূর্ণিবাত্যা, শিলাবৃষ্টির প্রভাবে জনজীবন অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে এ বিষয়ে গ্রামীণ জনসাধারণের রয়েছে প্রত্যক্ষ পরিচিতি। ফসল উঠলে এবং সুফসলের মরশুম এলে গ্রামীণ জীবনে নেমে আসে আনন্দের ঝর্ণাধারা। এই দুই-এ মিলে যে জীবনের মিথস্ক্রিয়া, গ্রামই তা ভালো করে চেনে। চেনে বলেই গ্রামীণ জীবনের অভিজ্ঞতা প্রকাশিত হয়ে থাকে ছোটখাটো আনন্দ মেলায়, ছোটখাটো পার্বণে, কোনো কোনো আচার-অনুষ্ঠানে। চৈত্রের খরতাপে দগ্ধ মেদিনী কিছুটা স্নিগ্ধ হয় বৈশাখের প্রথম ঝড়ের সাথে প্রথম বর্ষণে। এই বৃষ্টি গ্রামীণ জনগণের নিকট যেমন এক নতুন অভিজ্ঞতা, তেমনি এক প্রত্যাশা। এই প্রত্যাশার আংশিক পূর্ণতার রূপ বৈশাখী মেলা। এই মেলায় নগর সভ্যতার চাকচিক্য ভরা হাজারো পণ্য মেলে না। মেলে গ্রামীণ জীবনের প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী। তাই এসব মেলায় প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রী কেনার যেমন আনন্দ থাকে, তেমনি থাকে পরস্পরের মেলামেশার সুযোগ, ভাবের আদান-প্রদানের সম্ভাবনা। সর্বোপরি সবার সাথে মিলেমিশে কিছুক্ষণ কাটাবার অন্তরঙ্গ পরিবেশ।

গ্রামীণ জীবন থেকে এখন বৈশাখী মেলার বিস্তৃতি ঘটেছে শহরে-নগরে-মহানগরীতে। লক্ষ্য প্রায় অভিন্ন। তাই রাজধানী ঢাকাতেও দেখা যায়, বৈশাখের প্রথম দিনে নগর সভ্যতার সাথে ভীষণভাবে সংশ্লিষ্ট উঁচু মার্গের ব্যক্তিবর্গও ছোট্ট ছেলেটি বা মেয়েটির হাত ধরে ছুটে যান বৈশাখী মেলায়। ছুটে যান পহেলা বৈশাখের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে বিভিন্ন বয়সের নর-নারী, শিশু-কিশোর কিছুক্ষণের জন্যে প্রাণভরে কয়েকটি মুহূর্ত উপভোগের জন্যে।

মোট কথা, গ্রামীণ জীবনের স্তর পেরিয়ে, শহর-নগর ছাপিয়ে পহেলা বৈশাখের অনুষ্ঠান আজ যে স্তরে উপনীত হয়েছে তা সত্য সত্যই জাতীয়। সম্প্রদায় ছাড়িয়ে, গোষ্ঠির উর্ধ্বে উঠে, সব বিভিন্নতা মাড়িয়ে পহেলা বৈশাখ বাংলাদেশের জাতীয় জীবনে রূপান্তরিত হয়েছে সর্বসাধারণের মিলন তিথি রূপে। পহেলা বৈশাখের অনুষ্ঠানকে তাই সরকারিভাবে পালনের ব্যবস্থা করাই উত্তম।

বাংলা নববর্ষে অন্যান্য সম্প্রদায়ের আচার বিরোধী কোনো মুসলমানি আচারের জায়গা নেই, যদিও বাংলা বছরের জন্ম হয়েছে দিল্লির মুসলমান সম্রাট আকবরের আমলে, ইসলামী উত্তরাধিকার বহন করে, তারই নির্দেশে। এর পূর্বে এই অঞ্চলে প্রবর্তিত ছিল হিজরি সাল। ৫৯৮ হিজরি মোতাবেক ১২০১ খ্রিষ্টাব্দে ইখতিয়ার উদ্দীন মুহম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজির বঙ্গ বিজয়ের মাধ্যমে এই অঞ্চলে যেমন মুসলিম শাসনের সূচনা হয়, তেমনি হিজরি সাল রাষ্ট্রীয় মর্যাদা লাভ করে। ১৫৫৬ খ্রিষ্টাব্দে মোতাবেক ৯৬৩ হিজরিতে মুঘল বাদশাহ আকবর মসনদে অধিষ্ঠিত হন। রাজস্ব আদায়ের সুবিধার্থে চান্দ্র বছর হিজরির পরিবর্তে একটি সৌর সাল উদ্ভাবনের লক্ষ্যে তখনকার দিনের প্রখ্যাত জ্যোতির্বিজ্ঞানী আমীর ফতেহ উল্লাহ্ সিরাজীকে দায়িত্ব দেন ১৫৮৪ খ্রিষ্টাব্দে। তিনি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে, হিজরি সালের অবয়বকে ঠিক রেখে, বর্ষ গণনা ৩৫৪ দিনের পরিবর্তে ৩৬৫ দিন ধার্য করে ১৪৮৫ সালে বাদশাহ আকবরের নিকট পেশ করেন। আকবর তা অনুমোদন করলে চলতি হিজরি মোতাবেক ৯৬৩ সাল থেকে

www.pathagar.com

বাংলা বছরের সূচনা হয়। হিজরি সালের প্রথম দিন পহেলা মহররমের বদলে বাংলা সালের সূচনা হয় পহেলা বৈশাখ থেকে। ফলে হিজরি সালের সৌর রূপ বাংলা সাল ইসলামী উত্তরাধিকার ধারণ করে পথ পরিক্রমা শুরু করে।

অন্যদিকে, বাংলা বছরে হিন্দুত্বের কোনো সংস্কারও জড়িত নেই, যদিও স্থানীয় প্রভাবে প্রকৃতির বৈরী সব দৈত্য-দানার মুখোশ, খানা-খাদ্যের বিভিন্ন রূপ, কৃষিজ সংস্কৃতির হরেক রকম উপাদানের সংযোগ ঘটেছে দীর্ঘকালীন পরিসরে। দরিদ্র কৃষকের খাদ্য পান্তা ভাত, গ্রামীণ জীবনে ব্যবহৃত রঙ-বেরঙের পরিচ্ছদ, গ্রামীণ সংস্কৃতির বিভিন্ন অভিব্যক্তি তথা নৃত্যগীত সময়ই সংযোজন করেছে পহেলা বৈশাখের উৎসবে। এভাবে বাংলা সাল বাংলাদেশের বাইরের কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হলেও, এর জন্মলগ্নে কোনো বাঙালির অবদান ছাড়াই, সকল বাঙালির নিকট তা হয়ে উঠেছে এক সর্বজনীন মহোৎসব।

কোনো কোনো মহল থেকে অবশ্য পহেলা বৈশাখের অনুষ্ঠানমালাকে অনৈসলামিক বলে চিহ্নিত করা হচ্ছে। কোনো কোনো মহলকে পহেলা বৈশাখের উৎসবকে সংকীর্ণ দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করে এর সমালোচনায় মুখর হতে দেখা যাচ্ছে। শুধু তাদের জন্যে বলতে চাই, কোনো জনপদে ধর্মীয় চেতনা যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তার চেয়ে অনেক গুরুত্বপূর্ণ হল সেই জনপদের সকল সম্প্রদায়ের জনসমষ্টির মিলিত হবার সম্ভাবনাময় সুযোগ। এসব সুযোগের সূত্র ধরেই গড়ে ওঠে মহামিলনের মহান সূত্র–যা সমগ্র জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করে। সকল বিভেদ ভুলে, সকল সন্দেহ, অবিশ্বাস ও সংকীর্ণতা ছাড়িয়ে ঐক্যবোধই জাতীয় স্বার্থকে সমুন্নত করে। বাংলাদেশের আজকের পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে পহেলা বৈশাখই একমাত্র দিন যেদিন সবাই সমবেত হতে পারছি ঐক্যের উপত্যকায়। মহামিলনের বিস্তীর্ণ মোহনায়।

উৎসব সব সময়ই আনন্দের। তা যদি সর্বসাধারণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে সম্পন্ন হয় তাহলে তা হয়ে ওঠে মহা আনন্দের। জরাজীর্ণ পুরাতনের সব জঞ্জাল সরিয়ে, সবার প্রত্যাশাকে ধারণ করে, পহেলা বৈশাখের আবেদন বাংলাদেশের ঘরে ঘরে পৌঁছে দিচ্ছে নির্মল এক আনন্দের বার্তা। তাই পহেলা বৈশাখ হয়ে উঠেছে জাতীয় ঐক্যের প্রতীকস্বরূপ এক আনন্দঘন মহোৎসব। জাতীয় জীবনে সুষম শান্তির এক মহান অভিব্যক্তি। এই ধরনের উৎসব জাতীয় পর্যায়ে সব অনৈক্য, সব দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, সব বিভাজন দূর করতে পারে যদি সুচারুরূপে সুপরিকল্পিতভাবে এর ব্যবস্থাপনা সম্পন্ন হয়।

www.pathagar.com

গ্রন্থাগারের আলো

একটি গ্রন্থাগার একটি ঘুমন্ত মহাসমুদ্রের মতো। মহাসমুদ্র বটে, কিন্তু নিস্তব্ধ। কোনো ঝোড়ো হাওয়া নেই। নেই উত্তাল তরঙ্গের মাতামাতি। নেই কোনো ফেনিল উচ্ছ্বাস। শান্ত, সমাহিত, সীমাহীন জলরাশি মনমুগ্ধ হয়ে এক পরম স্নিগ্ধতায় নিস্তব্ধ রয়েছে। মহাসমুদ্রের এই কাল্পনিক ছবির সাথে শ' শ' র‍্যাকে সাজানো অসংখ্য গ্রন্থরাজি-পরিপূর্ণ একটি গ্রন্থাগারের ছবি মিলিয়ে দেখুন, দেখবেন দু'এর মধ্যে কত মিল। দুটিই প্রায় সীমানাহীন। প্রাণপ্রাচুর্য্যে ভরপুর হয়েও দুটি কেমন অভিন্ন-নিঃশব্দ, নিস্তব্ধ, নির্বিরোধ। বুকে ঝড়ের মাতন নিয়েও কেমন শান্ত, ঘুমন্ত। কেমন সৌম্য, সুদর্শন।

অভ্যন্তরে প্রবেশ করুন, দেখবেন, দু'এর ভাণ্ডারে কত "বিবিধ রতন"। মহাসমুদ্রের লোনা পানির গভীরে যেমন রয়েছে প্রাণসংহারি ঝড়ের জ্বালামুখ, তেমনি রয়েছে মহামূল্যবান মণিমুক্তার অপূর্ব সমাহার। গ্রন্থাগারেও দেখা যায়, একদিকে যেমন রয়েছে বিপ্লব সংগঠনের অঘটনঘটনপটীয়সী হাজারো তীক্ষ্ণধার শাণিত বাক্যবন্ধনি, অন্যদিকে তেমনি রয়েছে শান্ত জীবনের উপযোগী অসংখ্য শান্তির লালিত বাণী। তাকান না যেদিকে ইচ্ছা। বৃহৎ পৃথিবীটা যেন এসে ঠেকেছে আপনার নাগালের মধ্যে। শুনুন, কথা বলুন, ভাবের আদান-প্রদান করুন নিশ্চিন্ত মনে।

আমারও ছোট্ট একটা গ্রন্থাগার রয়েছে। রোজ বসি তার এক কোণে। উপভোগ করি মহাসমুদ্রের বিশালতার ঔদার্য। আহরণ করার চেষ্টা করি জ্ঞান সমুদ্রের আশপাশ থেকে দু'চারটা নূড়ি। আমার ভাণ্ডারে আছে মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, জীবনানন্দ, জসীম উদ্দীন, কায়কোবাদ, সৈয়দ মুজতবা আলী, এমনকি আজকের শামসুর রাহমান, আল মাহমুদ, ইমদাদুল হক মিলন ও হুমায়ুন আহমদের সাহিত্য প্রতিভা। রয়েছে প্রাচীন গ্রীসের প্লেটো, এরিস্টটল, সফোক্লিস, হোমারের রত্নখচিত লেখাজোখা। রয়েছে ব্রিটেনের চসার, শেকসপিয়ার, মার্লো, ওয়ার্ডসওয়ার্থ, শেলী, কিটস্, বাইরন, টেনিসন, ব্রাউনিং এর কালোত্তীর্ণ সাহিত্য সম্ভার। রয়েছে রুশ ও ফরাসি সাহিত্যের যুগ স্রষ্টাদের শ্রেষ্ঠতম ফসল। ভালো লাগে এই ভেবে যে, আমার ছোট্ট গ্রন্থাগারটি দূরকে কাছে টেনেছে। পরকে আপন করেছে। সমগ্র বিশ্বকে টেনে এনেছে আমার ছোট্ট ঘরের কোণে। বই-পুস্তকের মাঝে ঢুকলে আমি আর একা থাকি না। সবার সাথে আমার যোগাযোগ হতে থাকে। কখনো কারো সুরে সুর মিলাই। কখনো বা বিতর্কে প্রবৃত্ত হই। কিন্তু যোগাযোগ ঘটে অন্তরঙ্গভাবে। বই পড়ার লাভ এইখানটাই। কোনো লেখা একবার পড়ি। কোনো কোনো লেখা বারবার পড়ি। পড়ি আর অপরকে পড়তে বলি। লেখকের সব কিছুকে সায় দেবার জন্যে নয় কিন্তু। নিজস্ব অনুভবকে তীক্ষ্ণ করার লক্ষ্যে।

www.pathagar.com

দীর্ঘদিন পরে মোতাহার হোসেন চৌধুরীর "সংস্কৃতি-কথা" আবারো চোখে পড়ল। আজকের দিনে ধর্মকে নিয়ে যারা বাড়াবাড়ি করছেন অথবা ধর্মের প্রভাবকে একেবারে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিতে চাচ্ছেন তাদেরকে বলব, এদেশের রুচিশীল, পরিশীলিত মনের অধিকারী লেখক মোতাহার হোসেন চৌধুরীর লেখাটি আবার পড়ুন। ভালো লাগবে। তার সাথে একমত হতে হবে এমন কথা নয়, তারপরেও পড়ুন। প্রথম ক'টি লাইনে তিনি লিখেছেন : "ধর্ম সাধারণ লোকের কালচার, আর কালচার শিক্ষিত, মার্জিত লোকের ধর্ম। কালচার মানে উন্নততর জীবন সম্বন্ধে চেতনা-সৌন্দর্য, আনন্দ ও প্রেম সম্বন্ধে অবহিতি। সাধারণ লোকেরা ধর্মের মারফতেই তা পেয়ে থাকে। তাই তাদের ধর্ম থেকে বঞ্চিত করা আর কালচার থেকে বঞ্চিত করা এক কথা।" এরই সাথে মিলিয়ে রুশ লেখক টলস্টয়ের (Tolstoy) *The Kingdom of God* গ্রন্থের বারো অধ্যায়ের ক'টি লাইনের উপর দৃষ্টিপাত করুন, দেখবেন বিশ্বের সৃজনশীল মনগুলির আনাগোনার ক্ষেত্রটি অত্যন্ত প্রশস্ত। তিনি লিখেছেন : "জীবনের গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্যটি হল সৃষ্টিকর্তার রাজ্য প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করা। তা সম্ভব শুধুমাত্র আমাদের প্রত্যেকের সত্যকে স্বীকার করে জীবনে তার প্রতিফলন ঘটানোর মাধ্যমে।" ["The only significance of life consists in helping to establish the Kingdom of God; and this can be done only by means of the acknowledgement and profession of the truth by each one of us."]

ইংরেজ কবি জন মিল্টনের *Paradise Lost* কাব্যের প্রথম অধ্যায়ে দৃষ্টি দিন, দেখবেন তিনি টলস্টয়ের কত কাছাকাছি। মোতাহার হোসেন চৌধুরীও তাদের থেকে বেশি দূরে নন। মিল্টন লিখেছেন : "আমার মধ্যে যে অন্ধকার তা আলোকিত কর। আমার নীচতাকে উন্নত কর আর তা যেন উন্নত থাকে তার ব্যবস্থা কর। এই মহান যুক্তির অবতারণা করছি এজন্যে যে, আমি যেন চিরন্তন বিশ্বপিতার করুণার কথা বলতে পারি, আর মানবের নিকট সৃষ্টিকর্তার ইচ্ছা ব্যাখ্যা করতে পারি।"

[What in me is dark
Illumine, what is low raise and support;
That to the height of this great argument
I may assert eternal Providence,
And justify the ways of God to men.]

ভারতে ব্রিটিশ শাসনের তথা সাম্রাজ্য মদমত্ততায় কলুষিত শাসনের কুফল সম্পর্কে "সভ্যতার সঙ্কট" নিবন্ধে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তখন যা বলেছিলেন আজকের সভ্যতার সংকট সম্পর্কে কেউ কিছু লিখলে ঠিক তার কাছাকাছিই কিছু লিখবেন। আজকে বিশ্বময় যে অনিশ্চয়তার সৃষ্টি হয়েছে, ব্যক্তিগত সন্ত্রাসকে ছাড়িয়ে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের মাধ্যমে ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলির সম্পদ যেভাবে কুক্ষিগত করার প্রয়াসে লিপ্ত রয়েছে বিশ্বের বৃহৎ ও পরাক্রমশালী রাষ্ট্রগুলি, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অভূতপূর্ব অগ্রগতিকে যেভাবে শান্তিপূর্ণ পৃথিবী গড়ে তোলার পরিবর্তে বিশ্বময় একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তারের মাধ্যম হিসেবে প্রয়োগ করা হচ্ছে সেদিকে দৃষ্টি দিন, দেখবেন রবীন্দ্রনাথের যুগ আর আজকের সময়ের

www.pathagar.com

মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। রবীন্দ্রনাথ তখন লিখেছিলেন : "নিভৃতে সাহিত্যের রস সম্ভোগের উপকরণের বেষ্টন হতে একদিন আমাকে বেরিয়ে আসতে হয়েছিল। সেদিন ভারতবর্ষের জনসাধারণের যে নিদারুণ দারিদ্র্য, আমার সম্মুখে উদঘাটিত হল তা হৃদয়বিদারক। অন্ন বস্ত্র পানীয় শিক্ষা আরোগ্য প্রভৃতি মানুষের শরীর মনের পক্ষে যা কিছু অত্যাবশ্যক তার এমন নিরতিশয় অভাব বোধহয় পৃথিবীর আধুনিক শাসন-চালিত কোনো দেশেই ঘটেনি। অথচ এই দেশ ইংরেজকে দীর্ঘকাল ধরে তার ঐশ্বর্য জুগিয়ে এসেছে। যখন সভ্য জগতের মহিমাধ্যানে একান্ত মনে নিবিষ্ট ছিলেম তখন কোনদিন সভ্যনামধারী মানব আদর্শের এত বড়ো নিষ্ঠুর বিকৃতরূপ কল্পনা করতেই পারিনি।"

গ্রন্থাগার থেকে রবীন্দ্র রচনাবলির এই অংশ পড়ুন আর আজকের উদার গণতন্ত্রের দুই ধ্বজাধারী–যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যের নেতৃত্বে মিত্র বাহিনীর ইরাকের মতো ছোট্ট একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের ওপর হামলার বিভিন্ন পর্যায় পর্যালোচনা করুন, কত প্রবঞ্চনা, অসত্য ভাষণ ও হীন স্বার্থের প্রণোদনায় সাম্রাজ্যবাদী শক্তি নিছক লুণ্ঠনের জন্যে বিশ্ব জনমতকে বিভ্রান্ত করতে উদ্যত। তাও বিশ্বায়ন ও তথ্য প্রযুক্তির একালে যখন মুহূর্তের মধ্যে বিশ্বের প্রত্যন্ত অঞ্চল পর্যন্ত তা ছড়িয়ে পড়তে পারে। গ্রন্থাগারের এই এক মহাসুবিধা। বিভিন্ন যুগের বিভিন্ন জনপদের তথ্য আপনি চাইলে আপনার সামনে ভিড় জমাবে। বিভিন্ন মনীষীর চিন্তাভাবনার সাথে পরিচিত হবেন। একের সাথে অন্যের তুলনা করতে পারবেন। অতীতের সাথে বর্তমানের যোগসূত্র খুঁজে পাবেন।

ধূমকেতুর (প্রথম বর্ষ ১৯ সংখ্যা ১৯২২) "নিশান বরদার" শীর্ষক প্রবন্ধে কাজী নজরুল ইসলাম যা লিখেছিলেন তার প্রতি আবার দৃষ্টি দিন, স্বাতন্ত্র্য, স্বাধীনতা ও মুক্তি সম্পর্কে যারা এখনো হাহুতাশ করছেন, অধিকার আদায়ের লড়াই-এ এখনো যারা মাঠে রয়েছেন, জনকল্যাণকে সামনে রেখে এখনো যারা প্রতিবাদে সোচ্চার নির্মম শাসকের বিরুদ্ধে, দেখবেন নজরুল ইসলামের সেই সব কথা আজও কত সত্য। তিনি লিখেছিলেন : "ওঠো! ওগো আমার নির্জীব ঘুমন্ত পতাকাবাহী বীর সৈনিক দল। ওঠো, তোমাদের ডাক পড়েছে। রণ দুন্দুভি রণ-ভেরী বেজে উঠেছে। তোমার বিজয় নিশান তুলে ধর। উড়িয়ে দাও। উঁচু করে ধর। তুলে দাও যাতে সে নিশান আকাশ ভেদ করে ওঠে। পুড়িয়ে ফেল ঐ প্রাসাদের উপর যে নিশান বুক ফুলিয়ে দাঁড়িয়ে তোমাদের উপর প্রভুত্ব ঘোষণা করছে। ভেঙ্গে ফেল ঐ প্রাসাদ শৃঙ্গ। বল আমি আছি। আমার সত্য আছে। আমরা রাজা। বিজয় পতাকা আমাদের .....। মনে মনে প্রতিজ্ঞা কর যে, নিশান ওড়াবো আমরা .....। পতাকার রঙ হবে লাল। তাকে রাঙাতে হবে খুন দিয়ে।"

ধূমকেতুর (প্রথম বর্ষ ৯ সংখ্যা ১৯২২) নজরুলের সম্পাদকীয় প্রবন্ধ ছাপা হয় "মেয় ভূখা হুঁ"। সেই প্রবন্ধে তিনি লিখেছিলেন : "মেয় ভূখা হুঁ। সে সুর–সে ক্রন্দন কাছে–আরো–আরো কাছে এসে যেন তারই দোরের পাশ দিয়ে কেঁদে গেল অনেক দূরে পুবের পানে। সে ক্রন্দন যতই দূরে যায়, দস্যি ছেলের রক্ত ততই ছায়ানটের নৃত্য হিন্দোলায় দুলতে থাকে, ভূমিকম্পের সময় সাগর দোলানির মত। ছেলে দোর খুলে সেই ভূখারিণীর কাঁদন লক্ষ্য করে করে ঝড়ের বেগে ছুটল। মা বার কতক ডেকে দোরে

www.pathagar.com

লুটিয়ে পড়ল। সে অসম্ভবকে দেখবে। সে ভয়কে জয় করবে। এলোকেশে জীর্ণা শীর্ণা ক্ষুধাতুর মেয়ে কেঁদে চলেছে "মেয় ভুখা হুঁ"। তার এক চোখে অশ্রু আর চোখে অগ্নি। দ্বারে দ্বারে ভূখারিণী কর হানে আর বলে মেয় ভূখা হুঁ।"

এত কথা বলছি এজন্যে যে, এসব মনীষীকে এক সাথে পেতে হলে যেতে হবে গ্রন্থাগারে। গ্রন্থাগারই সেই মিলন ক্ষেত্র যেখানে পরম শান্তিতে বসবাস করছেন মিল্টন আর টলস্টয়। এক সাথে সৌহার্দ পূর্ণ পরিবেশে সহ-অবস্থান করছেন রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, ওয়ার্ডসওয়ার্থ, শেলী, কিটস আর বাইরন। এক সারিতে বসেই তত্ত্বালোচনায় রত রয়েছেন প্লেটো, এরিস্টটল, হেগেল আর কার্ল মার্কস। গ্রন্থাগারেই আপনি দেখা পাবেন হাজার তিনেক বছরের শিল্পী, সাহিত্যিক, কবি, দার্শনিক ও ভাবুকদের। পাবেন সবাইকে এক সাথে।

এক একটা গ্রন্থ যেন ঝর্ণা ধারা। এসব ক্ষীণ ধারার সম্মিলিত প্রবাহ সৃষ্টি করে ব্যক্তিগত গ্রন্থাগারের বেগবতী স্রোতস্বিনী। ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, অভিজ্ঞতা এবং প্রজ্ঞার সমুদ্র তুল্য গণ গ্রন্থাগারে তা মিলে মিশে একাকার হয়ে যায়।

জীবনে যেমন রয়েছে সুখকর মুহূর্ত, তেমনি রয়েছে বেদনার লোনা স্পর্শ। যেমন রয়েছে আত্মতুষ্টির স্বাদ, তেমনি রয়েছে বঞ্চনার তিক্ততা, প্রতারিত হবার তীব্র ক্ষোভ, দুঃখ-শোকের গভীরতা। কিন্তু পাঠক সবকিছু ভুলে যেতে পারেন তার প্রিয় গ্রন্থখানি হাতে পেলে। কেউ কেউ গ্রন্থাগারকে তার নিজস্ব ভুবনরূপে তৈরি করেও নিতে সক্ষম। এই ভুবনে নেই দুঃখবোধ, নেই হারানোর ব্যথা, নেই প্রবঞ্চকের কোনো স্থান। এই ভুবনে তিনি প্রতিনিয়ত উপভোগ করতে পারেন স্বর্গসুখ। তাই তো পনেরো শতকের লেখক ইরাসমাস (Desiderius Erusmus) ১৫২৪ সালে বিশপ ফিশারকে লেখা চিঠিতে বলতে পেরেছিলেন : "আমি জানি আপনার গ্রন্থাগারে আপনি কত ব্যস্ত থাকেন। গ্রন্থাগার যে আপনার স্বর্গ।" ["I know how busy you are in your library, which is your paradise."] উনিশ শতকে রবার্ট লিইটন (Robert Leighton) তার কবিতায় লেখেন :

'আমরা যখন অন্যত্র বাস করবো, আমি তাই ভাবি,
মস্তিষ্ক প্রসূত সেইসব প্রিয় সৃষ্টি, যা এখনো আমার পড়া হয়নি,
আমি আবার সেগুলি খুঁজে নেবো, পড়বো, এবং
আনন্দে মনটা ভরিয়ে নেবো।
সীমাহীন স্বাধীনতা এবং অনন্ত কালের পরিসরে
স্বর্গের গ্রন্থাগারে অন্ততকাল বাস করবো।

[I have a thought that, as we live elsewhere,
So will those dear creations of the brain,
That what I lose unread, I'll find and there,
Take up my joy again.
With liberty and endless time to read
The libraries of Heaven.]।

www.pathagar.com

শান্তিপূর্ণ সমাজ জীবনের কিছু শর্ত

শান্তিপূর্ণ জীবন কে না চায়? আমি চাই। আপনি চান। সেও চায় শান্তিতে জীবন কাটাতে। ঘরে শান্তি চাই। গ্রাম-মহল্লায় শান্তিপূর্ণ পরিবেশ চাই। সর্বোপরি, দেশে চাই শান্তিপূর্ণ পরিবেশ। চাই বৃহত্তর আঞ্চলিক পরিসরে, এমনকি বিশ্বময় শান্তির সুখদ হাওয়া সবাই চায় গায়ে লাগাতে। কিন্তু চাইলেই কি শান্তি আপনা আপনি ধরা দেবে? একজন গ্রীক দার্শনিক "ইউটোপিয়া" বা স্বপ্নরাজ্যের বর্ণনা দিতে গিয়ে লিখেছিলেন : "স্বপ্নরাজ্য এমন এক স্থান যেখানে মাছেরা নিজে ধরা দিয়ে, নিজেদের দেহে তেল-মরিচ-মসলা মাখিয়ে, নিজেরা সেঁকে-পুড়ে খাদ্য হিসেবে নিজেদের পরিবেশন করে।" ["The fishes came perfectly willing and did their own grilling and served themselves on the dishes"] এ ধরনের ঘটনা স্বপ্নেই ঘটে। ঘটে শুধু কল্পনায়। বাস্তবতা সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন। শান্তি, কোনো পরিবারেই হোক আর গ্রাম-মহল্লায় হোক আর দেশেই হোক, বৃষ্টির মতো প্রাকৃতিক নিয়মে অঝোরে ঝরবে না আকাশ থেকে। শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে হবে। শান্তিপূর্ণ পরিবেশ তৈরি করতে হবে, অনেক কাঠ-খড় জ্বালিয়ে। একবার তেমন পরিবেশ তৈরি করতে তাকে সংরক্ষণ করতে হয় সার্বক্ষণিক উদ্যোগের মাধ্যমে। একটু অমনোযোগী হলে অশান্তি মাথা উঁচু করবে সদম্ভে, চারদিকে হাত-পা ছাড়িয়ে। হেনরী নেভিনশন (Henry Nevinsion) কীভাবে স্বাধীনতা রক্ষা করতে হয় তা কবিত্ব করে বলেছেন : "প্রেমের মত স্বাধীনতাকেও আমাদের প্রত্যেক দিন জয় করতে হবে। প্রত্যেক বার বিজয়ের পর যখন আমরা মনে করি যুদ্ধ শেষ হয়েছে, সুতরাং নিশ্চেষ্ট থাকতে পারি, তখন যেমন যুদ্ধে হারতে বসি, তেমনি স্বাধীনতাকেও আমাদের হারাতে হয়। স্বাধীনতার সংগ্রাম কোনো দিন শেষ হয় না এবং এর যুদ্ধক্ষেত্র কোনোদিন নীরব থাকে না।" ["Freedom, we know, is a thing that we have to conquer afresh for ourselves everyday like love; and we are always losing freedom just as we are always losing war because after each victory, we think we can settle down and enjoy it without further struggle. The battle of freedom is never done and the field never quite."] শান্তিপূর্ণ জীবনের সংগ্রামও ঠিক তেমনি। শান্তি রক্ষার লক্ষ্যে এই মনোভাব যে, এই ক্ষেত্রে বিঘ্ন ঘটলে প্রতিবাদ হতে পারে, এমনকি প্রতিরোধের ঝড় উঠতে পারে, তার চেয়ে বেশি কার্যকর অন্য কিছু হতে পারে না।

শান্তিপূর্ণ জীবনের প্রধান শর্ত হল রাষ্ট্রের শক্তিশালী ভূমিকা এবং এই ভূমিকার প্রতিফলন ঘটে রাষ্ট্রের নিরাপত্তা সংরক্ষণে, ভৌগোলিক অখণ্ডতা রক্ষণে, জাতীয় স্বাধীনতা নিশ্চিতকরণে, অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে আইন-শৃঙ্খলা স্বাভাবিকীকরণে, নাগরিকদের অধিকারের নিশ্চয়তা বিধানে এবং নিরপেক্ষভাবে ন্যায়নীতির প্রতিষ্ঠাকরণে : শিক্ষা,

www.pathagar.com

স্বাস্থ্য, কৃষি বা শিল্পের অগ্রগতি সাধন রাষ্ট্রীয় কার্যক্রমের মৌলিক অংশ নয়। যোগাযোগ ব্যবস্থার সহজীকরণ অথবা সাংস্কৃতিক বিকাশে রাষ্ট্রের ভূমিকাও অনেকটা বাড়তি। অনেকটা ঐচ্ছিক। রাষ্ট্রের নিকট থেকে জনগণ ভাত চায় না। চায় না কাপড় অথবা বাসস্থান। চাকরিও চায় না। চায় শুধু জীবনের নিরাপত্তা। চায় সম্পদের নিরাপত্তা আর চায় শান্তিপূর্ণ জীবনের নিশ্চয়তা। রাষ্ট্রের জন্মের দিকে দৃষ্টি দিন, দেখবেন এসবের জন্যেই সাধারণ মানুষ রাষ্ট্রসৃষ্টিকে অভিনন্দিত করেছে সেই অতীতে, দূর অতীতে। ব্রিটেনের খ্যাতনামা দার্শনিক টমাস হবস্ (Thomas Hobbes) প্রাক-রাষ্ট্রীয় সামাজিক অবস্থাকে "প্রকৃতির রাজ্য" (State of Nature) বলে চিহ্নিত করেছেন। সেখানে কোনো শৃঙ্খলা ছিল না। ছিল না সভ্যতা ও শান্তিপূর্ণ জীবনের কোনো উপাদান। ছিল শুধু "প্রতিনিয়ত দুর্বিপাকে মৃত্যুর ভয় এবং আশঙ্কা।" ("Continual fear and danger of violent death.") ফলে সেই প্রকৃতির রাজ্যে জীবন ছিল "নিঃসঙ্গ, দরিদ্র, নোংরা, পাশব এবং সংক্ষিপ্ত।" ("solitary, poor, nasty, brutish and short.") রাষ্ট্রের জন্ম হল গণসম্মতির ভিত্তিতে। তৈরি হল সরকার, কিছু সুনির্দিষ্ট কর্মসূচির অঙ্গীকার মাথায় নিয়ে। সুনির্দিষ্ট হল রাজনৈতিক নেতৃত্বের ভূমিকা। রাজনৈতিক নেতৃত্বের অন্তর্ভুক্ত যারা ক্ষমতাসীন এবং যারা ক্ষমতা দখলে আগ্রহী। তাদের কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত হল রাষ্ট্রের নিরাপত্তা, রাষ্ট্রীয় ভূখণ্ডে বসবাসকারী নাগরিকদের জীবনের নিরাপত্তা, তাদের স্বাতন্ত্র্য ও সম্পদের নিশ্চয়তা বিধান প্রভৃতি। এই লক্ষ্যেই তৈরি হয় সুশাসন এবং সুশাসনের ভিত্তি ছিল আইনের রাজত্ব। এভাবে আইন হয়ে ওঠে জাতীয় এবং জননিরাপত্তার অমোঘ অস্ত্র। হতে হবে প্রতিষ্ঠিত বা আইনের রাজত্ব। আইন সবাইকে মানতে হবে। কেউ আইন ভঙ্গ করতে পারবে না। এমনকি সবচেয়ে প্রভাবশালী ব্যক্তিদের পর্যন্ত সচেতনভাবে আইন মেনে চলতে হবে। আইন ভঙ্গ করলে তাদেরকেও শাস্তি পেতে হবে। আইন মেনে চললেই সমাজে শান্তি নেমে আসবে। তখন আস্তে আস্তে দেশের কৃষি ক্ষেত্রে ফলবে সোনালি ফসল। শিল্প ক্ষেত্রে বৃদ্ধি পাবে উৎপাদন। ব্যবসা-বাণিজ্যে আসবে গতি। নাগরিকগণ উদ্বুদ্ধ হবেন নতুন নতুন ক্ষেত্রকে উর্বর করতে। সৃজনশীলতার শুভ উদ্যোগ সমাজকে করবে উন্নততর। চূড়ান্ত পর্বে সুশাসনই স্বশাসনের মহত্তম ক্ষেত্র রচনা করবে। রাজনৈতিক নেতৃত্বের বড়ো দায়িত্ব তাই হবে আইনের রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করা, অন্য কিছু নয়। আগ বাড়িয়ে তারা সবকিছুতে হাত দিতে গেলেই হয়ে উঠবে বিপজ্জনক। ঐতিহাসিক উইল রজার্স (Will Rogers) সত্যিই বলেছেন ঃ "কিছু না করার জন্যে সরকারকে দোষারোপ করা আমাদের উচিত নয়। যখন কিছু করতে চায় তখনই সরকার বিপজ্জনক হয়ে ওঠে।" ["We should never blame the government for not doing something. It is when they do something is when they become dangerous."]

রাজনৈতিক নেতৃত্ব বিপজ্জনক হয়ে ওঠে দুটি কারণে : **এক.** ক্ষমতার শীর্ষস্থানে অবস্থানকারী নেতৃবৃন্দ সব সময় ন্যায়নীতি অনুসরণে সক্ষম নন। কোনো কোনো সময় রাষ্ট্রীয় কোষাগারে গচ্ছিত সম্পদের প্রতি নিজেরাই প্রলুব্ধ হয়ে তার একাংশে ভাগ বসাতে উদ্যত হন। আর অধিকাংশ সময় নিজেরা ভাগ না বসিয়ে নিজেদের আত্মীয়-

www.pathagar.com

স্বজন বা পুত্র কন্যাদের জন্যে তৈরি করেন সরকারি সম্পদে ভাগ বসাবার অপূর্ব সুযোগ। **দুই.** যেসব কর্মকর্তার মাধ্যমে রাজনৈতিক নেতৃত্ব তার দায়িত্বপালনে প্রবৃত্ত হয় সেসব কর্মকর্তা হয় নেতৃত্বকে ঠকিয়ে, না হয় জনগণের ওপর অত্যাচার করে বড় লোক হয়ে ওঠে। রাষ্ট্রীয় সম্পদের এই অপব্যবহার সম্পর্কে বিভিন্ন চিন্তাবিদ ও দার্শনিকরা মানব সভ্যতার আদি পর্ব থেকেই সজ্ঞাত বিধান দিয়ে এসেছেন। প্রায় আড়াই হাজার বছর পূর্বে গ্রীক সভ্যতার উজ্জ্বলতম জ্যোতিষ্ক প্লেটো তার রিপাবলিকে (আদর্শ রাষ্ট্রে) বিধান দিয়েছিলেন যে, দার্শনিক-রাজার (Philosopher King) না থাকবে কোনো পরিবার এবং থাকবে না কোনো ব্যক্তিগত সম্পদ। পরিবার না থাকলে আত্মীয়-স্বজন বা সন্তান-সন্ততিদের প্রতি তার কোনো সময়ে দুর্বলতা জন্মাবে না। কোন ব্যক্তিগত সম্পদে অধিকার না থাকলে রাষ্ট্রীয় সম্পদের সঠিক ব্যবহারে তিনি আপনা আপনি উদ্বুদ্ধ হবেন। রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তাদের দুর্নীতি সম্পর্কে প্রায় দু'হাজার বছর পূর্বের লেখা কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রের বিভিন্ন অধ্যায়ে উল্লিখিত হয়েছে চল্লিশ ধরনের লুণ্ঠন প্রক্রিয়া। অর্থশাস্ত্রের এক স্থানে লিখিত হয়েছে : "পানিতে বিচরণরত মাছ কখন পানি পান করছে তা জানা যেমন অসম্ভব, তেমনি অসম্ভব কখন কোন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা রাষ্ট্রীয় তহবিল তছরূপ করছে তা নির্ণয় করা।" ["Just as it is impossible to know when a fish moving in water is drinking it, so it is impossible to find out where government servants in charge of undertaking misappropriate money."] প্লেটোর আদর্শ রাষ্ট্র বাস্তবতার আলো দেখেনি কোনো দিন। বিভিন্ন দেশে রাজা হয়েছেন এবং থেকেছেন দীর্ঘদিন, কিন্তু কোথাও সেই প্লেটোর দার্শনিক রাজার দেখা মেলেনি। ব্যক্তিগত সম্পদ বঞ্চিত এবং পরিবারহীন রাজার কথা আমরা তত্ত্ব হিসেবে আলোচনা করে চলব আরো কয়েক হাজার বছর, কিন্তু সেই দার্শনিক রাজার সন্ধান নাও পেতে পারি। অন্যদিকে কৌটিল্যের মতো ব্যক্তিও সব জেনেশুনে সরকারি কর্মকর্তাবিহীন শাসনব্যবস্থা উদ্ভাবনে সক্ষম হননি। ফলে দুর্নীতির গতিধারা বন্ধের কোনো সুযোগ ঘটেনি। রাষ্ট্রীয় জীবনে অধিকাংশ অসঙ্গতি, এমনকি আইন-শৃঙ্খলার অস্বাভাবিক অবস্থাও প্রকারান্তরে জড়িত রয়েছে দুর্নীতির শত ছিদ্রের সাথেই। সমষ্টিগত পর্যায়ে অশান্তির মূলও এই দুর্নীতির বিষবৃক্ষটি। এটিকে উপড়ে ফেলা সম্ভব নয়। সম্ভব এর ব্যাপ্তি ও গভীরতাকে হ্রাস করে কোনো রকমে সহনশীল পর্যায়ে নামিয়ে আনা। কীভাবে এই অবস্থা সৃষ্টি হতে পারে? এই প্রশ্নের সহজ কোনো উত্তর নেই। সম্ভবত এর কোনো উত্তর হয় না। তাই যেসব জনপদে সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবন তুলনামূলকভাবে শান্তিপূর্ণ সে দিকে দৃষ্টি দিয়ে এই সমস্যার সমাধান খুঁজতে হবে। এই সব জনপদে তিনটি উপাদান চোখে পড়ে। **এক.** ভারসাম্যের রাজনৈতিক ব্যবস্থা। **দুই.** উদারনৈতিক রাজনৈতিক নেতৃত্ব। *তিন.* অধিকার সচেতন এবং দায়িত্ব সম্পর্কে সজ্ঞাত জনসমষ্টি।

এক : রাজনীতি সব সময় ক্ষমতার সাথে সম্পৃক্ত। রাজনৈতিক ব্যবস্থায় কেউ কেউ ক্ষমতা প্রয়োগ করছেন। শাসন করছেন। আর অধিকাংশই শাসিত। ক্ষমতার প্রান্ত সীমায় গ্রহীতার পর্যায়ে রয়েছেন। ক্ষমতার কিন্তু নিজস্ব এক ধরনের বিষক্রিয়া রয়েছে

www.pathagar.com

এবং চূড়ান্ত ক্ষমতার বিষক্রিয়া মারাত্মক। লর্ড এ্যাক্টন (Lord Acton) সত্যি লিখেছেন : "ক্ষমতা দুর্নীতির জনক এবং সর্বোচ্চ ক্ষমতার সাথে জড়িত সর্বোচ্চ দুর্নীতি।" ["Power corrupts and absolute power corrupts absolutely."] অন্যদিকে, রাজনৈতিক ব্যবস্থা পরিচালনার জন্যে প্রয়োজন হয় ক্ষমতার। যুগে যুগে রাষ্ট্রচিন্তাবিদরা মানব চরিত্র বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন, সুশাসনের অন্যতম উপাদান হল প্রয়োজনে ক্ষমতার প্রয়োগ। জেরেমী টেইলর (Jeremy Taylor) বলেছেন, "একদল নেকড়ে বাঘ বরং চুপ করে থাকবে, কিন্তু জোড় করে তাদেরকে শান্ত করার কেউ না থাকলে কিছু সংখ্যক মানুষ কখনো চুপ করে থাকবে না।" ["A pack of wolves would rather hang around silently, but there are persons who have to be forced to remain silent."] অন্য কথায়, শাসন বা সুশাসনের জন্যে ক্ষমতা অপরিহার্য, কিন্তু এর সীমারেখা রয়েছে। সরকারের বা সরকার প্রধানের কতটুকু ক্ষমতা থাকবে, এই ক্ষমতার সীমারেখা কি, এই ক্ষমতার প্রয়োগ কীভাবে হবে, কোন প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে, সীমারেখা কীভাবে নির্ধারিত হবে, প্রয়োগকারী সীমা অতিক্রম করলে কি হবে–এসব বিষয়ে সুনির্দিষ্ট বিধি বিধান থাকতে হবে দেশের মৌলিক আইনে বা সংবিধানে। থাকতে হবে সুপরিকল্পিত চেক এন্ড ব্যালান্স (Check and balance)। যে ব্যবস্থায় কোনো নিয়ন্ত্রণ রেখা সুনির্দিষ্ট হয়নি এবং যে ব্যবস্থায় কোনো সাম্যাবস্থা সৃষ্টি হয়নি সে ব্যবস্থায় গণতন্ত্র অচল। অর্থহীন জনগণের অধিকার। সুশাসন অকার্যকর। স্বশাসনের দাবি কল্পকথার মতো। এসব জনপদে সমাজ জীবনে শান্তির ললিত বাণী কখনো উচ্চারিত হয় না। কিন্তু এও উল্লেখযোগ্য, রাজনৈতিক ব্যবস্থায় ক্ষমতার বিন্যাস এমন হওয়া উচিত যে, শাসন ক্ষমতার প্রাচুর্যের সাথে শাসনকারীর দায়িত্বশীলতার সমন্বয় সাধিত হয়েছে। সিদ্ধান্ত গ্রহণ ক্ষমতার সাথে স্বচ্ছতা এবং ক্ষমতা প্রয়োগের সাথে জবাবদিহিতার সমন্বয় সাধিত হয়েছে। যে সমাজে ব্যক্তি প্রাধান্যের পরিবর্তে আইনের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং ক্ষমতা প্রয়োগকারীদের ব্যক্তিগত আধিপত্য (Personalized power) সীমিত হয়েছে সেই সমাজে শান্তিপূর্ণ জীবনের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়েছে।

দুই : রাজনৈতিক ব্যবস্থায় সুবিন্যস্ত ক্ষমতা প্রয়োগকারী রাজনৈতিক নেতৃত্বের প্রকৃতি হতে হবে উদারনৈতিক, সংকীর্ণমনা নয়। রাজনৈতিক নেতানেত্রীর ব্যক্তিত্ব হতে হবে সৃজনমুখী (Creative), কর্তৃত্বব্যঞ্জক (authoritarian) নয়। হতে হবে সংবেদনশশীল, কঠোর নয়। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাকে (State power) জনগণের আমানত (Trust) হিসেবে গণ্য করতে তাদের শিখতে হবে। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা, নিজেদের প্রভাব, বৈভব বা প্রতিপত্তি অর্জনের মাধ্যম হতে পারে না। কোথাও কোনো পর্যায়ে কোনো বিচ্যুতি ঘটলে তখনই রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা পরিত্যাগ করার মানসিকতা তাদের অর্জন করতে হবে। নিজেদের আইনের শাসনের অধীনে স্থাপন করে আত্মম্ভরিতার সকল বাতায়ন বন্ধ করতে হবে। তাদের গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি চর্চা করে পারস্পরিক সহযোগিতার মন্ত্রে উদ্দীপ্ত হতে হবে। সহিষ্ণুতার পাঠ গ্রহণ করতে হবে। রাজনৈতিক ব্যবস্থায় প্রতিযোগিতার স্থান রয়েছে, নেই কিন্তু বৈরিতার কোনো স্থান। রাজনীতির প্রতি স্তরে

www.pathagar.com

রাজনৈতিক নেতানেত্রীর রুচিশীলতা ও পরিশীলিত মানসিকতার প্রতিফলন হল গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির পরিপূর্ণ রূপ। প্রতিপক্ষ থাকবে, কিন্তু থাকবে না শত্রু। রাজনীতির ভাষা হবে শালীন এবং শোভন।

তিন : প্রতিবাদমুখর জনসমষ্টি হল সমাজে শান্তিপূর্ণ জীবন গঠন ও সংরক্ষণের শ্রেষ্ঠতম মাধ্যম। সমাজে অপরাধ থাকবে। থাকবে দুর্নীতিও। থাকবে অসহিষ্ণুতা এবং ক্ষমতার অপব্যবহার। সুষ্ঠু রাজনীতি কখনো বা ক্ষমতার রাজনীতিতে (Power-Politics) রূপান্তরিত হতে পারে। প্রতিবাদমুখর জনসমষ্টিই পারে এসব কিছুকে সহনশীল পর্যায়ে নামিয়ে আনতে। সহনশীল পর্যায়ে নামিয়ে আনা কিন্তু সহজ নয়। এর প্রক্রিয়াও অত্যন্ত কঠিন। কিন্তু যে জনপদের জনগণ এই কঠিন প্রক্রিয়াকে সহজ করার দায়িত্ব গ্রহণে ব্যর্থ হবে তাদের জন্যে স্বাধীনতা যেমন এক সোনার হরিণ, শান্তিপূর্ণ জীবনের আস্বাদও তেমনি এক রঙিন স্বপ্ন। এই লক্ষ্যে অর্থপূর্ণ প্রতিবাদ যেমন মূল্যবান, যুক্তিপূর্ণ প্রতিরোধও তেমনি গুরুত্বপূর্ণ। এরই মধ্যদিয়ে বিশ্বে অর্থপূর্ণ হয়েছে সুশাসন। অর্থপূর্ণ হয়েছে স্বশাসনও। জনগণই শান্তিপূর্ণ রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার সুরম্য অট্টালিকার কারিগর। জনগণই এর প্রধানতম নিয়ামক। জনগণই সকল ক্ষমতার মালিক। সমাজে শান্তিপূর্ণ জীবনের কারিগরও সাধারণ মানুষেরা। সকল সংগ্রামে তারাই জয়ী হয়েছে। ইতিহাসের এই শিক্ষা এদেশের জনগণের অঙ্গীকার হোক। জয় তাদের অবশ্যম্ভাবী।

www.pathagar.com

সাংবাদিকের দায়বদ্ধতা

সাংবাদিকের দায়বদ্ধতা সত্যের নিকট সর্বপ্রথম। তারপর তিনি দায়বদ্ধ তার সমাজের নিকট, সমাজে বসবাসকারী জনসমষ্টির নিকট, সামাজিক মূল্যবোধের প্রতি, জনসমষ্টির অধিকার ও দায়িত্ববোধের প্রতি। যেকোনো সমাজে সত্য প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব নিয়েই সাংবাদিকরা প্রতি প্রভাতে কাজ শুরু করে থাকেন। দিন শেষে, কাজ সমাধা করে যখন তিনি ঘরে ফেরেন, তখন স্মৃতির ঝুলি খুলে অবসরে একটা একটা করে গেঁথে চলেন তথ্যের একরাশ মণিমুক্তা। তার সবগুলোয় নিখাদ, তথ্যনির্ভর, বস্তুনিষ্ঠ। সাংবাদিকের নিকট এটিই সত্য। সংবাদপত্রের সত্যও এটি। সব সভ্য সমাজে এই সত্যটি স্বীকৃত। শুধু স্বীকৃত তা নয়, এই সত্যকে সংরক্ষণের জন্যে প্রায় সর্বত্র সমাজের সর্বোচ্চ আইনে তার স্বীকৃতিও থাকে। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম সংশোধনী আইনে ব্যবস্থা করা হয়েছে : 'কংগ্রেস সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হ্রাস করার লক্ষ্যে কোনো আইন প্রণয়ন করবে না।' ['Congress shall make no law .....abridging the freedom. . . of the press.'] শুধু কি তাই? কংগ্রেস যদি কোনো সময় তেমন আইন প্রণয়ন করেও ফেলে, তা হলেও সংবিধানের চৌদ্দতম সংশোধনী আইনের মাধ্যমে সংবাদপত্রের সেই স্বাধীনতাকে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। সংবাদপত্রের স্বাধীনতার সাথে জনগণের জীবন, স্বাতন্ত্র্য ও সুখের অন্বেষণকে (Life, Liberty and Pursuit of Happiness) ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত করে সংবিধান প্রণয়নের প্রায় দুশ' বছর পরে প্রেসিডেন্ট আইজেনহাওয়ার বলেছিলেন : 'এসব সত্যকে আমরা দিবালোকের মতো সুস্পষ্ট মনে করি। এবং সত্যগুলো হল–প্রত্যেক মানুষ জন্মলাভ করেছে সমান হয়ে। প্রত্যেকে এই পৃথিবীতে এসেছে সৃষ্টিকর্তা কর্তৃক প্রদত্ত কিছু জন্মগত অধিকার নিয়ে। এসব অধিকারের মধ্যে রয়েছে জীবন, স্বাতন্ত্র্য এবং সুখের অন্বেষণের অধিকার।' ('We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are - endowed by their creator with certain unalienable rights, that among these are life, liberty and the pursuit of happiness.'] এ দিক থেকে বলা চলে, সুস্থ সমাজ গঠনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মাধ্যম হল সংবাদপত্র এবং সাংবাদিকরা হলেন সুষম গণতান্ত্রিক সমাজ গঠনের কারিগর–যেমন শিক্ষকরা যুগে যুগে চিহ্নিত হয়েছেন মানুষ গড়ার কারিগর রূপে। এই অর্থে, সাংবাদিকতা নিছক একটি পেশামাত্র নয়, যদিও উন্নত পর্যায়ের পেশাদারিত্বই সাংবাদিকদের কার্যক্রমকে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ করে তোলে। প্রকৃত অর্থে সাংবাদিকতা হল এক ধরনের মিশন। এক প্রকার জীবনাদর্শ। ব্যক্তি ও সমষ্টির উন্নত জীবনাচার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে এক ধরণের মহতি উদ্যোগ। যে সব সমাজে এই লক্ষ্য অর্জিত হয়েছে সেসব

www.pathagar.com

সমাজের সংবাদপত্র যেমন হতে পেরেছে বিশ্বাসযোগ্য এক গণমাধ্যম, সুনীতি ও সুরুচির সুস্পষ্ট প্রতিচ্ছবি, অধিকার সংরক্ষণের সবচেয়ে শক্তিশালী মাধ্যম, সাংবাদিকরাও তেমনি হয়ে উঠেছেন সম্মানীয় সেলেব্রিটি (celebrity), লক্ষ জনের শ্রদ্ধেয় গণকণ্ঠ, জাতির বিবেকতুল্য।

নিজেদের আয়নায় আমরা যখন আমাদের মুখ দেখি, তখন কিন্তু ভেসে ওঠে ভিন্ন ছবি। এই ছবি উজ্জ্বল নয়। নয় দৃষ্টিনন্দন। এই ছবি অনেকটা মসীলিপ্ত, অসম্পূর্ণ, কোনো কোনো ক্ষেত্রে কুৎসিত। এদেশে সংবাদপত্রের সংখ্যা অনেক। রয়েছেন অনেক অনেক সাংবাদিক। কিন্তু ক'জন সুস্থ সমাজ গঠনের কারিগর? ক'জন গণতান্ত্রিক সমাজ গঠনের লক্ষ্যে কাজ করেন? অভিযোগ করছি না, কেননা সারা জীবন শিক্ষকতার সাথে সংশ্লিষ্ট থেকেও জীবনের শেষ প্রান্তে মনে হয় মানুষ তৈরির কারিগর হতে পারিনি। ক'জনই বা এই লক্ষ্যে প্রস্তুতি নিয়েছেন? চারপাশে যখন আবর্জনার স্তূপে পথঘাট বন্ধ, তখন ক'জন এই কঠিন মিশনে স্বেচ্ছায় যোগ দেবেন? শিক্ষাক্ষেত্রে দুর্যোগের যে ঘনঘটা, সাংবাদিকতার ক্ষেত্রেও তেমনি তমসাচ্ছন্ন জমাট বাঁধা অন্ধকার।

কেন এমন হল? নিজস্ব রাষ্ট্র বিনির্মাণে বাংলাদেশের জনসমষ্টির ত্যাগ যেমন কম নয়, কম নয় তাদের শৌর্যবীর্যও। দীর্ঘদিনের পরাধীনতা তাদের সবকিছু কেড়ে নিতে সক্ষম হয়নি। বরং অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, পরাধীনতার আগুনে ঝলসে সাধারণ মানুষের সৃজনশীলতা শাণিত হয়েছে। অধীনতার প্রতি ঘৃণার তীব্র ঝড়ে উড়ে গেছে জীবন সম্পর্কে সব রকম হীনম্মন্যতা। অন্যের নির্দেশদানের প্রতি তীব্র অবজ্ঞায় ধুয়ে মুছে গেছে মাথা নীচু করার সকল আবর্জনা। অর্জিত হয়েছে হাজারো প্রতিবন্ধকতার মাঝে মাথা উঁচু করার স্পর্ধা। অর্জিত হয়েছে বলিষ্ঠ জীবনবোধের অহঙ্কার। তারপরেও দেখা যায়, কোনো কোনো ক্ষেত্রে, সমাজের কোনো কোনো স্তরে, বিশেষ করে অধিপতি শ্রেণীর সুবিধাভোগীদের পর্যায়ে বাঙালিদের সেই সনাতন বৈশিষ্ট্য আজও টিকে রয়েছে ভীষণ জীবন্তরূপে। ব্যক্তি পর্যায়ে তারা সজ্জন হলেও সমষ্টিগত পর্যায়ে এখনো পীড়নকারী। পিতা বা মাতারূপে অথবা পরিবারের প্রধানরূপে আদর্শস্থানীয় হলেও গ্রাম পর্যায়ে এখনো তারা হীনম্মন্যতায় আক্রান্ত। রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে এখনো তারা ভীষণ স্বার্থপর, ভয়ঙ্কর আত্মকেন্দ্রিক। তাই সাধারণ পর্যায়ে উত্তম হয়েও উচচতর স্তরে ভীষণভাবে অভ্যস্ত অধমের ভূমিকা পালনে। তাই নেতৃত্বের যে পরশমণি সবকিছুকে সোনায় পরিণত করতে সক্ষম তা আজও এই সমাজ লাভ করেনি। আজও এদেশের নেতা-নেত্রীরা অতীতের সেই অনগ্রসর, সেই সনাতন মানসিকতার গভীর গুহায় নিমজ্জিত রয়েছেন। এই সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন : 'আমাদের আজন্মকালের প্রতিনিয়ত অভ্যাস ও দৃষ্টান্তে আমাদিগকে অন্ধ বাধ্যতার জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত করিয়া রাখে। তাহাতে আমরা অধীনস্থ লোকের প্রতি অত্যাচারী, সমকক্ষ লোকের প্রতি ঈর্ষান্বিত এবং উপরিস্থ লোকের নিকট ক্রীতদাস হইতে শিক্ষা করি। সেই আমাদের প্রতিমুহূর্তের শিক্ষার মধ্যে আমাদের সমস্ত ব্যক্তিগত এবং জাতীয় অসম্মানের মূল নিহিত রহিয়াছে।'

এই সত্য যেমন প্রযোজ্য শিক্ষকদের সম্পর্কে, তেমনি প্রযোজ্য সাংবাদিকদের সম্পর্কে। সত্য উদঘাটনের সময় তারা বিবেচনা করেন, এই সত্য প্রভুরা গ্রহণ করবেন

www.pathagar.com

তো! এই সত্যে প্রভুদের দল বা গ্রুপ খুশি হবেন তো। পাশাপাশি যারা ছড়ি ঘুরিয়ে চলেছেন তারা লাভবান হবে না তো! ফলে প্রভুর প্রতি বিশ্বস্ততার জন্যে জাতীয় পর্যায়ে বৃহৎ কোনো অর্জনের প্রতি তাদের উদাসীনতা বৃদ্ধি পেতে পেতে এক পর্যায়ে স্থবিরতায় আক্রান্ত হয়ে পড়েন আমাদের দেশের কিছু কিছু সাংবাদিক এবং কিছু সংবাদপত্র। এজন্যে আমরা যাদের নিকট থেকে সবচেয়ে বেশি প্রত্যাশা করি তাদের নিকট থেকে লাভ করি সবচেয়ে বেশি হতাশা। জীবন-জীবিকার জন্যে প্রয়োজন একটা পেশা, একটা কর্ম। এজন্যে অনেক কিছু করার প্রয়োজন যে তা অনস্বীকার্য, কিন্তু ব্যক্তি হিসেবে আমরা যে বিশাল সমাজ দেহের অংশ তাই সবার মূল লক্ষ্যবস্তু হওয়া প্রয়োজন। সবুজ পত্র-পল্লব যে কোনো মহীরুহের সুস্বাস্থ্যের লক্ষণ বটে। কিন্তু মহীরুহই আসল। সাংবাদিক এবং সংবাদপত্রের কর্তারা এই সত্য যত শিগগির অনুধাবন করবেন ততই মঙ্গল।

বৃটেনের দুরবস্থা লক্ষ্য করে এক সময়ে একজিটারের বিশপ (Bishop of Exeter) এডওয়ার্ড হেনরী বিকারস্টিথ তার 'Give Us Men!' কবিতার প্রথম কটি পংক্তিতে প্রার্থনার সুরে বলেছিলেন :

আমাদের সেই ব্যক্তিদের দাও,
প্রত্যেক পর্যায়ের সব ব্যক্তিবর্গকে,
যারা সতেজ, মুক্ত এবং উদার হৃদয়।
যারা চিন্তা করেন এবং অনুশীলন করেন।
আলোকোজ্জ্বল এবং সৃজনশীল নেতৃত্বের অধিকারী।
জাতীয় স্বার্থের প্রতি অনুগত এবং সৎবংশজাত।
যাদের লক্ষ্য জাতীয় কল্যাণ সাধন।

একজিটারের বিশপের প্রার্থনার প্রতিধ্বনি করে আমরাও বলতে চাই : বাংলাদেশের এই দুর্দিনে তেমনি নেতৃত্বই সমধিক উপযোগী যা সহৃদয় ও সৃজনশীল, যা উদার অথচ ব্যাপকভিত্তিক এবং যা সদয় কিন্তু জাতীয় স্বার্থ সংরক্ষণে কৃতসংকল্প।

জাতীয় স্বার্থের বৃদ্ধি এবং সংরক্ষণের পথ মূলত দুটি। **এক.** বৃহত্তর পর্যায় থেকে ক্রমে ক্রমে নিচে নেমে এসে সমগ্র জাতীয় জীবনকে স্পর্শ করা প্রবৃদ্ধির ধারা। **দুই.** ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সাফল্যের দ্বীপ রচনা করে এই দ্বীপমালার সমন্বয়ে বৃহত্তর মহাদেশ গড়ে তোলা। আমাদের মতো উন্নয়নশীল দেশে প্রথমটি থেকে দ্বিতীয়টির আবেদনই সর্বাপেক্ষা অধিক। তাই বলব, দেশের অসংখ্য সংবাদপত্রের মধ্যে দিনকাল যদি সত্যের প্রতি, সমাজ এবং সমাজে বসবাসকারী জনসমূহের প্রতি, বিশেষ করে তাদের অধিকার এবং উন্নত জীবনবোধ উন্মেষের প্রতি দায়বদ্ধতার ছোট্ট মাটির প্রদীপটি জ্বালিয়ে রেখে পথ চলে এবং চলতে চলতে নিজেদের সৃজনশীলতার ছোট্ট দ্বীপের প্রতি সকলকে আহবান করে, তাহলে কে জানে, একদিন হয়ত এইটি হয়ে উঠবে একটি সুবর্ণ দ্বীপ। হয়ে উঠতে পারে অন্যদের এক তীর্থক্ষেত্র। এরই স্বর্ণচ্ছটা হয়ত চারদিক আলো করে একদিন সবার জন্যে আলোর পথ রচনা করে তুলবে। আজকে সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে দলীয় চিন্তা, সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি এবং স্থবিরতার যে বিরাট মরুভূমি তৈরি হয়েছে মুক্তিযুদ্ধের রক্তাক্ত প্রান্তরে প্রাণ পাওয়া বাংলাদেশে, দিনকালই হয়ত হয়ে উঠবে সবুজ মখমলে ঢাকা স্নিগ্ধতা পরিপূর্ণ এক মরুদ্যান। আমরা তাই প্রত্যাশা রাখছি দিনকালের এই শুভ জন্মদিনে।

www.pathagar.com

গণতন্ত্র ও তথ্যের অবাধ প্রবাহ

কোনো নাগরিককে তথ্য সম্ভারে সমৃদ্ধ করার অর্থ হল সেই নাগরিককে সমৃদ্ধ করাএ ["To inform is to keep a citizen in-form."] এবং সমৃদ্ধ নাগরিকদের মাধ্যমেই শুধু গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে অথপূর্ণ করা সম্ভব। সরকার কর্তৃক অথবা সরকারের কোনো এজেন্সি কর্তৃক রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অপব্যবহার রোধ করতে হলে এবং শাসনকারী কর্তৃপক্ষের স্বেচ্ছাচারী কোনো সিদ্ধান্তের অপপ্রয়োগ রোধ করতে হলে নাগরিকদের তথ্য সম্ভারে সমৃদ্ধ করার কোনো বিকল্প নেই। উন্নয়নশীল বিশ্বের দুর্ভাগ্য, সকল তথ্য এবং যেসব উপাত্তের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় অথবা নীতি প্রণীত হয় তাদের ওপর একচেটিয়া অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে শাসনকারী এলিটদের। পরম পরাক্রমশালী এলিট গোষ্ঠির হাতেই সকল তথ্যের সমাবেশ ঘটেছে। এলিট শ্রেণী ক্ষমতার দুর্গে তাদের অবস্থানকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে এবং সমাজে তাদের প্রভাবকে স্থায়ী করার জন্যে সর্বাগ্রে এই তথ্য-সম্পদের ওপর তারা নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে থাকেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে "সরকারি গোপনীয়তার" (Official Secrecy) অজুহাতে তাদের নিয়ন্ত্রণ সুদৃঢ় করে থাকেন।

গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ এবং সুশাসনের মৌল অঙ্গীকারের ভিত্তি কিন্তু ভিন্ন। শর্তবিহীনভাবে নাগরিকদের নিকট তথ্যের ভাণ্ডার উন্মুক্ত থাকতে হবে অন্তত দুটি কারণে। **এক.** তথ্য সম্পর্কে সজ্ঞাত না হয়ে কোনো নাগরিক সামাজিক এবং রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপে অংশগ্রাহক নাগরিক (Participant Citizen) হতে পারেন না। **দুই.** নাগরিকগণ একবার তথ্য ভাণ্ডারের অংশীদার হয়ে উঠলে যেসব সরকারি কর্মকর্তা বিভিন্ন পর্যায়ে নীতি নির্ধারণ ও নীতি বাস্তবায়নে কর্মরত রয়েছেন তাদেরকে জনগণের সেবায় নিয়োজিত হতে বাধ্য করতে পারেন। এভাবেই সরকার দায়িত্বশীল হয়ে ওঠে। সরকারি কর্মকর্তাদের জবাবদিহিতা নিশ্চিত হয়। দেশের নাগরিকরা উন্নয়নমূলক কর্মে আত্মনিয়োগে উদ্বুদ্ধ হয়ে ওঠেন। তখন রাজনীতি কল্যাণমূলক কার্যক্রমে রূপান্তরিত হয়। রাষ্ট্রকে তখন আর কেউ "পৈতৃক সম্পত্তি" (Paternal Property) হিসেবে গণ্য করতে সাহসী হয় না। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা তখন আর ক্ষমতাসীনদের প্রভাব, বৈভব ও সম্পদের মার্ধম হিসেবে ব্যবহৃত হয় না।

গণতন্ত্র সম্পর্কে যুগে যুগে যারাই চিন্তাভাবনা করেছেন তাদের প্রত্যেকে এজন্যে তথ্যের অবাধ প্রবাহের কথা বলেছেন। বলেছেন তথ্যের মাধ্যম সংবাদপত্রের স্বাধীনতার কথা। তারস্বরে প্রশংসা করেছেন সাংবাদিকদের তথ্যনিষ্ঠ সাহসী ভূমিকার। কোনো কোনো দার্শনিক তথ্যের অবাধ প্রবাহের ভিত্তিতে সরকারের শ্রেণী বিভাগও করেছেন। যে সরকার তথ্যের অবাধ প্রবাহের নিশ্চয়তা বিধানে সক্ষম তাই গণতান্ত্রিক

www.pathagar.com

সরকার (Democratic Government)। যে সরকার তথ্যের প্রবাহকে হাজারো প্রতিবন্ধকতার জালে আটকে রেখেছে তা কর্তৃত্বব্যঞ্জক বা স্বৈরাচারী (Authoritarian)।

আমাদের সংবিধান সম্পর্কে আমরা গর্ববোধ করি বিভিন্ন কারণে। এই সংবিধানের ৭ অনুচ্ছেদে উল্লিখিত হয়েছে : "প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ।" ["All powers in the Republic belong to the people."] শুধুমাত্র ৭ অনুচ্ছেদেই নয়, সংবিধানের ১১, ৩৯ এবং ৪১ অনুচ্ছেদেও এর বিভিন্ন অভিব্যক্তির প্রকাশ ঘটেছে। কিন্তু তার পরেও বলব, বাংলাদেশে তিন দশকেও সংবিধানের ৭ অনুচ্ছেদে যে স্বপ্নের সূচনা, তার বাস্তবায়নের কোনো ব্যবস্থা দেখা যায়নি। দেখা যায়নি জনপ্রতিনিধিদের শাসনামলে। দেখা যায়নি সামরিক শাসনামলেও। এর মূলে কারণ হল, অবাধ তথ্য প্রবাহকে এদেশের শাসকগোষ্ঠী বরাবর সন্দেহের চোখে দেখেছে। আর নিজেদের স্বার্থকে জনগণের স্বার্থের সাথে এক করে দেখার শিক্ষা গ্রহণ করেনি। তারা জনগণের স্বার্থ সম্পর্কে লম্বা লম্বা বক্তৃতা দেয়, কিন্তু জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা কোনোদিন ধারণ করেনি। সব সময় জনগণকে ব্যবহার করেছে নিজেদের ক্ষমতারোহণের সোপানরূপে। বরং এও দেখা গেছে, যাদের মুখে "জনগণ", "জনস্বার্থ", "গণদাবি" প্রভৃতি শব্দ সবচেয়ে বেশি উচ্চারিত হয়েছে, জনগণের স্বার্থ তাদের হাতেই সবচেয়ে বেশি ক্ষুণ্ন হয়েছে।

আমাদের দেশের মতো দেশে গণতন্ত্রকে জনস্বার্থের উপযোগী করার জন্যে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন হল রাজনৈতিক দল, সংবাদ মাধ্যম, জাতীয় সংসদ, স্থানীয় সরকারের মতো প্রতিষ্ঠানগুলিকে শুধুমাত্র গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় সংগঠিত করাই যথেষ্ট নয়, এগুলিকে গণতন্ত্রের অন্তরঙ্গ হৃদয় নিংড়ানো প্রাণরসে জারিত করতে হবে। সাথে সাথে ব্যাপকভিত্তিক গণ-সংশ্লিষ্টতা নিশ্চিত করতে হবে যেন জনগণের যুক্তিবুদ্ধি, বুদ্ধিবৃত্তি এবং ধ্যান-ধারণার প্রভাব প্রত্যেকটি সিদ্ধান্তে প্রতিফলিত হয়ে ওঠে। এটিই হল গণতন্ত্রের বুদ্ধিবৃত্তিক অভিব্যক্তি (Intellectual Dimension of Democracy)। রাজনৈতিক দল, সংবাদপত্র, সংসদের মতো প্রতিষ্ঠানগুলিকে যদি গণতন্ত্র-দেহের অস্থিপিঞ্জরের সাথে তুলনা করা হয়, বুদ্ধিবৃত্তিক অভিব্যক্তিকে বলা যেতে পারে এই দেহের রক্ত কণিকা। এই দুই এর সুষম সমন্বয় ঘটলেই গণতন্ত্র অর্থপূর্ণ হবে। হবে প্রাণবন্ত। অন্যথায় নয়। আমাদের দেশের গণতন্ত্রের কাঠামো তৈরি হয়েছে বটে, কিন্তু নেতানেত্রীর মধ্যে গণতান্ত্রিক মননের কোনো স্ফূরণ এখনো ঘটেনি। ঐ কাঠামোগুলোয় রক্ত কণিকার যথার্থ সঞ্চালন এখনো ঘটেনি। আজকের দিনে বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক ব্যত্যয়ের ব্যাখ্যা এভাবে দেয়া যায়।

যুক্তরাষ্ট্রের প্রাথমিক পর্যায়ে যিনি গণতন্ত্রের প্রাণপুরুষরূপে চিহ্নিত হয়েছিলেন সেই জেফারসন (Jefferson) অনুভব করেছিলেন, গণতন্ত্রকে সফলভাবে কার্যকর করতে হলে সংবাদপত্রের মাধ্যমে জনগণকে সর্বপ্রথম সজ্ঞাত রাখতে হবে এবং সংবাদপত্রগুলিকে এমনভাবে বিন্যস্ত করতে হবে যেন তা জনপদের সকল জনগণের কাছাকাছি চলে যেতে পারে। তিনি এ সম্পর্কে বলেছিলেন : "যেহেতু আমাদের

www.pathagar.com

সরকারের ভিত্তি হল জনমত, তাই আমাদের প্রথম লক্ষ্য হওয়া উচিত সেই অধিকারের সংরক্ষণ। এবং আমার নিকট যদি সংবাদপত্র ব্যতীত সরকার অথবা সরকার ব্যতীত সংবাদপত্র – এমন বিকল্পের মধ্য থেকে একটিকে বাছাই করার সুযোগ আসত তাহলে আমি দ্বিতীয়টি বেছে নিতে এক মুহূর্তও দেরি করতাম না।" ["The basis of our government being the opinion of the people, the very first object should be to keep that right, and were it left to me to decide whether we should have a government without newspapers, or newspapers without a government, I should not hesitate a moment to prefer the latter."]

যুক্তরাষ্ট্রে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সাফল্যের মূলে রয়েছে এমনি সাহসী বিশ্বাসের চিন্তাবিদদের গুরুত্বপূর্ণ অবদান। জেফারসনের আমলে সুস্থ প্রেস বলতে বুঝাত শুধুমাত্র সংবাদপত্র। দিন পাল্টিয়েছে। প্রযুক্তির অভাবনীয় অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। বিশ্বময় তা বিস্তৃত হয়েছে। আজকে সংবাদপত্র বা প্রিন্ট মিডিয়া প্রেসের একটি মাত্র উপাদান। সংবাদপত্র ছাড়াও রয়েছে আজ রেডিও, টেলিভিশন এবং অন্যান্য ইলেকট্রিক সারকিট্স্, ইন্টারনেট ও অন্যান্য অত্যন্ত উন্নত পর্যায়ের যোগাযোগ মাধ্যম। আমাদের রাজনৈতিক নেতৃত্ব যদি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে জীবন ঘনিষ্ঠ করতে চান তাহলে সকল তথ্য মাধ্যমকে তাদের মুক্ত করে দিতে হবে। তথ্য মাধ্যমের উপর থেকে সকল নিয়ন্ত্রণের অবসান ঘটাতে হবে। সমাজে গণতান্ত্রিক চেতনা বিকাশের প্রথম শর্তই হল এই বুদ্ধিবৃত্তিক শর্তটি। পারবে কি আমাদের রাজনৈতিক এই মহান পদক্ষেপ গ্রহণ করতে? এই প্রশ্নের উত্তরের উপর নির্ভর করছে তাদের সার্বিক সাফল্য অথবা ব্যর্থতা।

www.pathagar.com

ইসলামে জবরদস্তির কোনো স্থান নেই

বাংলার এক কৃতী সন্তান স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর *রাজযোগের* তৃতীয় অধ্যায়ে লিখেছেন : [ভারতে] মুসলিম শাসনের নিকট আমরা ঋণী। মুসলিম শাসন এসেছিল এক মহান আশীর্বাদরূপে। কোন কোন গোষ্ঠির উপভোগকৃত সুযোগ-সুবিধার ধ্বংসকারীরূপে। [ভারতের] দরিদ্র এবং দলিতদের মুক্তির বার্তা নিয়েই মুসলমানদের ভারত বিজয় সংঘটিত হয়েছিল। এ কারণেই ভারতের এক-পঞ্চমাংশ জনসমষ্টি মুসলমান হয়ে গিয়েছিলেন। তরবারীর ভূমিকা এক্ষেত্রে ছিল গৌণ। কেউ যদি বলেন, এজন্যে দায়ী তরবারী এবং আক্রমণ, তা হলে তা হবে মস্ত পাগলামী" ["To the Mohammedan rule we owe . . . great blessing, the destruction of exclusive privilege ..... The Mohammedan conquest of India came as a salvation to the down-trodden, to the poor. That is why one-fifth of our people have become Mohammedans. It was not the sword that did it all. It would be the height of madness to think it was all the work of sword and fire."] ইসলাম যে শান্তির ধর্ম এবং শান্তির ললিত বাণী নিয়েই যে যুগে যুগে মানুষকে দাওয়াত দিয়েছেন ইসলামী দর্শনে আলোকিত এবং প্রাজ্ঞ মনীষীরা তা ইতিহাসেই সুস্পষ্ট। পবিত্র কোরআন শরীফেই বিবৃত হয়েছে ঃ " ধর্মে বাধ্যবাধকতা বা জোরের কোনো স্থান নেই।" ("There is no compulsion in religion"–Surat-Al-Baqarah 2:256)। সূরা আল-কাহ্‌ফে বর্ণিত হয়েছে : "সত্য এসেছে তোমার প্রভুর নিকট থেকে। যার ইচ্ছা হবে বিশ্বাস করবেন এবং ইচ্ছা হবে অবিশ্বাস করবেন" ("The truth is from your Lord. Let him who will, believe, and let him who will, reject it"–Surat-Al-Kahf 18:29)। ইসলাম এক সর্বজনীন ধর্ম এবং হযরত মুহাম্মদকে (সাঃ) পাঠানো হয়েছিল শুধুমাত্র মুসলমানদের জন্যে নয়, সমগ্র মানব জাতির জন্যে। ইসলামের মূল মন্ত্র হল সাম্য, সহিষ্ণুতা এবং সৌভ্রাতৃত্ব। পরমত সহিষ্ণুতা এর অলঙ্কার। আকাশ ছোঁয়া উদারতা ইসলামের গৌরবোজ্জ্বল আবহ। সাম্যের চিরন্তন বাণী হল ইসলামের শ্রেষ্ঠতম বৈশিষ্ট্য। সৌভ্রাতৃত্বের অন্তরঙ্গ আবেদন এর প্রাণস্বরূপ। স্বাধীনভাবে মত প্রকাশের অধিকার ইসলামের সৌন্দর্য।

১৭৭৬ খ্রিষ্টাব্দে আমেরিকার যে কলোনিগুলি ব্রিটিশ শাসনের নাগপাশ থেকে মুক্তির জন্যে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয় তাদের মূল শ্লোগানের দিকে দৃষ্টি দিন, দৃষ্টি দিন ১৭৮৯ খ্রিষ্টাব্দের ফরাসি বিপ্লবের মূল শ্লোগানের দিকে, দেখবেন ইসলামী জীবন ব্যবস্থার যে রূপরেখা ৬২২ খ্রিষ্টাব্দে রচিত হয়েছিল মদিনা রাষ্ট্রে এবং যেসব নীতির ভিত্তিতে মদিনা রাষ্ট্র পরিচালিত হয়েছে, সেসব নীতির অনুরণন শোনা যায় প্রায় হাজার বছর পরে

www.pathagar.com

আমেরিকায় এবং ফ্রান্সে। সাম্য, স্বাধীনতা ও সৌভ্রাতৃত্বের শ্লোগান অথবা স্বাধীনতা, সাম্য এবং সুখের অন্বেষণ–এসবই গৃহীত হয়েছে ইসলামী জীবন দর্শন থেকে। ইসলামই উন্নত জীবনের সওগাত নিয়ে উপস্থিত হয়েছে বৃহত্তর মানবতার বিস্তীর্ণ মোহনায়। এক্ষেত্রে সংকীর্ণতার কোনো অন্ধকার ইসলামী জীবনবোধকে কালিমা লিপ্ত করেনি। সাম্প্রদায়িকতার অরুচিকর মানসিকতা এখানে সর্বৈব পরিত্যাজ্য। বিশ্বাসের ক্ষেত্রে জোর প্রয়োগের মধ্যযুগীয় বর্বরতা এক্ষেত্রে নিষিদ্ধ। ছুঁৎমার্গ অথবা অস্পৃশ্যতার অন্ধকারাচ্ছন্ন মানসিকতার কোনো স্থান নেই ইসলামে। ইসলামী জীবনাদর্শ এক উজ্জ্বল আলোকবর্তিকা তুল্য। এই আলোয় আলোকিত হতে যারা চেয়েছে, নীতির ঔজ্জ্বল্যে সব অন্ধকার ঘুচিয়ে যারা সুষমাভরা জীবনের গতিপথ অনুসন্ধান করেছে, সংকীর্ণতাকে জয় করে যারা বিশ্বময় ভ্রাতৃত্বের সুখদ পরিবেশে জীবনের অর্থ খুঁজেছেন তারাই স্বেচ্ছায়, স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে ইসলামের পতাকাতলে সমবেত হয়েছেন। এই প্রাপ্তিতে অহঙ্কার অথবা আত্মম্ভরিতার কোনো ক্লেদ তাদের মনকে কলুষিত করেনি। শ্রেষ্ঠত্বের অহমিকায় তাদের মননশীলতা ধূলি ধূসরিত হয়নি। বরং আকাশের মতো আরো উদার হয়েছেন তারা। হয়েছেন জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা প্রসূত অভিজ্ঞান সমৃদ্ধ হয়ে সমুদ্রের মতো গভীর এবং প্রশান্ত।

দেশ-বিদেশের জ্ঞানী-গুণীজন তাই ইসলামী জীবন দর্শনের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন যুগে যুগে। লেনিন, স্ট্যালিন, ট্রটস্কি ও গোর্কির সহকর্মী ও সুহৃদ, ভারতের কম্যুনিস্ট পার্টির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা এবং মেক্সিকোর কম্যুনিস্ট পার্টির সদস্য, এই উপমহাদেশের বামপন্থীদের গুরু কমরেড এমএন রায় ১৯৩১ সালে প্রকাশিত তার *The Historical Role of Islam* গ্রন্থের ৮৮ পৃষ্ঠায় লিখেছেন : "ইতিহাসের রঙ্গমঞ্চে ইসলামের মহান ভূমিকা সম্পর্কে আমাদের সময়ের অল্প সংখ্যক মুসলমানই সজ্ঞাত" ["Very few of the Muslims of our time are aware of the great role played by Islam in the play-house of history."] ঐ গ্রন্থের ৬৩ পৃষ্ঠায় তিনি আরো লিখেন : "আবেগহীন ও বিজ্ঞানসম্মত বিশ্লেষণের ফলে যখন ইতিহাস থেকে কিংবদন্তি আর ভয়ঙ্কর সব কল্পকথা মুছে যায় তখন এটি সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে যে ইসলামের অভ্যুত্থান মানব জাতির জন্যে অভিশাপ নয় বরং এক আশীর্বাদ" ["When dispassionate and scientific study of history dissipates legends and discredits malicious tales, the rise of Islam stands out not as a scourge but a blessing to mankind."]। ভারতের এক শ্রেণীর সংকীর্ণমনা, সাম্প্রদায়িক দোষে দুষ্ট, ধর্মান্ধ হিন্দু মহাসভার নেতৃবৃন্দের ইসলামের সমালোচনার জবাবে তিনি এই বক্তব্য রাখেন। ভারতের শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তিত্ব মহাত্মা গান্ধী ১৯৪০ সালে *The Harijan* পত্রিকায় লিখেন : "ইসলামকে আমি মহান নৈতিকতায় উদ্বুদ্ধ একটি ধর্ম হিসেবে নিশ্চিতভাবে জ্ঞান করি। তাই আমি পবিত্র ক্বোরআনকে মনে করি মহান আদর্শের ভাণ্ডাররূপে এবং মোহাম্মদকে (সাঃ) শ্রদ্ধা করি একজন পয়গম্বর রূপে" ["I certainly regard Islam as one of the inspired religions, and therefore the Holy Koran as an inspired book and Mohammad as one of the

www.pathagar.com

prophets."-The Harijan, 13 July 1940] তারও পূর্বে, ১৯২৪ সালের ১০ জুলাই প্রকাশিত *Young India* তে তিনি লিখেছিলেন ঃ "ইসলামের বিস্তার তরবারীর জোরে ঘটেনি, ঘটেছে ধারাবাহিকভাবে - বেশ কিছু সংখ্যক ওলি-আউলিয়া-ফকিরদের আন্তরিক গভীর ভালবাসার জোরে" ["Islam has spread not by the power of the sword, but by the powerful love of an unbroken line of its saints and Fakirs."]

মহাত্মা গান্ধীর এই বক্তব্যের প্রতিধ্বনি শোনা যায় ১৯৯০ সালে নরম্যান এ্যান্ডারসনের লিখিত গ্রন্থের-*Islam in the Modern World : A Christian Perspective*-প্রতি লাইনে। তিনি লিখেছেন, মুসলিম আমলের প্রথম শতকে ইসলামের অভাবনীয় বিস্তৃতির মূলে মুসলমানদের সুঠাম দৈহিক গঠন এবং আরব সৈন্যবাহিনীর পরাক্রম, বিশেষ করে খালিদ বিন ওয়ালিদ ও অন্যান্য সামরিক প্রতিভার নেতৃত্ব কিছুটা দায়ী ছিল বটে, কিন্তু এই বিস্তৃতির মূল কারণ ছিল শান্তিপূর্ণ প্রক্রিয়ায় সাধারণ মানুষের মনে উন্নত জীবন দর্শনের আবেদন এবং তাদের স্বতঃস্ফূর্তভাবে ইসলাম গ্রহণ। গ্রন্থের ৯৫-৯৬ পৃষ্ঠায় তিনি লিখেছেন : "মালয়শিয়া, ইন্দোনেশিয়া এবং ফিলিপিনসে এবং পূর্ব ও পশ্চিম আফ্রিকায় মুসলমানদের প্রভাব ব্যাপকভিত্তিক হয়ে ওঠে প্রধানত বাণিজ্য এবং শান্তিপূর্ণ অনুপ্রবেশের ফলে" ["It was chiefly through trade and peaceful penetration that Muslim influence became widespread in Malaysia, Indonesia and the Philippines as also in East and West Africa."]।

বর্তমান বিশ্বে ইন্দোনেশিয়াতে রয়েছেন সর্বাধিক সংখ্যক মুসলমান। ইন্দোনেশিয়া কোনো সময় কিন্তু মুসলিমদের আগ্রাসনের শিকার হয়নি। অন্যদিকে, পাক-ভারত-বাংলা উপমহাদেশে মুসলিম শাসনের ব্যাপ্তি ছিল প্রায় এক হাজার বছর-৭১২-১৮৫৭ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত। এই উপমহাদেশের শিক্ষা-সংস্কৃতি, সাহিত্য-সংস্কৃতি, ভাস্কর্য-নির্মাণ শৈলী, এমনকি খাদ্যাভাস, আচার-আচরণ, পোষাক-পরিচ্ছদ পর্যন্ত গভীরভাবে প্রভাবিত হয় মুসলিম শাসকদের দ্বারা। তারপরেও এই উপমহাদেশে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত মুসলমানদের সংখ্যা মোট জনসমষ্টির এক-চতুর্থাংশের বেশি হয়নি। অন্য কথায়, ইসলামের বিস্তৃতি ক্ষেত্রে তরবারির জোরের কোনো প্রভাব কোনো সময়ে ছিল না। তারপরেও স্বার্থান্বেষী মহল থেকে শত সহস্রবার প্রচারিত হয়েছে, তরবারিই ছিল ইসলামের অকল্পনীয় বিস্তারের প্রধান উপাদান। এই মিথ্যা অভিযোগ সম্পর্কে O' Leary and De Lac - কর্তৃক ১৯২৩ সালে লিখিত গ্রন্থের-*Islam at the Crossroads* - ৮ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে : "ইতিহাসে এটি সুস্পষ্ট হয়েছে যে. ধর্মান্ধ মুসলমানরা বিশ্বের সর্বত্র ঝড়ের বেগে ছুটে গেছেন, ভূখণ্ড দখল করেছেন এবং দখলিকৃত ভূখণ্ডে তরবারীর জোরে ইসলাম গ্রহণে জনসমষ্টিকে বাধ্য করেছেন - ঐতিহাসিকদের ঝরে বারে উচ্চারিত এই কিংবদন্তি সর্বাপেক্ষা অবিশ্বাস্য, অসত্য এবং ভ্রান্ত।" ["History makes it clear however that the legend of fanatical Muslims sweeping through the world and forcing Islam at the point

www.pathagar.com

of the sword upon conquered races is one of the fantastically absurd myths that historians have ever repeated."] তারপরেও বিশ্বের বিভিন্ন অংশে, বিশেষ করে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে ইসলামের বিকৃত ব্যাখ্যা দেয়া অব্যাহত রয়েছে এবং প্রচার করা হচ্ছে যে, ইসলামের এই জবরদস্তিমূলক প্রবণতা আধুনিক সভ্যতার জন্যে মারাত্মক। ১৯৯৬ সালেও নিউইয়র্ক টাইমস পত্রিকায় লিখিত হয় : "লাল ভীতি ('কমুনিস্টদের উপদ্রব') দূর হয়েছে বটে, কিন্তু ইসলাম এখনো রয়েছে।" ('The Red menace is gone, But here's Islam.')।

ইসলামের অবদান সভ্যতার বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিচিত্রভাবে সুস্পষ্ট। আট থেকে বারো শতক সময়কালে মুসলিম বিশ্বে জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা ছিল একদিকে যেমন শিকড় সন্ধানী, অন্যদিকে তেমনি ব্যাপকভিত্তিক। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে, বিশেষ করে আলেকজান্দ্রিয়া, বাগদাদ, কর্ডোভা, সিরাজের শিক্ষায়তনে প্রশিক্ষিত হয়েছিলেন অসংখ্য তীক্ষ্ণধী, মেধাবী শিক্ষাবিদ, চিকিৎসক, জ্যোতির্বিজ্ঞানী, পদার্থবিদ, সমাজবিজ্ঞানী, রাষ্ট্রবিজ্ঞানী, ইতিহাসবেত্তা এবং আইন বিশারদ। ঐ সময়ে মুসলমানদের বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চা এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে অর্জিত উৎকর্ষ সম্পর্কে মন্তব্য করে পবিত্র ক্বোরআনের অনুবাদক রডওয়েল (Rodwell) তার *The Koran* গ্রন্থে ১৯০৯ সালে লিখেছিলেন : "আরবের সাদাসিদে মেষপালক ও যাযাবর বেদুইনরা মনে হল যেন এক অবিশ্বাস্য যাদুর স্পর্শে সংহত হয়ে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে। শুধু তাই নয়, তারা নতুন নতুন নগরীর পত্তন করে। অসংখ্য পাঠাগার গড়ে তোলে। বাগদাদ, কর্ডোভা এবং দিল্লীর মতো ক্ষমতাকেন্দ্রিক নগরী এমনভাবে সুসজ্জিত হয় যার ভয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে ইউরোপ।" ["The simple shepherds and wandering Bedouins of Arabia are transformed, as if by a magic wand, into the founders of empires, the builders of cities, the collectors of books and manuscripts .... in libraries, while the cities like . . . Baghdad, Cordova and Delhi attest the power at which Christian Europe trembled."–Rodwell, P 16]।

ইউরোপ কেন মুসলিম বিশ্বকে তার প্রতিপক্ষ বা শত্রু জ্ঞান করে সে সম্পর্কেও গত এক দশকে অসংখ্য প্রবন্ধ-নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে এবং এদের অধিকাংশেই লিপিবদ্ধ হয়েছে ইসলামের অন্তর্নিহিত সামর্থ্য, উন্নত জীবনাদর্শ এবং বিশ্বজয়ী নৈতিকতার তাৎপর্য। ১৯৯৪ সালের আগস্ট ৬-১২ সংখ্যার *The Economist* পত্রিকায় গবেষণাধর্মী "A survey of Islam and the West" শীর্ষক দীর্ঘ প্রবন্ধে ইসলামের অন্তর্নিহিত শক্তিমত্তার কথা উল্লিখিত হয়েছে। সাথে সাথে এও উল্লিখিত হয়েছে যে, আট শতকে সৃষ্ট ইসলাম সম্বন্ধে ভীতি বারো এবং তেরো শতক পর্যন্ত, এমনকি এখন পর্যন্ত তার রেশ অব্যাহত রয়েছে। এই প্রসঙ্গে P. Hoodbhoy-এর লিখিত *Islam and Science* গ্রন্থে ইউরোপের ইসলাম ভীতির ব্যাখ্যাও মিলে। তিনি লিখেছেন : "আমাদের প্রধান সমস্যা হল এই যে, মধ্যযুগের যুদ্ধবাজ প্রচারণার গভীর সংস্কারের উত্তরাধিকার আমরা এখনো বহন করে চলেছি। অষ্টম শতকের প্রথম থেকেই খ্রিষ্টান ইউরোপ ইসলামকে চিহ্নিত করা শুরু করেছে তার প্রধান শত্রু হিসেবে, কেননা

www.pathagar.com

সামরিক এবং আধ্যাত্মিক উভয় ক্ষেত্রেই ইউরোপ সন্ত্রস্তবোধ করেছে। ইসলাম সম্পর্কে এই ভীতি বারো ও তেরো শতকের শেষ পর্যন্ত ইউরোপের ভাবনা-চিন্তার ক্ষেত্রে গভীর প্রভাব বিস্তার করে এসেছে। বিশ শতকের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত তা অব্যাহত থাকে" ["The difficulty is that we are heirs of a deep seated prejudice which goes back to the war propaganda of the medieval times. From about the eighth century A.D Christian Europe began to be conscious of Islam as her great enemy, threatening her both military and the spiritual spheres. . . . .The image created in the twelfth and thirteenth centuries continued to dominate European thinking about Islam and even in the second-half of the twentieth century had some vestigial influence."]

সত্যি বটে, খ্রিষ্টান ইউরোপ মুসলিম বিশ্বের বিরুদ্ধে ক্রুসেডের যুদ্ধক্ষেত্রে যে চপেটাঘাত হজম করেছিল মধ্যযুগে, তার স্মৃতিটুকু এখনো স্মরণে রেখেছে। তা না হলে শান্তিপূর্ণ জীবনের ধর্ম ইসলামের বিরুদ্ধে কার বলার কি আছে? ইসলাম হল সাম্য, মৈত্রী এবং সৌভ্রাতৃত্বের ললিত বাণীর আকর। ইসলাম হল উন্নত জীবনবোধের পতাকাবাহী জীবনঘনিষ্ঠ নৈতিকতার গভীর খনি। ইসলাম হল আধুনিকতায় সমুজ্জ্বল জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার আকাশছোঁয়া ঔৎসুক্য ও গভীর অনুশীলনের প্রতীক। তাই যেকোনো পর্যালোচক অনুসন্ধান করুন, ইসলামের তাত্ত্বিক দর্শনের দিকে দৃষ্টি দিন অথবা এর ব্যবহারিক ও প্রায়োগিক দিকে দৃষ্টি দিন, ইসলামী জীবন ব্যবস্থায় যে জোর-জবরদস্তির কোনো স্থান নেই তা সূর্যালোকের মতো সুস্পষ্ট হবে। এতে এতটুকু সন্দেহের স্থান নেই।

www.pathagar.com

নওয়াব স্যার সলিমুল্লাহকে ভোলে কার সাধ্য?

মাত্র ৪৪ বছরের একটি জীবন, অথচ এই অল্প সময়ে নওয়াব সলিমুল্লাহ সমগ্র জাতির মনের মণিকোঠায় আজও উজ্জ্বল হয়ে রয়েছেন। মাত্র ১০ বছরের প্রকৃত কর্মকাল এই জীবনের, কিন্তু এই ১০ বছরে তিনি এমন স্থায়ী অবদানে জাতীয় মানসকে সমৃদ্ধ করেন যে, আজও সর্বজনস্বীকৃত হয়ে রয়েছেন এই জাতির অন্যতম শ্রেষ্ঠ সন্তানরূপে। ঢাকা মহানগরীর শ্রেষ্ঠ সন্তান এই মনীষীর জীবনালেখ্য তাই একদিকে যেমন অত্যন্ত আকর্ষণীয়, অন্যদিকে তেমনি আদর্শস্থানীয়। তাই বলি এদেশের এই মহান পুরুষকে ভোলে কার সাধ্য?

পিতার মৃত্যুর পরে জ্যেষ্ঠপুত্র হিসেবে ১৯০১ সালে তিনি ঢাকার নওয়াবের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ১৯০২ সালে তদানীন্তন ব্রিটিশ সরকার তাঁকে "সিএসআই" (CSI) উপাধিতে ভূষিত করেন। ১৯০৩ সালে তিনি "নওয়াব বাহাদুর" খেতাব লাভ করেন। ১৯০৬ সালে তিনি হন সিআইই (CIE)। ১৯০৯ সালে তাঁকে দেয়া হয় কেসিএসআই (KCSI) উপাধি এবং ১৯১১ সালে দিল্লীতে অনুষ্ঠিত আড়ম্বরপূর্ণ দিল্লি দরবারে তাঁকে ভূষিত করা হয় জিসিআইই (GCIE) উপাধিতে। এত অল্প সময়ে কোনো ব্যক্তিকে এতগুলি সম্মানসূচক খেতাবে ভূষিত হতে আর কাউকে দেখা যায় না।

সত্যি বটে, সোনার চামচ মুখে দিয়েই তিনি জন্মগ্রহণ করেন এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে। ঐ সময়ের ভূস্বামীরা যেভাবে বিলাসিতায় গা ভাসিয়ে মাটির এই পৃথিবীতে স্বর্গ নামিয়ে আনতেন সেভাবে বিলাসী জীবনযাপন করেই তিনি চোখ বুজতে পারতেন। সেপথে তিনি পা বাড়াননি। স্বল্পক্ষণ স্থায়ী আমোদ-আহলাদের পথ নওয়াব সলিমুল্লাহর ছিল না। তিনি ছিলেন এক মহান পুরুষ। মহত্তর উদ্যোগেই তাই তিনি তার জীবনটাকে উৎসর্গ করেন। এজন্যে বাংলাদেশের কোটি কোটি জনসমষ্টি গভীর শ্রদ্ধাভরে এই মহান ব্যক্তিত্বের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধাবনত।

যখন খাজা সলিমুল্লাহ নওয়াবের দায়িত্ব গ্রহণ করেন তখন এদেশের গণমানুষের অবস্থা কি ছিল, বিশেষ করে ব্রিটিশ রাজত্বের প্রথমপর্বে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান-অধ্যুষিত পূর্ব বাংলায় মুসলমানদের অধিকাংশের মানবেতর অবস্থা পর্যালোচনা করুন, অনুভব করবেন, বিবেকবান এই মানুষটির ভূমিকা ছিল একজন ত্রাতার ভূমিকা। ১৯০৫ সালের ১৬ অক্টোবরে ব্রিটিশ সরকার বঙ্গদেশকে বিভক্ত করে, ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী ও আসামের সমন্বয়ে পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশ গঠন করেন। ঢাকা হয় এই নতুন প্রদেশের রাজধানী। ব্রিটিশ সরকারের এই বঙ্গবিভাগ তথা নতুন প্রদেশ গঠনের পরিকল্পনাকে কলকাতা-কেন্দ্রিক বুদ্ধিজীবীরা, বিশেষ করে হিন্দুপ্রধান কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানান। এক্ষেত্রে ব্রিটিশ সরকারের "ভাগ করো শাসন করো।" ('Divide and rule') নীতির প্রভাব ছিল বটে, কিন্তু কলকাতার "ভদ্রলোক"দের

www.pathagar.com

অভিযোগ ছিল অন্য জায়গায়। যে পূর্ববাংলা কলকাতা-কেন্দ্রিক "ভদ্রলোক"দের এক বিরাট চারণক্ষেত্ররূপে এতদিন তাদের শোষণ ও শাসনের এক উর্বর ভূমিরূপে কাজ করে এসেছে তা এর ফলে হাতছাড়া হচ্ছে। তাদের ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্র সঙ্কুচিত হচ্ছে। কলকাতার সমৃদ্ধির পথ রুদ্ধ হচ্ছে। সর্বোপরি, পূর্ব বাংলার যে মুসলমানরা এতদিন "ভারবাহী জন্তুর" মতো তাদের সর্বস্ব দিয়ে কলকাতার সেবাদাস হিসেবে কাজ করেছে তাদের সেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। ঢাকার নওয়াব সলিমুল্লাহ কিন্তু এসব কারণেই ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গকে সমর্থন করেন যেন পূর্ব বাংলা আপন গৌরবে মাথা উঁচু করে দাঁড়ায়। এই প্রেক্ষিতে খাজা সলিমুল্লাহর অবদান মূল্যায়ন করতে হবে।

খাজা সলিমুল্লাহ ব্রিটিশ শাসনে পূর্ব বাংলার মুসলমানদের দুর্দশার কারণ সঠিকভাবেই অনুধাবন করেন। তাঁর মতে, এই অঞ্চলের মুসলিম জনসমষ্টি দুর্দশাগ্রস্ত হয়ে পড়েছেন দুটি কারণে : **এক.** তারা কলকাতা তথা পশ্চিম বঙ্গের জনসমষ্টির মতো সংহত নন। যে কংগ্রেস সাধারণ জনগণের নামে সংগঠিত হয় ১৮৮৫ সালে, অল্পদিনের মধ্যেই তা উচ্চ বর্ণ হিন্দুদের এক সংগঠনে রূপান্তরিত হয়। তাতে শুধু উচ্চ বর্ণের হিন্দুদের প্রাধান্যই সুস্পষ্ট হয়নি, হিন্দু স্বার্থের ধারক হয়ে ওঠে সর্বভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস। **দুই.** পূর্ব বাংলার মুসলমানরা শিক্ষাদীক্ষায় অত্যন্ত পশ্চাৎপদ হয়ে পড়ে, বিশেষ করে আধুনিক শিক্ষা বা ইংরেজি শিক্ষায় এক হতদরিদ্র, দুস্থ ও অনগ্রসর সমাজে পরিণত হয়। ফলে ব্যবসা-বাণিজ্য, সরকারি চাকরি, উন্নত পেশার জন্যে তারা পুরোপুরি অনুপযুক্ত হয়ে পড়ে। ১৭৫৭ সালের পূর্বে মুসলমানদের জন্যে উর্দু-ফার্সী-আরবী শিক্ষার সুযোগ ছিল। মোগল আমলে বঙ্গদেশে ছিল প্রায় ৮০,০০০ মাদ্রাসা। এদেশে ব্রিটিশ শাসন প্রবর্তিত হবার পরে এসব মাদ্রাসার বৃহৎ অংশই সরকারি অনুদান বঞ্চিত হয়ে বন্ধ হয়ে যায়। ইংরেজি শিক্ষার জন্যে যেসব নতুন স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয় সেসব বিদ্যায়তনে মুসলমান ছাত্রছাত্রীদের জন্যে সুযোগ-সুবিধা সীমিত হয়ে আসে দুটি কারণে : (১) মুসলমানদের দারিদ্র্য। (২) অনেক মুসলিম পরিবার তাদের সন্তানদের ইংরেজি শিক্ষা দিতেও নারাজ ছিল। তাই এক হিসেবে দেখা যায়, ১৯০১ সালে প্রতি দশ হাজার মুসলমানের মধ্যে মাত্র ২২ জন ইংরেজি শিখেছে, অন্যদিকে হিন্দু পরিবারে দেখা যায় প্রতি দশ হাজারে ইংরেজি জানা লোকের সংখ্যা ছিল ১১৪ জনের মতো।

সমস্যা যখন খাজা সলিমুল্লাহ একবার চিহ্নিত করলেন তখন তার সমাধানের জন্যেও তিনি ব্যবস্থা গ্রহণে অগ্রসর হলেন। ১৯০৫ সালে তিনি সর্বপ্রথম "প্রভিন্সিয়াল মোহামেডান ইউনিয়ন" নামে একটি রাজনৈতিক সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন পূর্ব বাংলার মুসলিম নেতৃবৃন্দের সমন্বয়ে। এর লক্ষ্য ছিল এই অঞ্চলের মুসলমানরা যেন নিজেদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হতে পারে। পূর্ব বাংলার মুসলিম জনসমষ্টির জন্যে এটি ছিল প্রথম রাজনৈতিক সংগঠন। ১৯০৬ সালের ৩০ ডিসেম্বরে শাহবাগে নওয়াবদের বাগানবাড়িতে সর্বভারতীয় পর্যায়ে মুসলিম নেতাদের সমন্বয়ে যে "অল ইন্ডিয়া মোহামেডান এডুকেশনাল কনফারেন্সের" বিশতম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়, সেই অধিবেশনে অল ইন্ডিয়া মুসলিম লীগ (All-India Muslim League) সংগঠিত হয়। খাজা সলিমুল্লাহ এই সংগঠনের সহ-সভাপতি হন এবং এর গঠনতন্ত্র প্রণয়ন কমিটির

www.pathagar.com

প্রধানের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ১৯০৭ সালের ডিসেম্বরে কলকাতার ডালহৌসী ইনস্টিটিউট হলে নওয়াব সলিমুল্লাহর সভাপতিত্বে পশ্চিম ও পূর্ব বাংলার মুসলিম জনসমষ্টির জন্যে প্রতিষ্ঠিত হয় নিখিল বঙ্গ মুসলিম লীগ (All-Bengal Muslim League) এবং তিনি নির্বাচিত হন এর সভাপতি। নিখিল বঙ্গ মুসলিম লীগ, বিশেষ করে নিখিল ভারত মুসলিম লীগ ভারতের মুসলিম জনসমষ্টিকে সংঘবদ্ধ করে একদিকে সর্বভারতীয় কংগ্রেসের আধিপত্যের বিরুদ্ধে এবং অন্যদিকে পূর্ব বাংলায় হিন্দু জমিদার ও মহাজনদের পীড়নের বিরুদ্ধে আন্দোলন শাণিত করে। ফলে তাই হয়ে ওঠে পাকিস্তানের ভিত্তি এবং ১৯৪৭ সালের পূর্ব পাকিস্তান ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের আগুনে পুড়ে হয়ে ওঠে স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ। তাই অতীব সন্তুষ্টির সাথে লক্ষ্য করা যায় যে, স্যার সলিমুল্লাহর রাজনৈতিক দূরদৃষ্টির আলোকেই এদেশের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, বুদ্ধিজীবী এবং সংগ্রামী জনতা পথ চিনে নিজেদের ভাগ্য পরিবর্তনে উদ্যোগী হন তাঁর মৃত্যুর তিন দশক পরে। এই দুর্গম পথের দিশারী স্যার সলিমুল্লাহ।

স্যার সলিমুল্লাহর মতে, শিক্ষা হল জীবন সংগ্রামের প্রকৃষ্ট পাথেয়, কোনো ধরনের মানসিক বিলাস নয়। শিশু-কিশোর-তরুণ-তরুণীদের এমন শিক্ষা দেয়া দরকার যা তাদের সুস্থ নাগরিকরূপে গড়ে তুলবে। প্রাদেশিক শিক্ষা সমিতির প্রথম অধিবেশনে সভাপতির ভাষণে (১৯০৬) তিনি বলেন : "শিক্ষা সম্পর্কে আমার নিজস্ব ধারণা রয়েছে। আমাদের সন্তানদের এমন শিক্ষা দেয়া প্রয়োজন যা তাদের উত্তম নাগরিক হতে সহায়তা করে এবং জীবনের বিভিন্ন দায়িত্ব নিপুণভাবে পালনে সহায়ক হয়ে উঠবে।" ["I have my own ideas about the sort of education that should be imparted to our children to fit them to become good citizens and capable of discharging their various duties in life efficiently."]

মুসলিম জনসমষ্টির অগ্রগতির জন্যে, তাঁর মতে, সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন পাশ্চাত্যের আধুনিক শিক্ষাদীক্ষা। প্রাদেশিক শিক্ষা সমিতির অধিবেশনে তিনি বলেন : "আমরা দেখছি, মুসলমানরা জীবনের প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে পড়েছে। এর মূল কারণ হল আধুনিক চিন্তাভাবনার সাথে তাদের কোনো পরিচয় নেই। সংশ্লিষ্টতা নেই অত্যাধুনিক তত্ত্ব এবং আধুনিক কালের প্রয়োজনীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাথে।" ["We find Mahomedans left behind in the race of life on account of their not being abreast of modern thought and being ill-equipped with the more advanced theories and methods demanded by modern times."] তাই তিনি সাধারণ শিক্ষা ছাড়া কৃষিবিদ্যা, শিল্প শিক্ষা ও বাণিজ্য শিক্ষার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। মুসলমানদের মধ্যে আধুনিক শিক্ষা বিস্তারের জন্যে তিনি বহু সংখ্যক প্রাথমিক বিদ্যালয় তৈরি করেন। প্রচলিত মাদ্রাসা শিক্ষাকে যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে ১৯০৬ সালে শাহবাগে অনুষ্ঠিত প্রাদেশিক মুসলিম শিক্ষা সমিতির সভায় তিনি মাদ্রাসা শিক্ষা সংস্কারের প্রস্তাব গ্রহণ করেন। ১৯০৯ সালে সরকার কর্তৃক গঠিত শিক্ষা সংস্কার কমিটির তিনি সদস্য হন এবং ১৯১৫ সালে নিউ স্কীম মাদ্রাসা শিক্ষা পদ্ধতি প্রবর্তনে তাঁর সুপারিশসমূহ গৃহীত হয়। ১৯১২ সালের মাঝামাঝি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্কীম

www.pathagar.com

রচনার জন্যে গঠিত নাথান কমিটির অধীনে ইসলামিক স্টাডিজ বিষয়ক সাব-কমিটির সদস্য হিসেবে নওয়াব সলিমুল্লাহ সিলেবাস প্রস্তুতি পর্বে সহায়তা করেন। পিতার প্রতিশ্রুতি পালনের লক্ষ্যে তিনি ঢাকার ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ প্রতিষ্ঠাকল্পে ১৯০১ সালে এক লক্ষ টাকা সরকারের হাতে তুলে দেন। প্রতিষ্ঠিত হয় নওয়াব আহসানউল্লাহ ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ। তাই পরবর্তীতে দেশে খ্যাতনামা প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হয় বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়রূপে (Bangladesh University of Engineering and Technology)। তাঁর গৌরবময় ভূমিকা ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে। ১৯১২ সালের ২১ জানুয়ারি তদানীন্তন গভর্নর জেনারেল লর্ড হার্ডিঞ্জ ঢাকা সফরে এলে তিনি শাহবাগে তাকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করেন। সেই উপলক্ষে তিনি এই অঞ্চলের মুসলমানদের দাবিনামা তুলে ধরেন গভর্নর জেনারেলের নিকট। এই দাবির মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল ঢাকায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা। বঙ্গভঙ্গ রদের ক্ষতিপূরণের জন্যে ব্রিটিশ সরকার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দাবি মেনে নিয়েছিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯২১ সালের জুলাই মাসে। এই মহতি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠা ক্ষেত্রে তাঁর অবদানের স্বীকৃতি জানিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম কোর্ট সভায় এদেশের আর এক সুসন্তান এ কে ফজলুল হক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন সূচক প্রস্তাব উত্থাপন করেন। এই প্রস্তাবে বলা হয় : "বিশ্ববিদ্যালয় কোর্টের প্রথম সভায় মরহুম নওয়াব সলিমুল্লাহর প্রতি পূর্ব বাংলার মুসলমানদের কৃতজ্ঞতার স্বীকৃতিস্বরূপ এই প্রস্তাব উপস্থাপন করছি। তিনি ছিলেন তাঁর দেশ ও জনগণের একনিষ্ঠ সেবক। তিনি ছিলেন তাদের উন্নয়ন ও অগ্রগতির ক্ষেত্রে এক নির্ভীক ও নিবেদিতপ্রাণ সৈনিক।" ["In the first meeting of the University Court I moved the resolution regarding the appreciation and gratefulness of the Muslims of East Bengal to the late Nawab Salimullah who was a true lover of his country and people, and a courageous and unselfish figther for their progress and prosperity."] এমনি উদার হৃদয় এবং জনকল্যাণে নিবেদিতপ্রাণ জাতীয় নেতাকে ভোলে কার সাধ্য?

www.pathagar.com

স্মৃতিতে বেগম রোকেয়া কলেজ, রংপুর

হঠাৎ টেলিফোন পেলাম প্রফেসর মোঃ আবদুস সালেকের নিকট থেকে। তিনি বর্তমানে বেগম রোকেয়া কলেজের সম্মানীয় অধ্যক্ষ। আমার বাসায় তিনি এলেন এবং অনুরোধ করলেন, বেগম রোকেয়া কলেজ মুখপত্রের জন্যে কিছু লিখুন। রাজি হলাম কিছু লিখব বলে। কিন্তু লেখার সময় সমস্যায় পড়লাম। কোথা থেকে শুরু করব? কি লিখব? সেই মহান শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কোন দিকটি সম্পর্কে আলোকপাত করব? যখন কলেজটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তখন তো তার নাম বেগম রোকেয়া কলেজ ছিল না। তখন তার নাম ছিল Rangpur Women's College–খুব জোর রংপুর মহিলা কলেজ। কীভাবে, কাদের সুপরামর্শে, কার উদ্যোগে এই কলেজটি এই উপমহাদেশের সেই মহিয়সী মহিলার মহান স্মৃতির ভার বহন করল–সঠিকভাবে জানি না। তারপরেও কিছু কথা লিখব বলে কথা দিয়েছিলাম। তাই এই লেখাটি। সম্পূর্ণরূপে নিজের স্মৃতির ওপর ভর করে। তাই আগেই বলে রাখছি, কোনো তথ্যগত ভুল থাকলে পাঠক যেন নিজগুণে ক্ষমা করেন। শুরুও করছি নিজেকে দিয়ে।

ঠিক চল্লিশ বছর আগের কথা। আমি তখন নীলফামারী কলেজে অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করছিলাম। ঐ কলেজে অধ্যক্ষরূপে যোগদান করেছিলাম ১৯৬১ সালের ৩ মে। যখন যোগদান করি তখন কলেজের অবস্থা ভালো ছিল না। ক্লাশ হত স্থানীয় হাইস্কুলের একটি হোষ্টেলে। না ছিল তার নিজস্ব ভবন, ছিল না নিজস্ব কোনো জায়গা। ঘর-দুয়ারের কথা তো দূরে থাক। ছোট্ট কলেজটি মাত্র ক'বছর আগে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। শুরু হয়েছিল ইন্টারমিডিয়েট আর্টস এবং কমার্স দিয়ে। আমি যোগদান করার পূর্বে শুরু হয়েছিল বিএ পাস কোর্সের প্রথম বছর। কলেজের এমন দুরবস্থার কথা জানলে হয়ত ঐ দায়িত্ব নিতে যেতাম না। যোগদানের চার মাসের মধ্যে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজ পরিদর্শক নীলফামারী কলেজ পরিদর্শন করে এক হতাশাজনক রিপোর্ট প্রদান করেন এবং কলেজের অ্যাফিলিয়েশনের সমাপ্তি ঘোষণা করেন। তাঁর অভিযোগ ছিল : কলেজের নিজস্ব ভবন নেই। নেই নিজস্ব ক্যাম্পাসের কোনো স্থায়ী পরিকল্পনা। প্রয়োজনীয় রিজার্ভ ফান্ড নেই। গ্রন্থাগারে প্রয়োজনীয় সংখ্যক বই নেই। ফান্ড তৈরির সার্থক কোনো উদ্যোগ নেই। ছাত্রসংখ্যাও নয় আশানুরূপ। কলেজটির বৃদ্ধিরও কোনো আশা নেই।

এই পরিস্থিতিতে হতাশ হওয়া ছাড়া আর কি থাকতে পারে। ঢাকা এলাম শিক্ষা পরিদপ্তরে শিক্ষা কর্মকর্তাদের সাথে আলাপ-আলোচনার জন্যে। কোনো উন্নয়ন পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত করা যায় কি না তার সম্ভাবনা যাচাই করার জন্যে। এক্ষেত্রেও হতাশ হয়েছিলাম। শিক্ষা দপ্তরের সুপারিশ ছিল–নীলফামারী কলেজের বিজ্ঞান শাখাকে উন্নয়ন পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে যদি একটি বিজ্ঞান ভবন নিজস্ব জায়গায়

www.pathagar.com

তৈরি করা হয় এবং রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় যদি বিজ্ঞান শাখার অ্যাফিলিয়েশন মঞ্জুর করে। এমনি পরিস্থিতিতে ঢাকা থেকে ফিরছি এক বোঝা দুশ্চিন্তা মাথায় নিয়ে চারদিকের অন্ধকার হাতড়িয়ে, কোনো আশার আলোর সন্ধান লাভে ব্যর্থ হয়ে। খানিকক্ষণের জন্যে পার্বতীপুর জংশন স্টেশনে বিশ্রাম নিয়ে নীলফামারী যাত্রা করব। হয়ত কলেজ ছেড়ে চলে যাব অন্য কোনো কলেজে। এমন শ্রীহীন অবস্থায় আত্মসম্মান বজায় রেখে কলেজের অধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালন যে সম্ভব নয় তা অনুধাবনে কোনো অসুবিধা তখন হয়নি।

এই অবস্থায় দেখা হল প্রথম শ্রেণীর বিশ্রাম কক্ষে মোহাম্মদ আমিরুজ্জামানের সাথে। আমিরুজ্জামান একজন সিএসপি অফিসার। দু'জনেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনা করেছি। আমি রাষ্ট্রবিজ্ঞানে আর তিনি খুব সম্ভব অর্থনীতিতে। তখনো আমাদের মধ্যে সদ্ভাব ছিল। দুজন দুজনকে ভালোভাবে চিনতাম, জানতাম। তিনি চলেছেন নীলফামারী মহকুমা প্রশাসকের দায়িত্ব গ্রহণের জন্যে। মনভাঙা মানুষটি আমি। ভাবছি কীভাবে কলেজের অধ্যক্ষের দায়িত্ব ছেড়েছুঁড়ে বেরিয়ে আসা যায়। এই ক্রান্তিলগ্নে বেশ খানিকদিন পরে, দুজনের দেখা হল পার্বতীপুর জংশনে। এই ইতিহাস দীর্ঘ না করে শুধু এটুকু বলতে চাই, আমরা দুজনে ঐখানে কয়েকটি বিষয়ে ঐকমত্যে উপনীত হই। কলেজের একাডেমিক এডমিনিস্ট্রেশন আমি দেখব আর অর্থনৈতিক দিকটা তিনি দেখবেন। আমি পরামর্শ দেব আর তিনি বাস্তবায়ন করবেন। দিনক্ষণ পুরোপুরি মনে নেই, তবে খুব সম্ভব ১৯৬১ সালের নভেম্বর অথবা ডিসেম্বর।

মাস ছয়েক দুজনে নীরবে কাজ করেছিলাম। ছয়মাস পরে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজ পরিদর্শককে কলেজটি পরিদর্শনের জন্যে আবারো আমন্ত্রণ জানালাম। তিনি দ্বিতীয় বার কলেজ পরিদর্শনে আগ্রহী ছিলেন না। তারপরেও বহু অনুনয় বিনয় করে, এক পর্যায়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য মহোদয়কে দিয়ে অনুরোধ করিয়ে, তাকে রাজি করানো হয়। তারও মাস ছয়েক পরে তিনি এলেন নীলফামারী। এর পরের দিনগুলি ঘটনাবহুল। কলেজ পরিদর্শক অর্থাৎ সালাহউদ্দিন আহমদ পরিদর্শনের পরে যা লিখেছিলেন তা ইতিহাস। তিনি লিখেছিলেন : এক বছর আগে কলেজের অবস্থা যা ছিল তার বৈপ্লবিক পরিবর্তন হয়েছে। তখন রিজার্ভ ফান্ডে ২৫০০ টাকা দেখিনি, এখন দেখছি ঐ ফান্ডে রয়েছে ৫০,০০০ টাকার মতো। এরই মধ্যে কলেজের জন্য জমি কেনা হয়েছে এবং সেই জমিতে বিজ্ঞান ভবন তৈরি হচ্ছে। সরকারি উন্নয়ন প্রকল্পে কলেজের বিজ্ঞান বিভাগ অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। বিভিন্ন বিষয়ে যোগ্য শিক্ষক নিয়োগ দেয়া হয়েছে। এক বছরের মধ্যে ছাত্র সংখ্যা দ্বিগুণ হয়েছে। কলেজে নির্ভরযোগ্য প্রশাসন কর্মরত রয়েছে এবং মহকুমা প্রশাসক ও জেলা প্রশাসকের ঐকান্তিক আগ্রহ লক্ষ্য করার মতো।

এত কথা বললাম শুধুমাত্র একথা বলার জন্যে যে, মহকুমা পর্যায় থেকে জেলা সদরে আমি কেন এলাম, কাদের আগ্রহে এবং কি লক্ষ্যে তা সুস্পষ্ট করার জন্যে। এসডিও (SDO) আমিরুজ্জামান নীলফামারী থেকে বদলি হলেন রংপুরের অতিরিক্ত জেলা প্রশাসকরূপে, খুব সম্ভব ১৯৬২ সালের শেষ দিকে অথবা ১৯৬৩ সালের প্রথম দিকে।

www.pathagar.com

রংপুরে অবশ্য তাঁর বেশদিন থাকেননি। অল্পদিন পরেই তিনি ঢাকা চলে যান। তার স্থলাভিষিক্ত হন আবদুস সাত্তার। আমিরুজ্জামান সাহেবের মতো তিনিও ছিলেন সিএসপি (CSP) অফিসার। পরে তিনি যুক্তরাষ্ট্রে পিএইচডি (Ph.D) করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রাবস্থায় আমরা ফজলুল হক হলে থেকেই লেখাপড়া করেছিলাম। তখন রংপুরের জেলা প্রশাসক ছিলেন ওয়ায়েসুল মুস্তফা কারনী (O M Qarni)। এককালে ভারতের উত্তর প্রদেশের অধিবাসী। পরে পাকিস্তানে চলে আসেন তার পরিবার।

রংপুরের কারমাইকেল কলেজ যখন সরকারি কলেজে রূপান্তরিত হয়, খুব সম্ভব ১৯৬২ সালে, তখন থেকেই জেলা প্রশাসন এবং রংপুরের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ রংপুরে একটি বেসরকারি কলেজ এবং একটি মহিলা কলেজ প্রতিষ্ঠার চিন্তা-ভাবনা করছিলেন। আমিরুজ্জামান সাহেবের উৎসাহে এবং জেলা প্রশাসক কারনী সাহেবের পৃষ্ঠপোষকতায় এই পরিকল্পনা অনেক দূর অগ্রসর হয়। যখন আবদুস সাত্তার রংপুরের এডিসি (ADC) হয়ে এলেন তখন থেকে সেই পরিকল্পনা আরো সুদৃঢ় হয়। তার স্ত্রী এলেন সাত্তার ছিলেন একজন উচ্চশিক্ষিত মহিলা। বিদেশিনী বটে, কিন্তু এদেশটাকে তিনি আপন করে নিয়েছিলেন। রংপুর মহিলা কলেজ হলে তিনিই হবেন ঐ কলেজের অধ্যক্ষা–তাও নির্দিষ্ট হয়েছিল।

রংপুরে তার সাথে দেখা করতে এসেছিলাম নীলফামারী থেকে। দেখা করতে এসেই জড়িয়ে পড়েছিলাম অনেকটা আষ্টেপৃষ্ঠে। তিনি ধরে বসলেন, রংপুর কলেজের দায়িত্ব নিতেই হবে। তার এই চাপাচাপির একটা কারণ ছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজ পরিদর্শক তখন জেলার অন্তর্গত কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে রিপোর্ট করলে জেলা প্রশাসককে তা অবগত করার নিয়ম ছিল। নীলফামারী কলেজ সম্পর্কিত রিপোর্টটি সেই নিয়মে তিনি কারনী সাহেবকে জানিয়েছিলেন। সেখান থেকে সাত্তার সাহেব জানতে পারেন। তাছাড়া, আমিরুজ্জামান সাহেবের নিকট থেকেও তিনি তা অবগত হন। এমনিতেই আবদুস সাত্তার ছিলেন আমার এক সহকর্মী বিশ্বদ্যিালয় জীবনে। আমি যখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফজলুল হক মুসলিম হল ইউনিয়নের সহ-সভাপতি নির্বাচিত হই ১৯৫৩-৫৪ সেশনে, আবদুস সাত্তার ছিলেন সেই কেবিনেটের সহ-সাধারণ সম্পাদক। আমার ঘনিষ্ঠ সহযোগী ও সমর্থকদের অন্যতম ছিলেন আবদুস সাত্তার। তাই তিনি যখন অনুরোধ করেন, এমাজ ভাই আপনাকে রংপুর কলেজের দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে তখন আমি না করিনি। আমার রাজি হবার আর একটি কারণ ছিল। যে নীলফামারী কলেজকে আমি প্রায় শূন্যস্থান থেকে একটি সম্ভাবনাময় কলেজে রূপান্তরিত করি, বিশেষ করে মোহাম্মদ আমিরুজ্জামানের সহযোগিতায়, তিনি বদলি হবার পরে যে ভদ্রলোক নীলফামারীর এসডিও (SDO) হিসেবে যোগদান করেছিলেন, তার সাথে আমার সম্পর্কটা তেমন ভালো যাচ্ছিল না। তার নাম এখন আর মনে নেই। তার বিরুদ্ধেও আমার আর কোনো অভিযোগ নেই। কিন্তু তিনি ছিলেন একজন ব্যুরোক্র্যাট, সরকারি আমলা। কর্তৃত্ব প্রদর্শনেই ছিল তার আগ্রহ। এসডিও অথবা ডিসির সাথে দেখা করার জন্যে একজন কলেজ অধ্যক্ষকে দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে–এই ধারণা

www.pathagar.com

আমার ছিল না। আমিরুজ্জামান সাহেব বা কারনী সাহেবের সাথে কথা বলার জন্যে আমার কোনো পূর্বানুমতির দরকার হত না। যখনই গেছি অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে বাক্যালাপ হয়েছে। দীর্ঘদিনের ব্যবধানে তারাই বরং ছুটে গেছেন হয় কলেজে অথবা আমার বাসায়। আমিরুজ্জামানের সাথে বিভিন্ন বিষয়ে (কলেজ ছাড়াও) আলোচনা হত সপ্তাহে দুই কি তিন দিন। নতুন এসডিও একটি সভার তারিখ নির্ধারণের জন্যে আমাকে ডেকে পাঠিয়ে প্রায় ঘণ্টাখানেক বসিয়ে রেখেছিলেন। ঘণ্টাখানেক অপেক্ষা করে আমি চলে এসেছিলাম। আর তার কার্যালয়ে আমি যাইনি।

এদিকে, যেদিন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক আবদুস সাত্তারের সাথে আমার দেখা হয়েছিল তার ক'দিন পরেই তিনি বদলির আদেশ পান। বদলির আদেশ পেয়ে আর দেরি করেননি, অবিলম্বে আমাকে ডেকে পাঠান রংপুরে। রংপুর পৌঁছুলে তিনি আমাকে জেলা প্রশাসক ওএম কারনীর নিকট নিয়ে গিয়ে বলেছিলেন : এমাজউদ্দীন আহমদকে আমি নিয়ে এসেছি। তিনি একাই রংপুর কলেজ ও রংপুর মহিলা কলেজের দায়িত্বে থাকবেন। এলেনসহ আমি তো চলেই যাচ্ছি আগামী সপ্তাহে। ঐদিনটি ছিল ১৯৬৩ সালের ১৬ কি ১৭ আগস্ট। ঐদিনেই আমাকে রংপুর কলেজের অধ্যক্ষ হিসেবে নিয়োগপত্র দেয়া হবে। আরো কথা হয়, এলেন সাত্তার চলে গেলে রংপুর মহিলা কলেজের অধ্যক্ষ হিসেবে আমি দায়িত্ব পালন করব। এভাবে আমি নীলফামারী কলেজ ছেড়ে রংপুরে পৌঁছেছিলাম ১৯৬৩ সালের ২০ আগস্ট।

দিনটি সম্ভবত ছিল ১৯৬৩ সালের ২৩ আগস্ট। সকাল দশটা নাগাদ শহরের একপ্রান্তে, একটা পুকুরের ধারে, কয়েকটা পুরোনো ভবনের মাঝামাঝি, এক ছোট্ট খোলা জায়গায় রংপুর মহিলা কলেজের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়। কলেজে ভর্তি শুরু হয় তার মাসখানেক পূর্বে। সংখ্যাটি সঠিক মনে নেই, খুব সম্ভব ৩০ কি ৩৫ জন ছাত্রী নিয়ে রংপুর মহিলা কলেজ যাত্রা শুরু করে। আস্তে আস্তে এই সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেছিলেন জেলা প্রশাসক কারনী। সেদিন তিনি ধবধবে সাদা পায়জামা ও পাঞ্জাবী পরে এসেছিলেন। অধিকাংশ সময় তিনি এই পোষাক পরতেন। এসেছিলেন শাড়ি পরে বেগম কারনীও। সাত্তার সাহেব তার অভ্যাসমতো বুশ শার্ট গায়ে দিয়ে উপস্থিত হন। মিসেস এলেন সাত্তারকে শাড়ি পরে বেশ জমকালো দেখাচ্ছিল। ঐ সময়ে যেসব অধ্যাপক কলেজে যোগ দিয়েছিলেন তাদের মধ্যে ছিলেন বাংলা বিভাগের হোসনে আর আখতার, খালেদা আদিবা, অর্থনীতির শামসী আরা, ইংরেজির মোহাম্মদ কুতুবউদ্দীন, দর্শনের মনীষা রায়, ইসলামের ইতিহাসের রহিমা খাতুন এবং আরো অনেকে। শহরের গণ্যমান্য ব্যক্তিরাও উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেছিলেন জেলার শিক্ষা অফিসার।

ঘণ্টাখানেকের সেই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে জনাব কারনী বলেছিলেন, রংপুরের দীর্ঘদিনের স্বপ্ন বাস্তবায়িত হল। তখন শিক্ষার মাধ্যম ছিল ইংরেজি। সবাই ইংরেজিতেই বক্তব্য রেখেছিলেন। কারনী সাহেব বাংলা জানতেন না। সাত্তার সাহেব তার স্বভাবসুলভ হাল্কাভাবে বলেছিলেন, এরপর থেকে রংপুরের মেয়েদের ভালো বর পেতে আর তেমন অসুবিধা হবে না। সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে আমি বলেছিলাম, দীর্ঘ যাত্রাপথের সূচনা হল।

www.pathagar.com

ভবিষ্যতে এই বিদ্যায়তন ফুলে-ফলে ভরে উঠবে। এলেন সাত্তারও কিছু কথা বলেছিলেন। সম্ভবত তিনি বেশিদিন থাকতে পারছেন না এই দুঃখবোধ প্রকাশ করে। অনুষ্ঠানের পরে এক চা-চক্রের আয়োজন হয়। বিদায় মুহূর্তে এলেন সাত্তারের সেই বাক্যটি আমার মনে আছে। উষ্ণ কর মর্দনের পরে তিনি বলেছিলেন : This is your baby now. Please take care of it. আমি উত্তরে শুধু বলেছিলাম : It was conceived by you and Mr. Sattar, now given to my charge. I will take good care of this baby.

ঐদিন বিকেলেই রংপুর কলেজের উদ্বোধন হয় শহরের মধ্যখানে, কৈলাস রঞ্জন হাইস্কুলে একটি রাত্রিকালীন কলেজ হিসেবে। উদ্বোধন করেন জেলা প্রশাসক ওএম কারনী, বহুসংখ্যক অতিথি, শিক্ষক ও অভ্যাগতদের উপস্থিতিতে। অনুষ্ঠানের ধারা বিবরণী দীর্ঘতর হতে বাধ্য। তাই বেশি কিছু না বলে এটুকু শুধু বলব, রংপুরের মতো শান্তিপূর্ণ, সহজ-সরল মানুষদের শহরে এ দুটি প্রতিষ্ঠানের জন্মের সূচনায় আমি শুধু উপস্থিত ছিলাম তাই নয়, এদের শ্রীবৃদ্ধিতে আমার ছোট্ট একটা ভূমিকা ছিল। এটি আমি গর্বভরে স্মরণ করি। রংপুর কলেজের বৃদ্ধি এক দিক থেকে ঐতিহাসিক। ঐতিহাসিক এই অর্থে যে, জন্মক্ষণেই তার আকার ছিল মস্ত বড়ো। প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ষ কলা, প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ষ বিজ্ঞান, প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ষ বাণিজ্য, ৩য় এবং চতুর্থ বর্ষ কলা, ৩য় বর্ষ ও চতুর্থ বর্ষ বাণিজ্য–নিয়েই শুরু হয় এর যাত্রা। ছাত্রসংখ্যা হাজারখানেক। কলেজ প্রতিষ্ঠার পরে যখন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজ পরিদর্শক সালাহউদ্দীন সাহেবের নিকট অধিভুক্তির জন্যে যাই, তখন তিনি চমকে উঠেছিলেন। বলেছিলেন এমন কলেজ তো এদেশে কখনো হয়নি। একেবারে পরিপূর্ণ একটি কলেজ। অ্যাফিলিয়েশন কীভাবে সম্ভব? কলেজ শুরু হয় প্রথম বর্ষের ছাত্র নিয়ে, তাও একটি অথবা দুটি ফ্যাকাল্টি মাত্র। কীভাবে এর অধিভুক্তি হবে?

আমি শুধু বলেছিলাম, আপনি তো নীলফামারী কলেজের অ্যাফিলিয়েশন দিয়েছিলেন। জেলা শহরে এ কলেজটির অবস্থা আরো ভালো। তিনি পরিদর্শনে এসেছিলেন। পরিদর্শন করেছিলেন রংপুর কলেজ ও রংপুর মহিলা কলেজও। দেখেশুনে তিনি খুশি হন। মাস তিনেক পরে দুই কলেজের অধিভুক্তি সম্পন্ন হয়। এই দৃষ্টান্ত অন্যকোনো ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না বলেও তিনি মন্তব্য করেন।

রংপুরের এই দুটি কলেজ রংপুরের অমূল্য সম্পদ। সেদিনের ছোট্ট মহিলা কলেজটি বিদূষী মহিলা রোকেয়ার নাম ধারণ করে দিনে দিনে বেড়ে উঠেছে। কলা বিভাগের সাথে সংযুক্ত হয়েছে বাণিজ্য ও বিজ্ঞান। শুনেছি এর মনোরম অট্টালিকা নির্মিত হয়েছে। পরিবেশ মনোমুগ্ধকর হয়েছে। এর বহু ছাত্রী প্রতিষ্ঠা লাভ করে জাতীয় অঙ্গনে নিজেদের বলিষ্ঠ ভূমিকা রেখে চলেছেন। বাংলাদেশ সচিবালয় ও অন্যান্য স্থানে মাঝে মাঝে দেখা যায় এই কলেজের কোনো কোনো ছাত্রীর সাথে। আমি না চিনলেও তারা চিনে এগিয়ে আসে এবং সালাম দিয়ে জানিয়ে দেয়, তারা বেগম রোকেয়া কলেজের প্রাক্তন ছাত্রী। মনটা গর্বে ভরে ওঠে। রংপুর কলেজের ইতিহাসও তেমনি। প্রথম বছরে

www.pathagar.com

তা ছিল রাত্রিকালীন কলেজ। পরের বছরে এর দিবা বিভাগ খোলা হয়। তৃতীয় বছরে এর স্থায়ী ভবনের নির্মাণ কাজ শুরু হয়। সারাদিনটাকে আমি ভাগ করেছিলাম তিন ভাগে। সকালে যেতাম মহিলা কলেজে। ১২টার পরে রংপুর কলেজের দিবা বিভাগে। সন্ধ্যার পরে নৈশ বিভাগে। কাটিয়েছিলাম তিন বছর, ১৯৬৬ সালের আগস্ট মাস পর্যন্ত। চলে এসেছিলাম জেলা প্রশাসক হেদায়েত আহমদের সাথে মনোমালিন্যের জন্যে। সারা দেশে তখন আইয়ুব খানের চণ্ড শাসন। তারই প্রতিনিধিত্ব করতেন তখনকার পরাক্রমশালী সিএসপি পর্যায়ের শাসকবৃন্দ। হেদায়েত আহমদ শুধু শাসকই ছিলেন। শাসকের দৃষ্টিকোণ থেকে সব কিছুকে দেখতেন। জনকল্যাণ বা হিতকর কর্ম অথবা জাতীয় স্বার্থ সম্বলিত বিষয় তাদের নিকট ছিল গৌণ। শুধু নির্দেশই দিতে তারা শিখেছিলেন, অনুধাবনের সক্ষমতা তাদের ছিল না। তিনি অবশ্য ইন্তেকাল করেছেন। মৃত্যুর পূর্বে রংপুরে আমার সাথে তিনি যে আচরণ করেছিলেন তার জন্যে হাত ধরে ক্ষমা চেয়েছিলেন একাধিকবার। তাকে address করার সময় তিনি চাইতেন সবাই তাকে স্যার বলুক। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়া করার সময় তাকে চিনতাম। তিনিও আমাকে চিনতেন। তারপরেও তিনি প্রত্যাশা করতেন তাকে আমি ঐভাবে সম্বোধন করব। তাই তিনি ক্ষুব্ধ ছিলেন। একদিন অন্য আর একটি বিষয়ে তার সাথে দ্বিমত পোষণ করে আমার পদত্যাগ পত্র তার দিকে ছুঁড়ে ফেলে চলে এসেছিলাম। দীর্ঘদিন পরে ঢাকায় যখন তার সাথে দেখা হয় কোনো এক সেমিনারে, সম্ভবত ১৯৮৫ সালে, কুমিল্লায়, তিনিই বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়েছিলেন। তারপর আবার আমরা বন্ধু হই।

রংপুরের এ দু'টি কলেজ প্রতিষ্ঠা ও কলেজ দুটির শ্রীবৃদ্ধিতে অত্যন্ত সহায়ক ভূমিকা পালন করেছিলেন মোহাম্মদ আমিরুজ্জামান, ড. সাত্তার, ড. ইকরাম (সাত্তার সাহেবের পরে তিনি এডিসি হয়ে এসেছিলেন এবং পরবর্তীতে তিনি অর্থনীতিতে পিএইচ ডি করেন) এবং ওএম কারনী। সাত্তার সাহেব ইন্তেকাল করেছেন বেশ খানিকদিন পূর্বে। তার দুই ছেলে ও স্ত্রী এলেন সাত্তার এখন বসবাস করেন মালয়েশিয়ায়। আমিরুজ্জামান সাহেব পরবর্তীকালে বিশ্ব ব্যাঙ্কের চাকুরিতে যোগ দিয়েছিলেন। এখন সস্ত্রীক বসবাস করেন ঢাকায়। ইকরাম সাহেবও ঢাকার অধিবাসী। কারনী সাহেব বাংলাদেশ হবার পূর্বেই অপশন দিয়ে পাকিস্তানে চলে গেছেন। পরবর্তীকালে জেলা প্রশাসক হিসেবে কাজ করেছেন আমার অন্য এক বন্ধু কাজী আজহার আলী। তিনি এখন একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য। রংপুরের এই দুটি কলেজ এসব খ্যাতিনামা কর্মকর্তার নিকট বিভিন্নভাবে ঋণী। আমরা যখন মাঝে মাঝে একত্রিত হই তখন অতীত স্মৃতিগুলি আনন্দের সাথে রোমন্থন করি। গর্ববোধ করি। কিছু ভালো উদ্যোগের সাথে সম্পৃক্ত ছিলাম বলে গৌরববোধ করি।

তখন আমি পায়জামা ও পাঞ্জাবি পরতাম বেশিরভাগ সময়। এদেরই একজন একদিন জিজ্ঞাসা করেছিলেন, তখন আপনার ঐ ড্রেস কেন ছিল? এই প্রশ্নের সঠিক জবাব আমার জানা নেই। তবে বয়স কম ছিল, হয় ২৭ কি ২৮ বছর। দেখতে আরো তরুণ

www.pathagar.com

মনে হত। সম্ভবত বয়স্ক সাজবার জন্যে এই ড্রেস তখন পরতাম। ছাত্রছাত্রীর সাথে নিজের বয়সের ব্যবধানটা বাড়াবার লক্ষ্যেই খুব সম্ভব এই পোষাক বেছে নিয়েছিলাম। শেষ করার পূর্বে এটিও উল্লেখযোগ্য যে, রংপুর কলেজ এবং বেগম রোকেয়া কলেজের পেছনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান ছিল রংপুরের অধিবাসীদের। তাদেরই অর্থে, তাদেরই সামর্থ্যে, তাদেরই সহযোগিতায় যে অসম্ভব সম্ভব হয়, বিশেষ করে ঐ সময়ে, তার মূলে রংপুরের সাধারণ মানুষজন। শুধু উদ্যোগটি গৃহীত হয়েছিল কিছু সংখ্যক কর্মকর্তা, শিক্ষানুরাগী এবং অভিভাবক কর্তৃক। যারা ঐ উদ্যোগকে সফল করতে সহায়তা করেন তারা রংপুরের অধিবাসী না হলেও রংপুরকে গ্রহণ করেছিলেন তাদের প্রিয় স্থান হিসেবে। তারা রংপুরের জনগণকে গ্রহণ করেন আপনজন হিসেবে। তাদের স্মৃতির মণিকোঠায় রংপুর রয়েছে অত্যন্ত উজ্জ্বল হয়ে। যাদের নাম উল্লিখিত হয়েছে তাদের যে কারো সাথে কথা বললে তারা তাই বলবেন।

স্মৃতি বড় আনন্দদায়ক। স্মৃতি আবার অত্যন্ত পীড়াদায়কও বটে। আজও আমার মনে আছে, রংপুরের নীলফামারীতে আমি পা রেখেছিলাম ১৯৬১ সালের ৩ মে এবং রংপুর ছেড়ে এসেছিলাম ১৯৬৬ সালের ২৪ আগস্ট। এই সময়টুকু আমার জীবনের অত্যন্ত মূল্যবান সময়। এটুকু কেটেছে আমার শিখানো এবং শেখা উভয় দায়িত্বে। তবে যতটুকু শিখিয়েছি তার চেয়ে অনেক বেশি শিখেছি রংপুরের সাধারণ মানুষদের নিকট থেকে। শিখেছি জীবনের বহু কথা। যাদের জন্যে কিছু করেছি তাদের মনে তার রেশ থাকবেই। তাদের নিকট থেকে স্বীকৃতি আসবেই। তবে স্বীকৃতির জন্যে কোনো কাজ করা যে সঙ্গত নয় তাও সর্বজন স্বীকৃত। এই মুহূর্তে তাই আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি রংপুরের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষদের নিকট। তখন রংপুর শহরে দেখেছি জেলা প্রশাসক, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক ও যুগ্ম জেলা প্রশাসকের তিনটি জীপ। আর দুটি জীপ গাড়ি ছিল টোবাকো কোম্পানীর দু'জন কর্মকর্তার। যতদূর মনে পড়ে, আর একটি পুরনো গাড়ি ছিল জনৈক ইনকাম ট্যাক্স ব্যবহারবিদের। আরো দু'একটা গাড়ি থাকতে পারে। আমরা তখন রিক্সায় চলতাম। আমার ছিল মাসিক ভাড়ায় একটি রিক্সা। যেদিন চলে আসি রংপুর ছেড়ে তখন দেখেছি আমার বিদায় বেলায় রাস্তার দু'পাশে ছাত্রছাত্রী ও সাধারণ মানুষের ভিড়। শুধু একটি সালাম দেবার জন্যে অসংখ্য মানুষের ভিড়। আমার রিকসা চালক দু'দিন ধরে আহার নিদ্রা ত্যাগ করে কেঁদে কেঁদে চোখ মুখ ফুলিয়ে ফেলেছিল। আমার অফিসের পিয়ন-দারোয়ানদের দিকে আমি তাকাতে পারিনি। এসবই তো স্মৃতি। এই স্মৃতি অত্যন্ত আনন্দদায়ক, বেদনাশ্রুভরা যদিও।

রংপুর মহিলা কলেজের কোনো ছাত্রীকে তিন বছরে গালাগাল দিতে হয়নি। তাদের চোখে শুধু একটা স্বপ্ন জাগ্রত করতে চেয়েছিলাম। সেই স্বপ্নেই তারা বিভোর ছিল। তারা যতটা বর্তমানকে দেখত তার চেয়ে অনেক বেশি তাকাতো ভবিষ্যতের দিকে। আজকে রংপুরের যেটুকু শ্রীবৃদ্ধি চোখে পড়ে তার বেশ

www.pathagar.com

খানিকটা রংপুরের ঐ দুটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্যে। তাছাড়া কারমাইকেল কলেজ তো রয়েছে। পেছন ফিরে যখন তাকাই, দেখি দুই কলেজে বেশ কয়েকজন যোগ্যতর শিক্ষকও ছিলেন। হোসনে আরা আক্তার অবসর গ্রহণ করেছেন ঢাকার একটি সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ হিসেবে। শামসী আরা এখনো ঢাকায় একটি বেসরকারি কলেজে সুনামের সাথে অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করে চলেছেন। খালেদা আদিবা ঢাকার একটি বেসরকারি কলেজের অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করে অবসর নিয়েছেন। ঐ দুই কলেজের ছাত্রছাত্রীর বেশ কয়েকজনকে জানি সরকারি দপ্তরে সুনামের সাথে দায়িত্ব পালন করছেন। এসব যখন দেখি তখন মনে হয় আমার রংপুরের পাঁচ বছর ছিল অতীব প্রীতির, গৌরবজনক আত্মতুষ্টির। যেখানেই থাকি, যে অবস্থায় থেকেছি, মনে মনে রংপুরের সমৃদ্ধি কামনা করেছি। ধন্যবাদ জানাচ্ছি বেগম রোকেয়া কলেজের অধ্যক্ষ মোঃ আবদুস সালেককে। দীর্ঘ ৪০ বছরের সঞ্চিত স্মৃতি ভাণ্ডারের বাতায়ন উন্মুক্ত করেছেন তিনি।

www.pathagar.com

ইদ্রিস আহমাদকে যেমন দেখেছি

১৯৪৮ সালের জুলাই মাসে আদিনা ফজলুল হক কলেজে ভর্তি হতে এসেছি। কলেজ সম্পর্কে এক ধরনের ধারণা তৈরি ছিল। ম্যাট্রিক পরীক্ষার পর ইচ্ছা পোষণ করেছি রাজশাহী কলেজে পড়ার। আব্বা চাইতেন আমি মালদহ কলেজে পড়ি। শেষ পর্যন্ত এলাম দাননচকে, আদিনা ফজলুল হক কলেজে ভর্তি হতে। কলেজ দেখে পছন্দ হয়নি। কিন্তু প্রথম দিন যে ব্যক্তিটির সাথে পরিচয় হল তা জীবনে আমার এক অক্ষয় স্মৃতি হয়ে রইল।

ভর্তি ফরম নিয়ে কলেজ অফিসে ঢুকে তাঁর সাথে পরিচিত হই। লম্বা চওড়া চেহারা, সাদাসিধে ধরন, অগোছানো চুল, কিন্তু তাঁর চোখের দিকে তাকিয়ে কয়েক মুহূর্ত স্থির হয়েছিলাম। চোখে ছিল এক সম্মোহনী আলো।

প্রথমে তিনিই নীরবতা ভঙ্গ করেন। প্রশ্ন করেন তিনি ইংরেজিতে তুমি জীবনে কি হতে চাও? উত্তর দিয়েছিলাম ইংরেজিতে। তখন পাঠদানের ভাষা ছিল ইংরেজি। ইংরেজি জানাটা ছিল ভালো ছাত্রের লক্ষণ। সম্ভবত তাই তিনি পরখ করতে চেয়েছিলেন। আমি বলেছিলাম, আমি একজন শিক্ষক হতে চাই, একজন খ্যাতনামা শিক্ষক। আমার আব্বা একজন শিক্ষক এবং আমি এ ধারা অব্যাহত রাখতে চাই।

শুনে মনে হল খুশি হলেন তিনি। আমার কাছাকাছি এসে পিঠে হাত দিয়ে বললেন, আমি অন্য কিছু শুনতে চেয়েছিলাম।

আমি উত্তরে বলেছিলাম, আমি ঠিক এইই হতে চাই। আমার কথা শুনে তিনি আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরেন। পাশের কর্মকর্তাকে ডেকে বলেন, আমার দৃঢ়বিশ্বাস, এ তরুণ একজন খ্যাতনামা শিক্ষক হবে। এর দিকে নজর রেখো।

কলেজের পরিবেশকে কোনো সময় পছন্দ করিনি। কিন্তু মানুষটির ছবি আমার মনে চিরঞ্জীব হয়ে রইল। এত দৃঢ়ভাবে তিনি শেষের কথাগুলো বলেছিলেন যে শুনে মনে হয়েছিল, এ এক ভবিষ্যৎবাণী। লেখাপড়া শেষ করে একাধিক পেশার দিকে দৃষ্টি দিয়েছি, কিন্তু কোনোটিই আমাকে ধরে রাখতে পারেনি। শেষ পর্যন্ত মনে হয়েছে, ইদ্রিস আহমাদ সাহেবই আমার পেশা ঠিক করে দিয়েছেন।

ঐ কলেজে দু'বছর পড়াশুনা করেছি। তাঁর সাথে বেশ ক'বার দেখা হয়েছে। মাঝে মাঝে কিছু কথাবার্তাও হয়। ঠিক মনে নেই ঐসব কথা। কলেজ থেকে যখন শেষ বারের মতো বিদায় নিয়ে আসি অর্থাৎ আই এ পরীক্ষার ফল বেরোলে যখন তাঁকে সালাম করতে যাই। তখন তিনি যা বলেছিলেন তা কোনোদিন ভুলতে পারিনি।

আমাদের পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হলে আমি গিয়েছিলাম এক বিকালে, ১৯৫০ সালে, খুব সম্ভব আগস্ট মাসে। আমার চেহারাটা তাঁর মনে ছিল। আমি সালাম করে বললাম- স্যার, আমার জন্য দোয়া করবেন। আমি আপনাকে কোনোদিন ভুলব না। আমি রাজশাহী কলেজে ভর্তি হতে যাচ্ছি।

www.pathagar.com

আমার কথা শুনে আমাকে জড়িয়ে ধরে ছোট্ট শিশুর মতো তিনি ফুঁপিয়ে উঠেন। মিনিট খানেক পর তিনি বলেন, 'আমি তোমার জন্য দোয়া করি। আল্লাহ তোমাকে বড় করুন। আমার এ কলেজটির জন্য তুমি দোয়া করো। এ কলেজ থেকে বহু ছেলেমেয়ে বেরিয়ে গেছে, কিন্তু এবারে তুমি কলেজের জন্য যা করেছো তার তুলনা নেই।'

আমি তার কাছ থেকে এতটুকু আশা করিনি। আর্থিক অসচ্ছলতার জন্য এ কলেজে পড়াশুনা করেছি। দ্বিতীয় বর্ষে তিনি আমার জন্য অর্ধেক বেতনেরও ব্যবস্থা করেছিলেন। এরপর তো আর কোনো কথা থাকতে পারে না। তাই জিজ্ঞেস করি 'স্যার, এমন কি করেছি যার জন্য আপনি এ কথা বললেন।'

এরপর তিনি কলেজের ইতিহাস সম্পর্কে আমাকে জানান। কী ভীষণ প্রতিবন্ধকতার মুখোমুখি হয়ে বিভিন্ন পর্যায়ে সীমাহীন অপমান ও ব্যক্তিগত নিরাপত্তাহীনতার মধ্য দিয়ে এ কলেজের জন্য তাঁকে কি কি যাতনা সহ্য করতে হয়েছে তার বর্ণনা দিলেন। তিনি বলেন, 'এই তো সেদিন চিঠি পেলাম, কলেজের এফিলিয়েশন আর থাকছে না। কলেজের শত্রুরা এখনও ভীষণভাবে সচেষ্ট। যদি এবার কলেজের ফল ভালো না হত, বিশেষ করে তুমি যদি আইএ তে স্ট্যান্ড না করতে তাহলে কলেজের এফিলিয়েশন থাকত না।'

এ কথাগুলো বলতে বলতে তিনি আবেগাপ্লুত হয়ে আমাকে আরো কাছে টেনে নিলেন এবং বললেন, 'তোমার কাছেও কলেজ কৃতজ্ঞ'। তাঁর এ কথার পর আর কোনো কথা বলার ক্ষমতা ছিল না। পেছনে তাকিয়ে তাঁকে শ্রদ্ধাভরে সালাম জানিয়ে শুধু বলেছিলাম, স্যার, কোনো প্রয়োজন লাগলে ধন্য হব। হুকুম করবেন।

এই মহান ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে তাই কোনো কথা বলার অর্থ আমার কাছে তাঁর প্রতি গভীর শ্রদ্ধাজ্ঞাপন এর বেশি কিছু না। তিনি দাদনচকের মতো গন্ডগ্রামে আদিনা কলেজের প্রতিষ্ঠা এমন এক সময়ে করেছিলেন যখন অবিভক্ত বাংলার এই বৃহৎ উত্তরাঞ্চলে ছিল মাত্র ক'টি শিক্ষায়তন–রাজশাহী কলেজ, রংপুর কারমাইকেল কলেজ এবং মুর্শিদাবাদে বহরমপুর কলেজ। বগুড়া, দিনাজপুর, মালদহ, জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং, কুচবিহার জেলা শহরগুলিতেও কোনো কলেজ তখন প্রতিষ্ঠিত হয়নি। এমনি সময়ে সাধারণ মধ্যবিত্ত ঘরের সন্তান ইদ্রিস আহমাদের পক্ষে তৎকালীন প্রভাবশালী সামন্তদের এড়িয়ে, গ্রামীণ পরিবেশে একটি কলেজ স্থাপন এক অচিন্তনীয় ব্যাপার। কিন্তু তাঁর মত ব্যক্তির পক্ষে তাও সম্ভব হয়েছিল। গ্রামীণ জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষার আলো বিস্তারই ছিল তাঁর জীবনের প্রধান লক্ষ্য। এ লক্ষ্য অর্জনে আমার মনে হয়, ইদ্রিস আহমাদের তুলনা করা যেতে পারে আলীগড় আন্দোলনের অগ্রপথিক স্যার সৈয়দ আহমদের সাথে। নিগৃহীত হয়েছেন, কিন্তু হাল ছাড়েননি। বিভিন্ন সমস্যার মুখোমুখি হয়েছেন, কিন্তু নিরাশ হননি। কিংবদন্তীর রাজপুত্রের মতো ইদ্রিস আহমাদ সোনার কাঠির স্পর্শে রাজশাহীর সবচেয়ে অনুন্নত এলাকাকে জাগ্রত করেছেন। শিক্ষার প্রদীপ জ্বালিয়ে ঘরে ঘরে ডাক দিয়েছেন এবং বলেছেন, এসো, অশিক্ষার অন্ধকার-রাত্রি তোমাদের জন্য শেষ হয়েছে।

www.pathagar.com

ইদ্রিস আহমাদ সাহেবের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করে এ এলাকার জনসমষ্টি তাদের ঋণ পরিশোধ করতে পারে না। এ ঋণ অপরিশোধ্য। তাঁকে সম্মান দেখিয়ে নিজেরা সম্মানিত হই। তাঁর কথা স্মরণ করে নিজের গৌরব অনুভব করি। তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করে আমরা নিজেরাই শ্রদ্ধেয় হই।

বাংলার অন্যতম ক্ষণজন্মা পুরুষ সিংহ এ কে ফজলুল হকের অন্তরঙ্গ সহচর এবং শিষ্য, ইদ্রিস আহমাদ তাঁরই আদর্শে অনুপ্রাণিত হন এবং তাঁরই পদাঙ্ক অনুসরণ করে গ্রামীণ জনসাধারণের জন্য শিক্ষার প্রদীপ হাতে সবার দ্বারে দ্বারে উপস্থিত হন। অন্য কোনো উন্নত সমাজে এমন ব্যক্তিত্বের জন্য নির্মিত হত বিরাট স্মৃতিসৌধ। এ সমাজে তাঁর যথার্থ মূল্যায়ন আজও হয়নি। তবে আমাদের মতো অসংখ্য ব্যক্তির মনের মণিকোঠায় ইদ্রিস আহমাদের স্মৃতি আজও পূর্ণচন্দ্রের মতো। জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে তিনি আমাদের নিকট রয়ে গেছেন ধ্রুব তারা হয়ে।

www.pathagar.com

আক্রান্ত ইরাক : বুশ ও ব্লেয়ারের অবৈধ আগ্রাসন

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লিউ বুশ ও ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী টনি ব্লেয়ার বিশ্ব জনমতকে উপেক্ষা করে, যে জাতিসংঘের বিনির্মাণে যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেনের ভূমিকা ছিল সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ তাকে অবহেলাভরে পাশ কাটিয়ে এবং যুদ্ধ সম্পর্কিত সকল বিধিবিধানকে পদদলিত করে ইরাকের মতো একটি স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্রে আগ্রাসী ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন। একে যুদ্ধ বলবেন? বলুন যা খুশি। কিন্তু আগ্রাসী ব্রিটেনের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা এলিজাবেথ উইলিয়াম হার্স্ট পদত্যাগের সময় যা বলেছিলেন তা সঙ্গে সঙ্গে স্মরণ করুন। তিনি বলেছিলেন, ইরাক আক্রমণের কোনো ভিত্তি নেই। নেই আইনগত অথবা নৈতিক কোনো ভিত্তি। তারপরেও চলছে ইরাকে জর্জ বুশ ও টনি ব্লেয়ারের নির্দেশে প্রায় ৩ লাখ প্রশিক্ষিত বাহিনীর বীভৎস আক্রমণ, ইরাকের জনসমষ্টির বিরুদ্ধে। উন্নত প্রযুক্তি আর মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্রের আঘাতে আঘাতে জর্জরিত ইরাকের আবালবৃদ্ধবণিতা। প্রতিনিয়ত মৃত্যুর প্রহর গুনছে লাখ লাখ আদম সন্তান। কিন্তু বুশ-ব্লেয়ারের এই উদ্যোগ কেন? ইরাকের মতো একটি যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ কি বিশ্বের একমাত্র পরাশক্তি যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিদ্বন্দ্বী হতে পারে? ব্রিটেনের মতো একটি বৃহৎ শক্তির প্রতিদ্বন্দ্বী ইরাক হয় কীভাবে? বাস্তবে কিন্তু তাই হয়েছে, কেননা সমগ্র মধ্যপ্রাচ্য সম্পর্কে–পশ্চিম এশিয়া ও উত্তর আফ্রিকা সম্পর্কে রয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের এক সুদূরপ্রসারী মতলব। এক ধরনের দূরবর্তী লক্ষ্য। এই লক্ষ্য অর্জনের ক্ষেত্রে কোনো বৈধতার প্রশ্ন অথবা নীতি-নৈতিকতার কোনো জটিলতাকে যুক্তরাষ্ট্রের বর্তমান নীতিনির্ধারকরা মোটেই আমলে আনতে চান না। বরাবরের মতো এবারও মেকিয়েভেলি হয়েছেন তাদের প্রথম এবং প্রধান গুরু। জোর যার মুল্লুক তার।

বিশ্বের একমাত্র পরাশক্তি হিসেবে চিরকাল তাদের টিকে থাকতেই হবে। বর্তমান সভ্যতার কর্ণধাররূপে তাদের স্থায়িত্ব পেতেই হবে। জর্জ বুশ যেমন পদলেহনকারী টনি ব্লেয়ারকে পেয়েছেন, এমনিভাবে যুক্তরাষ্ট্রের নীতিনির্ধারকরা ডজন ডজন ব্লেয়ারকে পেতে চান ভবিষ্যতেও। এ কারণে আধুনিক সভ্যতার চালিকাশক্তি যে ফসিল ফুয়েল, তার ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতেই হবে। রিপাবলিকান পার্টির অয়েল লবির মুখপাত্র হিসেবে মধ্যপ্রাচ্যে তাই বুশের দৃষ্টি পড়বেই। ইরাককে কাবু করতে পারলে মধ্যপ্রাচ্য আর কোনো নেতার উচ্চকণ্ঠের মোকাবেলা করতে পারবে না–এই বিশ্বাস নিয়েই বুশ সাহেব পথে নেমেছেন। ইরাক বলতে তিনি জেনেছেন শুধু সাদ্দাম হোসেন এবং তার সাঙ্গপাঙ্গদের। তাদের খতম করা একান্ত প্রয়োজন। তাই তিনি যুদ্ধ শুরুর আগেই ৪৮ ঘণ্টার যে আল্টিমেটাম দিয়েছিলেন তার দিকে নজর দিন। ভেবে অস্থির হই, কত ভয়ঙ্কর, কত মারাত্মক তার প্রেরিত সেই চরমপত্র। সাদ্দাম হোসেন যেন তার সন্তানসন্ততিসহ ইরাক ছেড়ে চলে যান। তা না হলে যুদ্ধ অনিবার্য। কত অনৈতিক এবং অগণতান্ত্রিক,

www.pathagar.com

কত স্বেচ্ছাচারী এই উচ্চারণ। একটি স্বাধীন দেশের প্রেসিডেন্ট তার কথায় সায় দিয়ে দেশ ছেড়ে চলে যাবেন ভিন দেশে? ইরাকি অভিযানকে তারা চিহ্নিত করেছেন 'ইরাক ফ্রিডম অপারেশন'। ইরাকের জনগণের ত্রাতা হিসেবে তারা আবির্ভূত হতে চান। বুশ-ব্লেয়ারের এই স্বেচ্ছাচারী উচ্চারণ বিশ্বব্যবস্থার জন্য কত যে মারাত্মক তা ভেবে দেখলে বৃহৎ কোনো রাষ্ট্রের পাশে ছোট ছোট রাষ্ট্রগুলোর অবস্থান কত অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে তার অনুধাবনে এতটুকু অসুবিধা হয় না। দুদিন পরে একইভাবে ত্রিপোলিতে অথবা ইরানে হুকুম জারি করা হবে–কর্নেল গাদ্দাফি, তুমি তোমার দলবল নিয়ে দেশ ছাড় অথবা....।

আমার আশঙ্কা, তেল সম্পদকে কুক্ষিগত করার লক্ষ্যে, যুদ্ধের পরবর্তী পর্যায়ে বুশ-ব্লেয়াররা সমগ্র মধ্যপ্রাচ্যের মানচিত্রে ব্যাপক পরিবর্তন করতে উদ্যত হবেন। সাদ্দাম হোসেনের মতো কোনো 'অবাধ্য' অথবা 'বেয়াড়া' নেতার মুখোমুখি যেন আর হতে না হয়। সবকিছুকে কেটে ছেটে সমগ্র অঞ্চলব্যাপী যেন বিদ্যমান থাকে কুয়েত বা কাতার অথবা বাহরাইনের মতো ছোট ছোট জনপদ। প্রয়োজনবোধে একটি মাত্র ধমকেই যেন সব ঠাণ্ডা হয়ে যায়। আর একটি কারণে মধ্যপ্রাচ্যের মানচিত্রে ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হতে পারে এবং তা হল মধ্যপ্রাচ্যের অভিসম্পাতস্বরূপ যে ইসরাইল, তা যেন সমগ্র অঞ্চলে এক আঞ্চলিক শক্তিরূপে আবির্ভূত হতে পারে। এটি স্বাভাবিক মনে হয় এই কারণে যে বুশ যেমন তেল-লবির প্রতিনিধি, তেমনি তিনি যুক্তরাষ্ট্রের ইহুদি-লবিরও মুখপাত্র। ইসরাইলকে একটি আঞ্চলিক শক্তিতে প্রতিষ্ঠিত করতে পারলে তখন কোনো আরব রাষ্ট্রের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের আর প্রত্যক্ষ সমরে জড়িত হতে হবে না। এতদিন ইসরাইলই যুক্তরাষ্ট্রের প্রক্সি দিয়ে এসেছে। তখন ইসরাইলই সব দিক সামলাবে।

বুশ-ব্লেয়ারদের আর একটি লক্ষ্য হল, সমগ্র মধ্যপ্রাচ্যে মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্রের বাজারকে আরো চাঙ্গা করা। এই বাজার প্রাণবন্ত হলে তা একদিকে যেমন আফ্রিকা পর্যন্ত প্রসারিত হবে, অন্যদিকে তেমনি দক্ষিণ এশিয়া ছাড়িয়ে মধ্য এশিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত হতে পারে। উল্লেখ্য, জর্জ বুশ অস্ত্র নির্মাতাদের লবিরও মুখপাত্র। সমগ্র অঞ্চলে গভীর অনিশ্চয়তা সৃষ্টি করে সকল জনপদকে অস্ত্রের ওপর নির্ভরশীল করতে চান তারা।

বুশ-ব্লেয়ারের এসব লক্ষ্য কতটুকু অর্জিত হবে তা বলা শক্ত, কিন্তু তাদের অবৈধ যুদ্ধ যে বিশ্বব্যবস্থাকে ঘন অনিশ্চয়তার দিকে ঠেলে দিয়েছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। অনেকের স্মরণে থাকবে–যখন আমেরিকান জেনারেল ম্যাক আর্থার কোরিয়ার ভূখণ্ডে পা রেখেছিলেন গত শতকের মাঝামাঝি, তখন চিৎকার করে বলেছিলেন, 'আমরা কোরিয়া দখল করে ফেলেছি'। ['We have had it Korea.']। বুশ সাহেব ইরাকের মাটিতে সৈন্য পাঠানোর বহু আগে থেকেই বলে চলেছেন, 'সাদ্দাম হোসেনের দিন শেষ হয়েছেএ' সাদ্দাম হোসেনের অবস্থান কিন্তু গত নয় দিনের ব্লিটসক্রিগের পরেও আরো শক্তিশালী হয়েছে। বরং জর্জ বুশের বিশ্বাসযোগ্যতার বিরাট এক অংশ মুছে গেছে। একক পরাশক্তি হিসেবে যুক্তরাষ্ট্র এরই মধ্যে হারিয়েছে তার নৈতিক অবস্থানের বৃহৎ এক অংশ। বুশ-ব্লেয়ারের সহযোগিতা হিসেবে সিএনএন এবং বিবিসি, যারা মনস্তত্ত্বিক যুদ্ধের কো-পার্টনার, তাদেরও গত কয়েকদিন থেকে মধ্যপ্রাচ্যের আল-জাজিরার সহায়তা গ্রহণ করতে হচ্ছে তাদের বিশ্বাসযোগ্যতা পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে।

www.pathagar.com

সাদ্দাম হোসেন সম্পর্কে আমরা তেমন উঁচু ধারণা পোষণ করি না বটে। তবে তার নেতৃত্বে ইরাকের আত্মরক্ষার অসম সংগ্রামে ইরাকের জনগণের যে সাহস, কৌশল এবং দৃঢ়তা লক্ষ্য করা যাচ্ছে তা বুশ-ব্লেয়ারের রক্তচাপ বাড়িয়ে দিয়েছে। বুশ সাহেব এরই মধ্যে ঘোষণা দিয়েছেন, আগামী মাস থেকে ইরাকে আরো সৈন্য সমাবেশ করা হবে এবং তা হবে বর্তমানের সংখ্যার দ্বিগুণ।

এই যুদ্ধের ফলে চারদিকে দৃষ্টি দিন, দেখবেন চার রকম চিত্র। **এক.** যে জাতিসংঘ গত ৫০ বছর ধরে বিশ্বে শান্তি রক্ষা করে এসেছে তা পরিণত হয়েছে বুশ-ব্লেয়ারের দৌলতে এক ঠুঁটো জগন্নাথে–দন্ত নখরহীন, নির্বাক, নিষ্প্রাণ এক সম্ভ্রমহীন সংস্থায়। **দুই.** গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার দুই মডেল–আটলান্টিকের দুই তীরের দুই শ্রদ্ধেয় ব্যবস্থায় মরচে পড়া শুরু হয়েছে। ক্ষমতার স্পর্ধিত আবর্জনায় ধূলি ধূসরিত হতে শুরু করেছে। যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যের নেতৃত্বের মুখে এরপর মানবাধিকার সংরক্ষণ, গণতন্ত্রের জয়গান অথবা আইনের শাসন প্রমুখ শব্দাবলি উচ্চারিত হলে তা শোনাবে অনেকটা প্রহসনের মতো। আন্তর্জাতিক আইনের কার্যকারিতা সম্পর্কে এসব নেতার কোনো বাক্য আর কেউ শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রাহ্য করবে না। **তিন.** বিশ্বকে এই মুহূর্তে তারা বিভক্ত করে ছেড়েছে। একদিকে উচ্চারিত হচ্ছে 'যুদ্ধ নয়, শান্তি' শ্লোগান, অন্যদিকে দেখা যায় যুদ্ধবাদী, ক্ষমতালিপ্সু, ষড়যন্ত্রকারী অনৈতিক নেতৃত্বের ব্যর্থ আস্ফালন। বুশ-ব্লেয়াররা বিশ্বকেই বিভক্ত করে ক্ষান্ত হননি, নিজের দেশের জনসমষ্টিকে পর্যন্ত বিভক্ত করে ছেড়েছেন। ব্রিটেনে এলিজাবেথ উইলিয়াম হার্স্টের পদত্যাগ এবং যুক্তরাষ্ট্রের মঙ্গোলিয়ার উলানবাতোরে ডেপুটি চিফ অব দি মিশনের জন রাইটের পদত্যাগ এবং ইতালিতে মার্কিন দূতাবাসের রাজনৈতিক কাউন্সিল জন ব্যাডি কিয়েসলিংয়ের পদত্যাগ এরই স্বাক্ষর বহন করছে। **চার.** বুশ-ব্লেয়ারের ইরাক আগ্রাসন যে মানবতাবিরোধী এবং ক্ষমতালোভীদের অবৈধ ক্ষমতা প্রয়োগ, সে সম্পর্কে বিশ্বব্যাপী প্রতিবাদ অত্যন্ত আশাপ্রদ।

একুশ শতক যে মানবতার শতক এবং তা যে ন্যায়নীতির পক্ষে, শান্তির পক্ষে তা বিশ্বমানব জাতি-ধর্ম, বর্ণ এবং রাজনৈতিক মতাদর্শ নির্বিশেষে ঘোষণা করছে। এই আলোকে চারদিকের অন্ধকারকে ছাপিয়ে নতুন পৃথিবীতে বিশ্বমানবতা নতুন সুরের সৃষ্টি করে বুশ-ব্লেয়ারদের ইতিহাসের ফুটনোটে পর্যবসিত করতে উদ্যত। বিশ্বমানব এখনো আশাবাদী। এ প্রসঙ্গে টনি ব্লেয়ারের ব্রিটেনে গত সহস্রাব্দে যিনি শ্রেষ্ঠতম মনীষী হিসেবে চিহ্নিত হয়েছেন সেই অমর নাট্যকার উইলিয়াম শেক্সপিয়ার তার Measure for Measure নাটকের প্রথম অঙ্কের ১০৭ লাইনে লিখেছেন, "দৈত্যের মতো ক্ষমতা অর্জন অতি উত্তম বটে, কিন্তু দৈত্যের আদলে তার প্রয়োগ কিন্তু পীড়নমূলক।" [O, it is excellent to have a giant's streng; but it is tyrannous to use it like a giant.] এবং এই অর্থে তা ঘৃণ্য। একই ঐতিহ্যে লালিত এবং একই সংস্কৃতির উত্তরাধিকারী জর্জ ডব্লিউ বুশ এবং টনি ব্লেয়ার কি একবার সেই লাইনগুলোতে চোখ বুলাবেন? বিশ্ববাসী কিন্তু তাই প্রত্যাশা করে তাদের কাছ থেকে। তাহলে তারা এরই মধ্যে যে ক্ষতি করে ফেলেছেন তা আর বৃদ্ধি পাবে না।

www.pathagar.com

পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তি সম্পর্কে

১৭ আগস্টে সেন্টার ফর স্ট্র্যাটেজিক এন্ড পিস স্টাডিজের উদ্যোগে (Center for Strategic And Peace Studies) পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তি সম্পর্কে এক মনোজ্ঞ আলোচনা হয়ে গেল। মনোজ্ঞ বলছি দু'টি কারণে : **এক.** বিভিন্ন মতের এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক আদর্শের অনুসারী বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি এই সেমিনারে অংশগ্রহণ করে অত্যন্ত খোলামেলাভাবে নিজেদের মতামত প্রকাশ করলেন। **দুই.** পার্বত্য চট্টগ্রাম যে বাংলাদেশের একটি সমস্যা সঙ্কুল এলাকা এবং এই সমস্যার যে আশু সমাধান প্রয়োজন তার বিস্তারিত আলোচনা হল এই সেমিনারে। পার্বত্য চট্টগ্রামের জনপ্রতিনিধি প্রতিমন্ত্রী মনি স্বপন দেওয়ানও উপস্থিত থেকে সবার কথা শুনলেন এবং নিজের কথা বললেন।

এই সেমিনারে বিশিষ্ট সাংবাদিক সাদেক খান উপস্থাপন করেন তার দীর্ঘ প্রবন্ধ "Present Situation in Chittagong Hill Tract; What Could we do?" শিরোনামে। আর একটি প্রবন্ধ উপস্থাপিত হয় মেজর জেনারেল (অবঃ) সৈয়দ মুহাম্মদ ইবরাহিম কর্তৃক। দু'টি প্রবন্ধেই ছিল সারগর্ভ বক্তব্য। দীর্ঘ আলোচনা-পর্যালোচনার পরে এক ধরনের ঐকমত্যের আভাস মিলে। ঐকমত্য পরিলক্ষিত হয় কয়েকটি ক্ষেত্রে : **এক.** সমগ্র বাংলাদেশের প্রায় এক-দশমাংশ ভূখণ্ডের পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল বাংলাদেশের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, নিরাপত্তা বিষয়ক, এমনকি পররাষ্ট্রীয় সম্পর্কের ক্ষেত্রেও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ফলে এই অঞ্চলে বিদ্যমান অসন্তোষের মূলোচ্ছেদ হওয়া বাঞ্ছনীয়। **দুই.** পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণ, তা তারা উপজাতীয় অথবা বসতি স্থাপনকারী হোন, সবাই বাংলাদেশের নাগরিক। সকলেই বাংলাদেশের প্রতি আনুগত্য পোষণ করেন। সবাই মনে করেন, তাদের ভবিষ্যৎ বাংলাদেশের ভবিষ্যতের সঙ্গেই অবিচ্ছেদ্যভাবে গ্রথিত। **তিন.** উপজাতীয় জনসমষ্টির বৃহত্তর অংশের মধ্যে যে অনিশ্চয়তা ও এক ধরনের নিরাপত্তাহীনতা বিরাজ করছে তা দূর করা সম্ভব হলে, তারাও জাতীয় কর্মকাণ্ডের মূল স্রোতে ফিরে আসতে পারেন।

চার. বর্তমানে ক্ষমতাসীন সরকারের বিরোধী দলে অবস্থান গ্রহণকালে ১৯৯৭ সালের ২ ডিসেম্বরে প্রণীত পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তি সম্পর্কে যে মন্তব্য করা হয়েছিল অর্থাৎ তারা ক্ষমতায় গেলে এই চুক্তি বাতিল করবেন, ক্ষমতাসীন হবার পরে তাদের পরিবর্তিত মানসিকতাকে সবাই অভিনন্দিত করেন। এই সভায় প্রায় সকল আলোচক বর্তমান সরকারের এই দূরদর্শী ভূমিকার ভূয়সী প্রশংসা করেন।

পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি প্রয়োজন

প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের লীলাভূমি, সবুজ পাহাড়ে ঘেরা অনিন্দ্যসুন্দর এই জনপদে বিগত আড়াই দশকে অনেক রক্ত ঝরেছে। কয়েক হাজার উপজাতীয় জনগণ নিহত হয়েছেন।

www.pathagar.com

নিহত হয়েছেন বহু সংখ্যক অউপজাতীয়। প্রাণ হারিয়েছেন বেশ কিছুসংখ্যক নিরাপত্তাবাহিনীর সদস্য। ব্যয়িত হয়েছে বিপুল পরিমাণ জাতীয় সম্পদ। পার্বত্য চট্টগ্রামে কিন্তু শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়নি। অনেক ঢাকঢোল পিটিয়ে, জাতীয় সংসদকে পাশ কাটিয়ে। সমগ্র জাতিকে তাক লাগিয়ে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৯৯৭ সালে যে শান্তি চুক্তি সম্পাদন করেন তাও পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হয়নি। ফলে বিশ্বে শান্তিপ্রিয় বাংলাদেশের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হয়েছে। এমনকি প্রতিবেশী ভারতের সঙ্গেও সুসম্পর্কের ক্ষেত্রে পার্বত্য চট্টগ্রাম সম্পর্কিত বিষয়সমূহে দাঁড়িয়ে রয়েছে এক ধরনের প্রশ্নবোধক চিহ্নের মতো।

তাই এ জাতির সবাই চায় পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হোক। ধর্ম-বর্ণ-রাজনৈতিক মতাদর্শ নির্বিশেষে সকলেই শান্তির পক্ষে। পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হোক–এটি সকলের কামনা। কিন্তু কীভাবে তা সম্ভব?

বাংলাদেশ একটি বহু বাচনিক (Plural Society) সমাজ। বাংলাদেশের এক কৃতী ছাত্র রামকান্ত সিংহ [সে নিজেও একজন উপজাতীয় আদিবাসী] বিভিন্ন সূত্র এবং আদমশুমারীর তথ্য উপাত্ত বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন, এ দেশে শ্রেণী-জাতি-উপজাতি-গোত্র মিলিয়ে সর্বমোট ৫৭টি উপজাতীয় আদিবাসী গোষ্ঠীর জনসমষ্টি বসবাস করেন। *একই মেরুর দুই নক্ষত্র*, ঢাকা, নওরোজ সাহিত্য সংসদ, ২০০২ : ২৮৬]। তাদের ১২টি অথবা ১৩টি উপজাতির জনসমষ্টি বসবাস করেন পার্বত্য চট্টগ্রামের তিনটি জেলায়। এসব উপজাতীয় জনসমষ্টির রয়েছে স্বতন্ত্র ইতিহাস। রয়েছে ভিন্ন জীবনবোধ। কোনো কোনো ক্ষেত্রে ভিন্ন ধর্মীয় আদর্শ। সমতলের বাঙালিদের থেকে তাদের আচার-আচরণ, সংস্কৃতি, কৃষ্টি, এমনকি দৈহিক গড়নও স্বতন্ত্র। তাদের কথা-বার্তায় রয়েছে স্বাতন্ত্র্য। রয়েছে ঐতিহ্য। স্বতন্ত্র তাদের লোকগাঁথা। স্বতন্ত্র অতীত স্মৃতিও। তাদের সামাজিক জীবনের সুখ-দুঃখের সাথে এই স্বাতন্ত্র্য সংশ্লিষ্ট অবিচ্ছেদ্য সূত্রে। সুতরাং জাতীয় স্বার্থে পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি প্রতিষ্ঠা যেমন অপরিহার্য, তেমনি যেকোনো শান্তি প্রতিষ্ঠার উদ্যোগে উপজাতীয় জনসমষ্টির স্বাতন্ত্র্য সংরক্ষণও অপরিহার্য।

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একথাও স্মরণযোগ্য যে, শান্তি প্রতিষ্ঠার যেকোনো সৃজনশীল উদ্যোগে বিভিন্ন জাতি সত্তা ও নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠীর জনগণ যেন নিজেদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখেও বৃহত্তর জাতীয় জীবনের স্রোতে সম্মিলিত হতে পারেন। এক্ষেত্রে এও স্মর্তব্য যে, ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ায় ঐসব উপজাতীয় জনগোষ্ঠী যে ধরনের অবিচার বা অন্যায়ের শিকার হয়েছেন অতীতে তার যেন পুনরাবৃত্তি না হয় এবং স্বতঃস্ফূর্তভাবে তারা যেন জাতীয় স্বার্থের বৃহত্তর মোহনায় সম্মিলিত হতে পারেন।

বর্তমান কাল হল জাতি রাষ্ট্রের কাল (an era of nation states)। জাতীয়তার ভিত্তিতেই রাষ্ট্র গঠিত হয়েছে। জাতীয়তার ভিত্তিতেই এবং জাতীয় চেতনা ধারণ করেই রাষ্ট্রসমূহ অগ্রসর হচ্ছে, বিশ্বায়নের বিশাল প্রভাব সত্ত্বেও। রাষ্ট্রগঠন প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন জাতিসত্তা সম্মিলিত হয় এবং পারস্পরিক আদান-প্রদানের মাধ্যমেই সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। এ যেন এক বেগবতী স্রোতস্বিনী। হাজারো ধারায় পুষ্ট হয়ে অর্জন করে গতি। বর্তমান

www.pathagar.com

বিশ্বে একক জাতিসত্তা বিশিষ্ট রাষ্ট্র নেই বললেই চলে। ব্যতিক্রম শুধু ইসরাইল এবং ইসরাইল এখন পর্যন্ত অনুকরণীয় কোনো রাষ্ট্র নয়। বিশ্বের অন্যান্য সকল রাষ্ট্রই মিশ্র রাষ্ট্র। বিভিন্ন ভাষার, বিভিন্ন ধর্মের, বিভিন্ন জাতিসত্তার সম্মেলনেই সর্বত্র গড়ে উঠেছে জাতীয় সমাজের বিচিত্র মোজায়েক।

বাংলাদেশের সৌভাগ্য, দেশের প্রায় শতকরা আটানব্বই ভাগ জনসমষ্টিই বাংলাভাষী, বাঙালি, যদিও তারা ধর্মের দিক থেকে বিভক্ত। কিছু মুসলমান, কিছু হিন্দু, কিছু বৌদ্ধ, কিছু খ্রিষ্টান। কিন্তু ভাষা-সাহিত্যে, সংস্কৃতি-ঐতিহ্যে, আচার-আচরণে, এমনকি জীবনবোধেও প্রায় অভিন্ন। যদিও বাংলাদেশের ৫৭টি উপজাতি আদিবাসীর অস্তিত্ব স্বীকৃত, এরই মধ্যে বেশকিছু উপজাতীয় জনসমষ্টি বাংলাদেশের বৃহত্তর জনসমষ্টির আশা-আকাঙ্ক্ষার অংশীদার হয়ে বৃহত্তর জাতীয় স্রোতে মিশে গেছেন। আশা করা যায়, পার্বত্য চট্টগ্রামের তিনটি জেলায় যে সকল উপজাতীয় জনগোষ্ঠী রয়েছেন তারাও কালে জাতীয় কর্মকাণ্ডে হবেন গর্বিত অংশীদার। হবেন সর্বক্ষেত্রে অংশগ্রহণকারী নাগরিক (Participant citizen)। কীভাবে এই প্রক্রিয়া সম্পন্ন হতে পারে?

যেকোনো শান্তি উদ্যোগকে সফল করার পূর্বশর্ত হল : **এক.** সংঘাতময় পরিস্থিতির মূলনায়কদের দাবি-দাওয়ার ন্যূনতম পর্যায়ে হলেও সামঞ্জস্য বিধান। **দুই.** বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় পক্ষ ও প্রতিপক্ষের হিংসাত্মক কাজের মাত্রাকে নিয়ন্ত্রিতকরণ। **তিন.** চূড়ান্ত পর্যায়ে পক্ষ ও প্রতিপক্ষ এই দুই-এর মনে এমন এক ভাব সৃষ্টি করা যে চুক্তির ফলে সকলেই জয়ী হয়েছেন। চুক্তির ফলে কেউ পরাজিত হননি–এই মানসিকতাই যেকোনো শান্তি উদ্যোগের সাফল্যের প্রধান চাবিকাঠি।

তাছাড়া, যে সকল চুক্তি জাতীয় স্বার্থসম্পর্কিত অথবা জাতীয় ঐক্য বা রাষ্ট্রীয় ভূখণ্ডের নিরাপত্তা সম্পর্কিত ঐসব বিষয়ে সাফল্যের মৌল শর্ত হল জাতীয় পর্যায়ে ঐকমত্য। চুক্তি সম্পাদনকারী সরকার আজ আছে, কাল নাও থাকতে পারে। সম্পাদিত চুক্তি কিন্তু এক ধরনের স্থায়ী ব্যবস্থা। আর সবচেয়ে স্থায়ী হল জাতীয় স্বার্থ, জাতীয় ঐক্য এবং রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব। তাই জাতীয় পর্যায়ে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠা ব্যতীত জাতীয় স্বার্থ সম্পর্কিত কোনো বিষয়ে চুক্তি সম্পাদন কোনোক্রমেই যুক্তিসঙ্গত নয়। এভাবে চুক্তি সম্পাদিত হলেও তার সাফল্যের কোনো সম্ভাবনা থাকে না। জাতীয় পর্যায়ে ঐকমত্যের প্রধান নিয়ামক হল একদিকে যেমন জাতীয় পর্যায়ে বিভিন্ন দলের মধ্যে বিশদ আলোচনা-পর্যালোচনার মাধ্যমে সহমত সৃষ্টি, অন্যদিকে তেমনি চুক্তিটি যেন সাংবিধানিক কাঠামোয় সম্পন্ন হয় তা নিশ্চিত করা। সাংবিধানিক কাঠামোয় চুক্তির শর্তাবলি সুবিন্যস্ত হলে অভিযোগের অনেক জ্বালামুখ আপনা আপনি বন্ধ হয়ে আসে। জাতীয় জীবনের যেকোনো সঙ্কটে সংবিধান যে একমাত্র দিকনির্দেশনাকারী দলিল সেই সম্পর্কে আমেরিকান সংবিধান-বিশেষজ্ঞ ড্যানিয়েল ওয়েবস্টার (Daniel Webster) লিখেছেন : 'অন্তহীন সমুদ্রে আমরা আন্দোলিত হতে পারি। স্থল কেন, সূর্য অথবা তারকারাজিও আমাদের দৃষ্টিতে নাও আসতে পারে। কিন্তু আমাদের রয়েছে দিকনির্দেশনা এবং এক দিগদর্শন ব্যবস্থা। তাই আমরা অনুশীলন করতে পারি।

www.pathagar.com

পর্যালোচনা করতে পারি। তাকে মেনে চলতে পারি। এই দিক নির্দেশনাদানকারী দলিল আমাদের সংবিধান।' ["We may be tossed upon an ocean where we can see no land nor perhaps the sun or stars. But there is a chart and a compass for us to study, to consult and to obey, That chart is the Constitution."]

এই প্রেক্ষাপটে ১৯৯৭ সালের ২ ডিসেম্বরে সম্পাদিত চুক্তির কয়েকটি শর্ত সম্পর্কে আলোচনা করা যেতে পারে। চুক্তিটি যখন সম্পাদিত হয়েই গেছে এবং ক্ষমতাসীন সরকার যখন এটিকে বাতিল করেননি, তখন সর্বোত্তম পন্থা হবে এটিকে কার্যকর করা। তবে কার্যকর করার পূর্বে ক্ষমতাসীন সরকারের কয়েকটি পদক্ষেপ গ্রহণ অবশ্য প্রয়োজনীয়।

এক. বৈধকরণ আলোচনার সূত্রপাত হতে হবে অবিলম্বে। 'বৈধকরণ আলোচনা' (Legitimizing dialogue) বলছি এজন্যে যে, চুক্তিটিকে কার্যকর করার পূর্বে এই চুক্তিতে যে সকল সংবিধান-বিরোধী সূত্র সংযোজিত হয়েছে তা অপসারণের ব্যবস্থা করতে হবে। সংবিধানে অনগ্রসর জনসমষ্টির সুবিধার্থে যেসব অনুচ্ছেদ রয়েছে তা কার্যকর করতে হবে, কিন্তু কোনো নাগরিক যেন তার সাংবিধানিক অধিকার থেকে বঞ্চিত না হয় তারও ব্যবস্থা করতে হবে। বৈধকরণ আলোচনা ফলপ্রসূ হবে তখনই যখন পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিবাসীবৃন্দ সরকারের সদিচ্ছা সম্পর্কে আস্থাশীল হয়ে উঠবেন। তাদের আস্থা অর্জনের জন্যে পার্বত্য চট্টগ্রামের সকল প্রতিনিধিত্বশীল প্রতিষ্ঠানগুলোকে কার্যকর করতে হবে। এই লক্ষ্যে তিনটি জেলার রাজাদের অবস্থানকে সমুন্নত রাখতে হবে এবং তিনটি জেলা পরিষদের সদস্যদের নির্বাচনের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন অবিলম্বে। নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে হবে নির্বাচন কমিশন কর্তৃক এবং ভোটার তালিকা প্রস্তুত হতে হবে নির্বাচন কমিশনের প্রচলিত বিধি বিধান অনুযায়ী, দেশের প্রচলিত বিধির কাঠামোয়।

দুই. যেহেতু দেশের একমাত্র এই অঞ্চলেই উপজাতীয় জনসমষ্টির সংখ্যাধিক্য রয়েছে, সেই কারণে পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসকারী বারো কি তেরোটি উপজাতির সাংবিধানিক স্বীকৃতি দেয়া যেতে পারে যেন তারা অধিক আত্মবিশ্বাসী হয়ে জাতীয় জীবনের মূল স্রোতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে উদ্বুদ্ধ হতে পারেন। প্রয়োজন অনুযায়ী এই দৃষ্টান্ত দেশের অন্যান্য ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করা সম্ভব যদি তা জাতীয় স্বার্থের অনুকূল হয়। পার্বত্য চট্টগ্রামের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা, পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসকারী সকল বাংলাদেশীর স্বার্থ সংরক্ষণ, অর্থনৈতিক অগ্রগতির শত বাতায়ন উন্মোচন করার দায়িত্ব তুলে দেয়া যেতে পারে নির্বাচিত সংস্থাসমূহের দায়িত্বে।

তিন. সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের এই আশ্বাস দিতে পারেন, ভবিষ্যতে পার্বত্য চট্টগ্রামে যারা বসবাস করতে চাইবেন তাদের নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন তারাই। কিন্তু বর্তমানে পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসকারীদের স্বার্থ সংরক্ষণ তাদেরই করতে হবে। কাউকে বাইরে থেকে আমদানি করা অথবা রফতানি করার মতো অশুভ পদক্ষেপ

www.pathagar.com

সমগ্র শান্তি প্রক্রিয়াকে ব্যাহত করতে পারে। এ সম্পর্কে তাদের অবহিত করতে পারেন। যারা পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাস করছেন, শান্তিচুক্তি বাস্তবায়নের ফলে তারা যেন কোনোক্রমে ক্ষতিগ্রস্ত না হন তা নিশ্চিত করাও এই শান্তিচুক্তির সাফল্যের একটি শর্ত।

চার. এই শান্তি চুক্তি সম্পাদনে পার্বত্য চট্টগ্রামের যে সকল উপজাতীয় নেতা উল্লেখ্যযোগ্য ভূমিকা রেখেছেন এবং যারা এই চুক্তি বাস্তবায়নে আগ্রহী তাদের অবদানের স্বীকৃতি থাকতে হবে। নাম উল্লেখ না করেও বলতে চাই, শান্তি বাহিনীর কিছু সংখ্যক নেতা, বিশেষ করে জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লার্মা পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে যে সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন এবং যার ভিত্তিতে শান্তি চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে তা স্মরণে রেখে তার মর্যাদা যেন কোনোক্রমে ক্ষুণ্ন না হয় তার ব্যবস্থা করতে হবে। সরকারের বিভিন্ন পদক্ষেপে তাদের স্বীকৃতি যেন সুস্পষ্ট হয়।

পাঁচ. সমগ্র বাংলাদেশে, বিশেষভাবে পার্বত্য চট্টগ্রামে অর্থনৈতিক উন্নয়নের পরিবেশ সৃষ্টি করে এই এলাকার তরুণ-তরুণীদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা অপরিহার্য। প্রয়োজনবোধে আমাদের উন্নয়ন সহযোগীদের সহায়তা এবং জাতীয় সম্পদ বিনিয়োগ করে, সন্ত্রাসীদের নির্মূল করে, উপজাতীয় এবং অ-উপজাতীয় জনগোষ্ঠীর পারস্পরিক আদান-প্রদানের মাধ্যমে উন্নয়নমুখী পরিবেশ তৈরি করা প্রয়োজন। সমগ্র পার্বত্য এলাকায় এমন সব স্পট রয়েছে যার উন্নয়ন ও সৃজনমুখী পরিচর্যার মাধ্যমে বহু সংখ্যক পর্যটন কেন্দ্র গড়ে তোলা সম্ভব। এসব পর্যটন কেন্দ্র তৈরির সময় উপজাতীয় জনসমষ্টির কর্মসংস্থান যেন বৃদ্ধি পায় এবং এর সুফল যেন তাদের ঘরে ওঠে তার ব্যবস্থা করাও জরুরি। প্রয়োজন হলে এ সম্পর্কে আইন প্রণয়ন করাও প্রয়োজন।

পার্বত্য চট্টগ্রাম বাংলাদেশের সবচেয়ে সুন্দর এবং আকর্ষণীয় অঞ্চল। এখানকার মানুষজন শান্তিপ্রিয় এবং কর্মক্ষম। উপজাতীয় জনসমষ্টি যুগ যুগ ধরে নির্যাতিত হয়ে, অনেক সময় প্রতারিত হয়ে হতাশাগ্রস্ত হয়েছেন। জাতীয় ঐক্যের স্বার্থেই এসব জনগণের মধ্যে আস্থার ভাবটা সুদৃঢ় করতে হবে। সরকার যে তাদেরও এবং সরকারি উদ্যোগ যে তাদেরই স্বার্থে, এই বিশ্বাস তাদের তৈরি করতে হবে। একবার তারা আস্থাশীল হয়ে উঠলে প্রত্যেকটি সরকারি উদ্যোগে তাদের সমর্থন হয়ে উঠবে সর্বাত্মক। এই লক্ষ্য অর্জনের জন্যে তাই স্থূল কিছু পদক্ষেপ নয়, বরং বেশকিছু সৃজনশীল উদ্যোগ প্রয়োজন। সরকার সচেতনভাবে অগ্রসর হলে আজ যা অসম্ভব বলে মনে হচ্ছে কাল তাই বাস্তব হয়ে উঠবে। পার্বত্য চট্টগ্রাম আবারো শান্তিপূর্ণ, সুশৃঙ্খল, আকর্ষণীয় হয়ে উঠবে। হয়ে উঠবে বাংলাদেশের সবচেয়ে সুন্দর এলাকা।

www.pathagar.com

কানকুনের দিকে তাকিয়ে

নিষ্ঠুরতা এবং আত্মস্বার্থের মোহ যে কত অদম্য, কত অপ্রতিরোধ্য তার হাজারো নিদর্শন শুধু এদেশে নয় বা দক্ষিণ এশীয় অঞ্চলে নয়, সারা বিশ্বব্যাপী বিস্তৃত রয়েছে। সদ্য সমাপ্ত কানকুন সম্মেলনের দিকে দৃষ্টি দিন, দেখবেন বিশ্বের উন্নত, সমৃদ্ধ অর্থনৈতিক পেশীর অধিকারী ইউরোপ এবং উত্তর আমেরিকার প্রভাবশালী রাষ্ট্রগুলো বিশ্বের অনুন্নত, দরিদ্র, অর্থনৈতিক দিক থেকে প্রান্তিক রাষ্ট্রসমূহের ওপর কি নির্মমভাবে চাপ সৃষ্টি করে চেয়েছিল নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধি করতে, এটি জেনেও যে, এ প্রক্রিয়া চালু থাকলে দরিদ্র দেশগুলো আরও দরিদ্র হয়ে অভাবনীয় সঙ্কটে নিপতিত হবে। অথচ এসব প্রভাবশালী রাষ্ট্রই বিশ্বময় স্বাধীনতা এবং স্বাতন্ত্র্যের কথা বলে থাকে। মানবাধিকার সংরক্ষণের ওপর জোর দিয়ে মানবতার আদর্শকে সমুন্নত রাখার বুলি কপচিয়ে শিশুশ্রম নিষিদ্ধ করার পক্ষে হাজারো যুক্তি উপস্থাপন করে। শ্রমজীবীদের অধিকার সম্পর্কে ওকালতি করে। ভাগ্য ভালো যে কানকুন (Cancun) সম্মেলনে কোনো ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত না হওয়ায় এ সম্মেলন ব্যর্থ হয়েছে। বিশ্বব্যাংকের এককালের প্রধান অর্থনীতিবিদ জোসেফ স্টিগলিৎসের (Joseph Stiglitz) পরামর্শ যে, "মন্দ চুক্তি থেকে চুক্তিহীনতাই উত্তম।" (No agreement is better than bad agreement.) তাই বিশ্বে এক ধরনের স্বস্তি এনে দিয়েছে, যদিও তা কোনো পরিকল্পিতভাবে আসেনি, এসেছে দরিদ্র রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে এক ধরনের ঐকমত্যের ফলে।

সামষ্টিক সম্পদের নিরিখে ইতিহাসের এ সময়কালে বিশ্ব অত্যন্ত সমৃদ্ধ। প্রায় ৬০০ কোটি মানুষের সচ্ছল জীবনযাপনের জন্য এ সম্পদ প্রচুর। কিন্তু ভেবে দেখেছেন কি এ সমৃদ্ধ বিশ্বে, প্রাচুর্যের মধ্যে বিশ্বের জনসমষ্টির এক বিরাট অংশ নির্মম দারিদ্র্যের শিকার হয়েছে। এক হিসেবে দেখা যায়, ৬০০ কোটি মানুষের প্রায় অর্ধেক, ২৮০ কোটির মতো মানুষকে, বেঁচে থাকতে হচ্ছে প্রতিদিন ২ ডলারের মধ্যে এবং ১২০ কোটি মানব সন্তানকে জীবনধারণ করতে হচ্ছে দৈনিক মাত্র এক ডলারের ওপর। এ সংখ্যা সমগ্র জনসমষ্টির প্রায় এক-পঞ্চমাংশ। ব্রিটিশ কবি কোলরিজ (ST Coleridge) তার বিখ্যাত কবিতা "The Ancient Mariner"-এ লিখেছিলেন, সমুদ্রের অভিযাত্রীরা দেখেছেন চারদিকে পানি আর পানি, কিন্তু পান করার জন্যে পাচ্ছে না এক ফোঁটাও (Water, Water everywhere; nor any drop to drink)। বিশ্বের সবচেয়ে দরিদ্র মানব সন্তানদের অধিকাংশের আবাসভূমি হল ভারত এবং চীন। তারপরেই আসে বাংলাদেশের নাম। এ মানব সন্তানেরা শুধু যে দরিদ্র তাই নয়, মানবেতর জীবনযাপন করতে করতে তাদের অধিকাংশই মানবিক মর্যাদা পর্যন্ত

www.pathagar.com

হারিয়েছেন। উন্নত বিশ্বের সমৃদ্ধ জাতির নেতৃবৃন্দ তা জানেন এবং এতো জানেন যে, তৃতীয় এবং চতুর্থ বিশ্বের এসব অনুন্নত ও দরিদ্র জাতির সম্পদ লুট করেই তারা সমৃদ্ধশালী হয়েছেন। মাত্র বছর পঞ্চাশেক পূর্বে এসব দরিদ্র জাতির প্রায় সবাই ঔপনিবেশিক দখলদার সামাজ্যবাদী শক্তির নগ্ন থাবায় ক্ষতবিক্ষত হয়েছে। তাদের দ্বারাই লুণ্ঠিত ও অপহৃত হয়ে নিঃস্ব হয়েছে। শুধুমাত্র পেশীশক্তির নিষ্ঠুর পেষণে সবকিছু আজও দারিদ্র্যের সাথে লড়াই করেছে। এ লুণ্ঠনকারী তস্কররাই জ্ঞান-বিজ্ঞানের অধিকারী হয়ে, নতুন নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবন করে, মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত থেকে নিজেদের সম্পদকে শুধু সংরক্ষণ করতে চাচ্ছে না, বিশ্বায়নের অন্তরালে অতীতের দখলদারিত্বের আদলে আবারো হিংস্র দন্তনখর উন্মুক্ত করতে উদ্যত হয়েছে। এক হিসেবে দেখা যায়, বিশ্বের উন্নত জাতিগুলোর প্রতিনিধিত্বকারী ৭ জাতির নিয়ন্ত্রণে রয়েছে বিশ্বের মোট সম্পদের ৮০ ভাগ এবং অবশিষ্টদের ভাগে পড়েছে মাত্র ২০ ভাগ। অথচ এসব অনুন্নত রাষ্ট্রেই বসবাস করছেন বিশ্বের মোট জনসংখ্যার শতকরা ৮০ ভাগ। আর এক হিসেবে জানা যায়, মাত্র ২৪০টি বহুজাতিক সংস্থা নিয়ন্ত্রণ করছে বিশ্ববাণিজ্যের শতকরা ৪০ ভাগ এবং এসব সংস্থার কেন্দ্রবিন্দু হল যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপ।

চতুর্থ বিশ্ব বা সবচেয়ে অনুন্নত (Least Developed Countries) ৪০টি রাষ্ট্রের নেতৃত্ব দিচ্ছে বাংলাদেশ। এ রাষ্ট্রগুলোতে বসবাস করছেন বিশ্বের মোট জনসমষ্টির শতকরা ১৮ থেকে ২০ ভাগ মানুষ। কিন্তু অবিশ্বাস্য হলেও সত্য যে, এসব রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে বিশ্ববাণিজ্যের শতকরা মাত্র ১ ভাগ। এসব রাষ্ট্রে বৈদেশিক বিনিয়োগের মাত্র শতকরা ২.৭ ভাগ রয়েছে এবং বৈশ্বিক বাণিজ্যিক ঋণের রয়েছে মাত্র ০.২ ভাগ। এসব হিসাব-নিকাশ করেই হাভানায় অনুষ্ঠিত ৭৭-জাতির সম্মেলনে কিউবার নেতা ফিডেল ক্যাস্ট্রো বলেছিলেন : "ফৎপীড়নকারী, লুণ্ঠনকারী, সাম্রাজ্যবাদী দেশসমূহের নেতাদের বিচার হওয়া উচিত নুরেমবার্গের মতো এক বিচারালয়ে এসব অভিযোগে।"

তারপরেও কানকুন সম্মেলনে উন্নত বিশ্বের প্রতিনিধিরা দীর্ঘ পাঁচ দিন ধরে (সেপ্টেম্বর ১০-১৪, ২০০৩) ১৪৮ সদস্যবিশিষ্ট বিশ্ববাণিজ্য সংস্থার (WTO) সদস্যদের সামনে নিলর্জ্জভাবে তাদের স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলোই তুলে ধরলেন। অতীতে বাণিজ্য সুবিধা, বৈদেশিক সহায়তা, এমনকি রাজনৈতিক সমর্থন যোগাবার আশ্বাস দিয়ে উন্নত বিশ্ব দরিদ্র দেশগুলোকে বশে আনতে সক্ষম হলেও কানকুনে তা সম্ভব হল না। ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং যুক্তরাষ্ট্রের একাট্টা অবস্থানও ভেস্তে গেল অনুন্নত ও উন্নয়নকামী দেশগুলোর সুদৃঢ় ঐক্যের মুখে। ভারত, ব্রাজিল ও চীনের নেতৃত্বে সংগঠিত ২১ জাতির মেলবন্ধনে যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নের কৃষি নীতি অগ্রহণযোগ্য হয়ে পড়ল। তাদের এ কৃষি নীতির দিকে দৃষ্টি দিন, দেখবেন উন্নত বিশ্ব নিজেদের স্বার্থসংরক্ষণে কত অযৌক্তিক, নীতিহীন এবং ভণ্ড। তারা তাদের দেশের কৃষকদের সরকারি ভর্তুকি দিতে পারবেন, কিন্তু উন্নয়নকামী দেশগুলো কোনো ভর্তুকি দিতে পারবে না, কেননা এসব দরিদ্র দেশ কৃষিতে ভর্তুকি না দিলে তাদের কৃষিপণ্যের মূল্য হ্রাস পাবে এবং ধনী

www.pathagar.com

দেশগুলো এসব পণ্য সুলভে ক্রয় করে নিয়ে যাবে নিজেদের দেশে। সুলভে ক্রয় করা এসব কাঁচামালকে প্রক্রিয়াজাত করে, কোনো কোনো ক্ষেত্রে তাদের শিল্পপণ্যে রূপান্তরিত করে, আবারো এসব দরিদ্র দেশে চারগুণ মূল্য সংযোজন করে রফতানি করবে। এভাবে দরিদ্র দেশের উপর শোষণের মাত্রাকে বৃদ্ধি করে ধনী দেশগুলো বাণিজ্যক্ষেত্রে তাদের একাধিপত্য অব্যাহত রাখবে। তারপরেও তারা অবাধ বাণিজ্য ও বিশ্বায়নের কথা বলতে বলতে মুখে ফেনা ওঠায়।

১৯৯৪ সালে বাণিজ্য ও শুল্ক সংক্রান্ত সাধারণ চুক্তির (General Agreement On Trade and Tariff -GATT) উরুগুয়ে রাউন্ডের সফল পরিণতির প্রেক্ষিতে ১৯৯৫ সালের ১ জানুয়ারি মরক্কোর মারাকেশে আনুষ্ঠানিকভাবে বিশ্ববাণিজ্য সংস্থার (World Trade Organization-WTO) জন্ম হয়। এ সংস্থায় সম্মিলিত হয় বিশ্বের সমৃদ্ধ, দরিদ্র ও উন্নয়নকামী দেশসমূহ। উন্নয়নকামী ও স্বল্পোন্নত দেশসমূহের লক্ষ্য ছিল বহুপাক্ষিক (Multilateral) কাঠামোয় বাণিজ্যক্ষেত্রে কিছু সুযোগ-সুবিধা লাভ করা। উন্নত দেশগুলো চেয়েছিল বিশ্ববাণিজ্য ক্ষেত্রে তাদের একাধিপত্য বজায় রাখতে। উন্নত বিশ্বের লক্ষ্য অর্জিত হয়েছে বটে, কিন্তু দরিদ্র দেশগুলো তাদের ভাগ্য পরিবর্তনে সক্ষম হয়নি। বিন্দুমাত্র অগ্রগতি সাধিত হয়নি দারিদ্র্য নিরসনেও। ২০০৩ সালের জুন মাসে বিশ্বের স্বল্পোন্নত দেশগুলোর প্রতিনিধি সমন্বয়ে ঢাকায় অনুষ্ঠিত সম্মেলনে ঢাকা ঘোষণা (Dhaka Declaration) গৃহীত হয়েছিল বাংলাদেশের নেতৃত্বে। এ সম্মেলনে যোগদান করেছিলেন ৩৯টি স্বল্পোন্নত দেশের প্রতিনিধিবর্গ। প্রতিশ্রুতি গৃহীত হয়েছিল যে, কানকুন সম্মেলনে স্বল্পোন্নত দেশগুলোর স্বার্থ সংরক্ষিত না হলে তারা বিশ্ববাণিজ্য সংস্থার কোনো ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর করবে না। কানকুনের বৈঠক কোনো ঘোষণাপত্র ছাড়াই শেষ হলে তাদের সে অঙ্গীকার রক্ষা করা সম্ভব হয়েছে। শুধু বিশ্বের স্বল্পোন্নত দেশসমূহ নয়, চীন-ভারত-ব্রাজিলসহ বাণিজ্যিক গুরুত্বসম্পন্ন যে ২১টি উন্নয়নশীল দেশ জোট গঠন করেছিল, কানকুনে তারাও প্রতিবাদে উচ্চকণ্ঠ হয়ে ওঠে। শুধু তাই নয়, কানকুন সম্মেলনের তৃতীয় দিবসে স্বল্পোন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলোর সমন্বয়ে ৯০টি দেশের যে জোটের জন্ম হয় তাই উন্নত দেশগুলোর একপেশে নীতির বিরুদ্ধে বিরাট এক চ্যালেঞ্জ হিসেবে মাথা উঁচু করে। ফলে সম্মেলনের চতুর্থ দিনে সম্মেলনের চেয়ারম্যান মেক্সিকোর পররাষ্ট্রমন্ত্রী লুইস আর্নেস্টো ডারবেজ সমঝোতার যে প্রস্তাব উত্থাপন করেন তা প্রত্যাখ্যাত হয় সকল জোট কর্তৃক। ৯০টি দেশের জোটের নিকট তা গ্রহণযোগ্য হয়নি। গ্রহণযোগ্য হয়নি ২১টি উন্নয়নশীল দেশের জোটের নিকট। গ্রহণযোগ্য হয়নি আফ্রিকান ইউনিয়ন, ক্যারিবিয়ান ও প্যাসিফিক অঞ্চলের দেশগুলোর কাছেও। কৃষিতে ভর্তুকি বন্ধ করার প্রস্তাবে উন্নত ধনী দেশগুলোও রাজি হয়নি। ফলে কানকুনে ১৪৮-জাতির এ সম্মেলন কোনো ঘোষণা ছাড়াই সমাপ্ত হল, অনেকটা ১৯৯৯ সালে সিয়াটলে (Seatle) অনুষ্ঠিত সম্মেলন বিশ্বায়ন বিরোধীদের প্রচণ্ড ক্ষোভের মুখে যেভাবে শেষ হয়েছিল তেমনি।

কেন, কি কারণে কানকুন সম্মেলন ব্যর্থ হল এবং এ ব্যর্থতার ফল কি হতে পারে এ বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনা-পর্যালোচনা হতে থাকবে দীর্ঘদিন ধরে। এতে কে হারল এবং কারা জিতল তা থাকবে দীর্ঘদিনের বিশ্লেষণের শিরোনাম। এরই মধ্যে কেউ কেউ মত প্রকাশ করেছেন এ সম্পর্কে। উন্নয়নশীল ও স্বল্পোন্নত দেশগুলোর কোনো কোনো

www.pathagar.com

প্রতিনিধি আবেগবিহ্বল হয়ে বলেছেন, ইউরোপ ও আমেরিকার উন্নত দেশগুলো ইচ্ছা করলেই যেকোনো মন্দ চুক্তি দরিদ্র দেশগুলোর ওপর চাপিয়ে দেবে তার সম্ভাবনা আর নেই। আফ্রিকার তুলা উৎপাদনকারী দেশগুলো, বিশেষ করে বেনিন, মালি ও চাদের প্রতিনিধিরা এ সম্মেলনের ব্যর্থতাকে নিজেদের বিজয় বলে চিহ্নিত করেছে। কিন্তু তারপরেও কথা থাকে। উন্নত বিশ্বের হাতে রয়েছে বাণিজ্যিক আধিপত্য সংরক্ষণের হাজারো প্রক্রিয়া। বিশ্ববাণিজ্যের সিংহভাগ তারাই নিয়ন্ত্রণ করছে। দরিদ্র রাষ্ট্রগুলোতে বিনিয়োগ ক্ষেত্রেও রয়েছে তাদের প্রভূত প্রভাব। তাছাড়া, স্বল্পোন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলোর মধ্যে রয়েছে পারস্পরিক রেষারেষি এবং এক ধরনের ঈর্ষা। তারা কানকুনে যেভাবে একজোট হয়ে কাজ করেছে, অন্যান্য ক্ষেত্রে তেমন ঐক্যবদ্ধ নীতি গ্রহণে সক্ষম নয়। অনেক ক্ষেত্রে উন্নয়নশীল দেশগুলোই নিজেদের বিরুদ্ধে কাজ করে থাকে। এই তো মাত্র দিন তিনেক আগে দক্ষিণ এশিয়ার সবচেয়ে শক্তিশালী দেশ ভারত তার স্বল্পোন্নত প্রতিবেশী বাংলাদেশের উত্তর-পূর্ব ভারতে সিমেন্ট রফতানি বন্ধ করেছে কিছুটা ট্যারিফের এবং অধিকাংশই নন-ট্যারিফ দেয়াল তুলে এবং তাও এমন এক সময় যখন ঢাকা-আগরতলা বাস চলাচল শুরু হল বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে। এক্ষেত্রে এটিও উল্লেখযোগ্য যে, উন্নত বিশ্ব যেহেতু এই বহুপাক্ষিক ব্যবস্থা তাদের স্বার্থের অনুকূল হচ্ছে না, তাই দ্বিপাক্ষিক চুক্তির মাধ্যমে বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়নশীল রাষ্ট্রগুলোকে দলে টেনে নিতে পারে। ব্রাজিল বা চীন বা ভারতকে এভাবে তারা কো-অপ্ট (Co-opt) করলে তৃতীয় বিশ্বের যে সংহতি কানকুনকে ব্যর্থ করেছে তার অস্তিত্ব বিপন্ন হতে পারে। উন্নত বিশ্বের কয়েকটি সুবিধা এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। **এক.** উন্নত বিশ্বের বাজার এখন পর্যন্ত দরিদ্র দেশগুলোর জন্য বৃহত্তর বাজার। উন্নয়নশীল ও স্বল্পোন্নত দেশগুলো এখন পর্যন্ত পরস্পরের পণ্যের বাজারে পরিণত হয়নি। হয়নি বলেই উন্নত বিশ্বের পক্ষে সম্ভব হচ্ছে দরিদ্র দেশগুলোর পণ্যের বাজার নিয়ন্ত্রণ করা। **দুই.** উন্নত বিশ্বের রাজনৈতিক পেশী এতই শক্ত এবং উন্নয়নশীল ও স্বল্পোন্নত দেশগুলোর মধ্যে পারস্পরিক অনৈক্য এতই প্রবল যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে মোড়লী করার জন্য তাদেরই আহ্বান করতে হয়।

তবে সেই সিয়াটল সম্মেলনই বলুন বা এখনকার কানকুন সম্মেলনের কথাই ভাবুন, উন্নত বিশ্বেই ভীষণভাবে মানবতাবাদী কণ্ঠে উচ্চারিত হওয়া শুরু হয়েছে পাশ্চাত্যের স্বার্থান্ধ ও মুনাফা লুণ্ঠনকারী নীতির বিরুদ্ধে শ্লোগান। বিশ্বায়নকে তারা অতীতের সেই মানবতাবিরোধী, লুণ্ঠনকারী, জবরদখলমূলক বিশ্ব ব্যবস্থারূপে দেখে তার যেন পুনরাবির্ভাব না ঘটে তা বলা শুরু করেছেন। জোসেফ স্টিগলিৎসের কণ্ঠে তারই প্রতিধ্বনি আমরা শুনতে পাই। এসব কণ্ঠকে আরও জোরদার করতে পারলে এবং উন্নয়নশীল ও স্বল্পোন্নত বিশ্ব সীমিত পর্যায়ে হলেও বাণিজ্য সম্পর্কে একমত হলে সেই ধ্রুপদী পুঁজিবাদের করাল গ্রাস থেকে মুক্ত হবার শত বাতায়ন উন্মুক্ত হতে পারে। কানকুনে উন্নত বিশ্ব হেরে গেছে এতে উল্লসিত না হয়ে কীভাবে উন্নয়নশীল ও স্বল্পোন্নত বিশ্ব বিজয়ী হতে পারে এ সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনার পরিধি প্রসারিত করাই আজকের সবচেয়ে বড় সমস্যা। পারবে কি উন্নয়নশীল বিশ্ব এ চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করতে?

www.pathagar.com

আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বাংলাদেশের অর্জন

স্বল্পোন্নত বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে আর স্বল্পোন্নত নয়। দ্বি-পাক্ষিক সম্পর্কের ক্ষেত্রেই হোক আর বহুপাক্ষিক ক্ষেত্রেই বলুন বাংলাদেশ পরিণত এ্যাক্টর হিসেবেই তার ভূমিকা পালনে কৃতসংকল্প হয়েছে। গত দু'বছরের সময়কালকে পর্যালোচনা করুন, বাংলাদেশের 'ক্ষমতা বৃদ্ধির' (Capacity bulding) পরিমাণ যে উল্লেখযোগ্য তাতে কোনো সন্দেহ নেই। মাত্র ক'দিন পূর্বে সমাপ্ত মেক্সিকোর কানকুনে অনুষ্ঠিত বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার (World Trade Organization—WTO) মন্ত্রী পর্যায়ে সম্মেলনের কার্যক্রম বিবেচনা করলে এটি সুস্পষ্ট হয়। সুস্পষ্ট হয় দিল্লিতে অনুষ্ঠিত যৌথ নদী কমিশনের (Joint Rivers Commision) কার্যবিবরণী পর্যালোচনা করলে। আরও সুস্পষ্ট হবে চারদলীয় জোট সরকারের পূর্বমুখী পররাষ্ট্রনীতি বিশ্লেষণ করলে এবং এসব ক্ষেত্রেই নিহিত রয়েছে বাংলাদেশের জাতীয় স্বার্থের সূক্ষ্ম সূত্রগুলো। ৪৯টি স্বল্পোন্নত দেশের নেতৃত্বদান করে, ২০০৩ সালের মে মাসে ঢাকায় ৩ দিনের সম্মেলনে ৩৯টি স্বল্পোন্নত দেশের বাণিজ্য মন্ত্রীদের ঐকমত্যের ভিত্তিতে অভিন্ন বিষয়ে কানকুন সম্মেলনে নিজেদের স্বার্থ আদায়ের লক্ষ্যে যে ঢাকা ঘোষণা গৃহীত হয় তা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করেছে। ঢাকা সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী নেতৃবৃন্দ বলেন, ঢাকা ঘোষণায় গৃহীত ১৬ দফা দাবি নিয়ে উন্নত বিশ্বের সাথে ঐক্যবদ্ধভাবে দর কষাকষি করতে পারলে আমাদের বহুপাক্ষিক বাণিজ্য ব্যবস্থা আরো সুসংগঠিত হবে, এতে কোনো সন্দেহ নেই। এই ষোল-দফা একান্তভাবেই স্বল্পোন্নত দেশগুলোর দাবি। কানকুন সম্মেলনে বাংলাদেশের বাণিজ্যমন্ত্রী আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী ৪৯টি স্বল্পোন্নত দেশগুলোর দাবি যেভাবে পেশ করেছেন, তাতে উন্নয়নশীল ও উন্নত রাষ্ট্রমণ্ডলীর সমর্থন আদায়ে যোগাযোগ চাপ প্রয়োগ এবং নিজেদের দাবিকে সুনির্দিষ্ট করে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। সম্মেলনে যোগদানের পূর্বে স্বদেশে বিভিন্ন মহলের সাথে মতবিনিময় করে যেভাবে সুনিপুণ হোমওয়ার্কের মাধ্যমে নিজেদের প্রস্তুত করেছেন তা শুধু আকর্ষণীয় নয়, অত্যন্ত প্রশংসনীয়ও বটে। কানকুন সম্মেলন চূড়ান্ত পর্যায়ে সফল না হলেও ৪৯টি স্বল্পোন্নত দেশের নেতা হিসেবে বাংলাদেশের সাফল্য অকিঞ্চিৎকর নয়। কানকুনে বাংলাদেশ জয়যুক্ত হয়েছে। ঢাকা ঘোষণা মিনিস্ট্রিয়াল টেক্সটে স্থান লাভ করেছে। উন্নত দেশের বাজারে স্বল্পোন্নত দেশের অকৃষি পণ্যের প্রবেশাধিকার, অস্থায়ী ভিত্তিতে শ্রমের অবাধ যাতায়াত, কৃষিতে ভতুর্কিদানের স্বীকৃতিসহ বিভিন্ন পরবর্তী সম্মেলনে আলোচনার রেফারেন্স পয়েন্ট হিসেবে বাংলাদেশ ব্যবহার করতে পারবে।

এদিকে দীর্ঘ তিন বছর পরে দিল্লিতে অনুষ্ঠিত ভারত-বাংলাদেশ যৌথ নদী কমিশনে বাংলাদেশের পানিসম্পদমন্ত্রী হাফিজ উদ্দিন আহমদ যে ভূমিকা গ্রহণ করেন–ভারতের বহুল আলোচিত নদী সংযোগ মেগা-প্রজেক্টকে আলোচ্যসূচিতে নিয়ে আসতে সক্ষম

www.pathagar.com

হয়েছেন এবং ভারত-বাংলাদেশের মধ্যদিয়ে প্রবাহিত ৫৪টি নদীর ৫৩টির পানি সম্পদে বাংলাদেশের যে ন্যায়সঙ্গত ও বৈধ অধিকার রয়েছে তা বৃহৎ ভারতকে অনুধাবন করাতে সক্ষম হয়েছেন। কোনো আন্তর্জাতিক নদীর পানিকে উজানের কোনো দেশ, তা সে যতই শক্তিশালী বা বৃহৎ হোক না কেন, ভাটির দেশ বা দেশসমূহের অজ্ঞাতে বা অসম্মতিতে একতরফাভাবে ব্যবহার করবে বা নদীর গতিপথ পরিবর্তন করে পানি প্রবাহকে শুধুমাত্র নিজের জন্যে ব্যবহার করবে তা কোনোক্রমে গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। ভারতের পানিসম্পদমন্ত্রী অর্জন শেঠী ভারত-বাংলাদেশ যৌথ নদী কমিশনের বৈঠকে তা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন। এর প্রেক্ষাপট সম্পর্কে সকলেই অবগত রয়েছেন। ভারত আন্তর্জাতিক নদী ব্রহ্মপুত্র এবং সেই অববাহিকার ৩৬টি নদীর পানির একাংশকে ১২০০ কিলোমিটার দীর্ঘ কৃত্রিম নদী ও খাল খনন করে ভারতের উত্তর, উত্তর-পশ্চিম, এমনকি দক্ষিণের কাবেরী নদী পর্যন্ত টেনে নেবার যে অশুভ প্রকল্প বাংলাদেশের অলক্ষ্যে গ্রহণ করে টাস্কফোর্স গঠন করেছে, তা বাংলাদেশের জনগণের জীবন ও জীবিকা, বাংলাদেশের পরিবেশ ও প্রতিবেশ, বাংলাদেশের কৃষি ও বনজ সম্পদ, বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ নৌ-পথ, বিশেষ করে ইউনেস্কো (UNESCO) কর্তৃক 'বিশ্ব ঐতিহ্য' (World Heritage) রূপে স্বীকৃত সুন্দরবনকে বিপন্ন করে তুলবে এসব বিষয় ভারতের নীতি-নির্ধারকদের সামনে জোরে-শোরে তুলে ধরেন। গঙ্গার পানি বণ্টন চুক্তি স্বাক্ষরিত হলেও বাংলাদেশ যে চুক্তির শর্ত অনুযায়ী পানি পাচ্ছে না, তাও বাংলাদেশের মন্ত্রী কমিশনে উপস্থাপন করেন তথ্য-উপাত্তসহ। ভারতের সাথে এসব দ্বিপাক্ষিক বিষয়ে বাংলাদেশের ভূমিকা এখন শুধু শক্তিশালী নয়, যুক্তিনির্ভরও বটে।

মাত্র ক'দিন পূর্বে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এম মোর্শেদ খান জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে বক্তৃতা দানকালে লোয়ার রাইপেরিয়ান (Lower Riparian) বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক নদীর পানিতে ন্যায়সঙ্গত হিস্যার দাবি যেমন উপস্থাপন করেন সুস্পষ্টভাবে, তেমনি আজকের এই অশান্ত পৃথিবীতে শান্তিপূর্ণ পন্থায় সমস্যা সমাধানের ওপর জোর দিয়ে অনেকের প্রশংসা কুড়িয়েছেন। জাতিসংঘের মহাসচিব কফি আনানের (Kofi Annan) সাথে আলোচনাকালে মহাসচিব বিশ্বময় শান্তি প্রতিষ্ঠার উদ্যোগে বিশেষ করে বিশ্বের বিভিন্ন যুদ্ধবিধ্বস্ত ও সন্ত্রাস কবলিত জনপদে বাংলাদেশ সামরিক বাহিনীর তরুণদের ভূয়সী প্রশংসা করে বলেন, 'শান্তি প্রতিষ্ঠার উদ্যোগে বাংলাদেশের ভূমিকা আদর্শস্থানীয়।'

জোট সরকারের আমলে গৃহীত পররাষ্ট্রনীতির 'পূর্ব দিকে দৃষ্টি দিন' (Look East) এই দিকটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আজকের বিশ্ব পরিস্থিতির নিরিখে, বিশেষ করে বুশ-ব্লেয়ারের নেতৃত্বে ইঙ্গ-মার্কিন জোট শক্তির ইরাক দখলের পরে, ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলো যে ধরনের হুমকির সম্মুখীন হয়েছে সেই প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের পূর্বমুখী পররাষ্ট্রনীতি যে অত্যন্ত বাস্তবসম্মত এতে কোনো সন্দেহ নেই। সম্ভাব্য শত্রুর ওপর আগেভাগেই আক্রমণ করে তাকে বিধ্বস্ত করার যে বুশ-তত্ত্ব (Doctrine of Preemptive Attack) আক্রমণকালে আন্তর্জাতিক বিধি-বিধানকে উপেক্ষা করে এবং জাতিসংঘকে পাশ কাটিয়ে শক্তি প্রদর্শনের যে দৃষ্টান্ত স্থাপিত হয়েছে তা বিশ্বের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলোকে গভীর অনিশ্চয়তায় নিমজ্জিত করেছে। তাছাড়াও রয়েছে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অগ্রগতি সাধনের লক্ষ্য। এই প্রেক্ষিতে দক্ষিণ এশিয়ার ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলোর অবস্থা অত্যন্ত নাজুক।

www.pathagar.com

দক্ষিণ এশিয়ার দিকে দৃষ্টি দিন, দেখবেন দক্ষিণ এশিয়ার দুই পারমাণবিক শক্তিধর ভারত ও পাকিস্তান ব্যস্ত রয়েছে নতুন নতুন কলাকৌশলে নিজেদের শক্তি বৃদ্ধি করতে। যুক্তরাষ্ট্র এরই মধ্যে ভারতকে তার সহযোগীরূপে চিহ্নিত করেছে। ভারত, তাছাড়া যুক্তরাষ্ট্রের অকৃত্রিম বশংবদ এবং মধ্যপ্রাচ্যের নতুন শক্তি ইসরাইলের কাছাকাছি এসে গেছে। ইসরাইল থেকে অত্যাধুনিক অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করছে। কাজে লাগাচ্ছে ইসরাইলের দক্ষ গোয়েন্দা সংস্থাকে। ভারতের লক্ষ্য একটাই এবং তা হচ্ছে পূর্ব সীমান্তে দ্রুতপদে এগিয়ে আসা চীনের সার্থক মোকাবিলা। পূর্বে মালাক্কা প্রণালী থেকে শুরু করে পশ্চিম এশিয়ার ইসরাইল এবং মধ্য এশিয়ার আফগানিস্তানের মধ্যদিয়ে কাজাখস্তান ও তাজিকিস্তান পর্যন্ত প্রভাব বলয় গড়ে তুলে এশিয়ার এক নম্বর শক্তিরূপে আবির্ভূত হওয়া। চীনও বসে নেই। পাকিস্তানকে আরো কাছে টেনে, মায়ানমারের সাথে বন্ধন সূত্রকে আরো সুদৃঢ় করে, ভারতের পূর্ব প্রান্তের ছোট ছোট রাষ্ট্রগুলোর সাথে সুসম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করতে কৃতসংকল্প। এক কথায়, এই নব্য স্নায়ুযুদ্ধের মহড়ায় ভারত যেমন চীনের তিন পাশে অবস্থিত রাষ্ট্রগুলোর সাথে সখ্যতা স্থাপন করছে, চীনও তেমনি তার সামরিক বলয় তিব্বত থেকে পাকিস্তান এবং মায়ানমার থেকে বাংলাদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত করতে উদ্যত। তিব্বতে চীনের বিমান ঘাঁটি বিস্তৃতকরণ, ভারতের আন্দামানের কাছাকাছি কোকো দ্বীপপুঞ্জে চীনের নৌবাহিনীর অবস্থান সুদৃঢ়করণ, মায়ানমারের মান্দালয়ে ১২০০০ ফুট দীর্ঘ রানওয়ে নির্মাণ, পাকিস্তানকে পারমাণবিক ক্ষেপণাস্ত্র প্রযুক্তি প্রদান যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তেমনি গুরুত্বপূর্ণ হল ভারত মহাসাগরে ভারতীয় নৌবাহিনীর শক্তিবৃদ্ধি। এই প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের মতো ক্ষুদ্র রাষ্ট্র সামরিক সাজসজ্জার দিকে আকৃষ্ট না হয়ে বাংলাদেশের নিরাপত্তার জন্য দারিদ্র্য দূরীকরণসহ অর্থনৈতিক অগ্রগতি যে অপরিহার্য, তা স্বীকার করে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অত্যন্ত প্রাণবন্ত অঞ্চল দক্ষিণ-পূর্ব এবং পূর্ব এশিয়ার সাথে সহযোগিতা বৃদ্ধিকেই অধিক গ্রহণযোগ্য বলে মনে করে।

এই প্রেক্ষাপটেই বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক সম্পর্কের দিক পরিবর্তন অনুধাবনযোগ্য। ২০০২ সালে জোট সরকার পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে নতুন লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে। পররাষ্ট্রনীতির দিক পরিবর্তিত হয়েছে। পরিবর্তিত হয়েছে এর স্টাইলও। এ প্রসঙ্গে এর কয়েকটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখযোগ্য। **এক.** এখন বাংলাদেশের নীতি নির্ধারিত হচ্ছে ঢাকায়। বাংলাদেশের স্বার্থে, সকল নিয়ন্ত্রণমুক্ত পরিবেশে। **দুই.** এই নীতির লক্ষ্য ত্রিবিধ (ক) আঞ্চলিক পর্যায়ে সৎ প্রতিবেশীমূলক সম্পর্ক সুদৃঢ়করণ। (খ) বৈশ্বিক পর্যায়ে অর্থনৈতিক কূটনীতিকে প্রাণবন্তকরণ। (গ) জাতীয় পর্যায়ে আঞ্চলিক অখণ্ডতা ও সার্বভৌমত্ব সংরক্ষণ। **তিন.** বাংলাদেশের 'পূর্ব দিকে দৃষ্টি দিন' (Look East) -এর অর্থ এই নয় যে, বাংলাদেশ অন্য দিকসমূহকে উপেক্ষা করছে। পূর্বমুখী নীতির কার্যকরতায় বাংলাদেশ সব সময় প্রতিবেশী দেশসমূহের সাথে সুসম্পর্ক প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যকে অগ্রাধিকার দিয়েছে। ২০০২ সালের আগস্টে ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী যশোবন্ত সিনহা ঢাকায় এলে এবং পরবর্তীতে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী দিল্লী সফরে গেলে ভারতের নীতিনির্ধারকদের সুস্পষ্টভাবে জানিয়ে দেয়া হয়, বাংলাদেশ ভারতকে এক মহান প্রতিবেশীরূপে পেতে চায়। ২০০২ সালে নেপালে দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সহযোগিতার শীর্ষ বৈঠকে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া ভারতের প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ীর সাথে দ্বি-পাক্ষিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন।

www.pathagar.com

২০০২ সালের জুলাই মাসে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট পারভেজ মোশাররফ ঢাকা সফরে এসে তিনিই দীর্ঘ একত্রিশ বছরের মধ্যে সর্বপ্রথম একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের সময়ে পাকিস্তানি সৈনিকের বর্বর আচরণ, গণহত্যা ও তাদের অমানবিক কাজের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন। ফলে এক দীর্ঘস্থায়ী ক্ষতের উপশম ঘটে।

বাংলাদেশের পূর্বমুখী নীতির উল্লেখযোগ্য মাইলফলক হল বাংলাদেশ-চীন সম্পর্কের নতুন অধ্যায়। ২০০২ সালের জুলাই মাসে চীনের প্রধানমন্ত্রী ঝু রং ঝি ঢাকায় এলে তারই আমন্ত্রণে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী পাঁচ দিনের সফরে চীনে গমন করেন। সেখানে অন্তরঙ্গ আলোচনা-পর্যালোচনার পরে কতকগুলো দ্বি-পাক্ষিক, দীর্ঘকালীন এবং ব্যাপকভিত্তিক চুক্তি স্বাক্ষর করেন। বাংলাদেশের নিরাপত্তা এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে এসব চুক্তির সুদূরপ্রসারী প্রভাব থাকবে বলে আশা করা হচ্ছে। থাইল্যান্ডের সাথে বাংলাদেশের সম্পর্কের নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয় এই সময়ে। থাই প্রধানমন্ত্রী থাকসিন সিনাওয়াত্রা ১২ ডিসেম্বর চট্টগ্রাম এসে চট্টগ্রাম-চিয়াংমাই উদ্বোধনী ফ্লাইটে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীকে থাইল্যান্ড সফরে নিয়ে যান স্বয়ং। এমন ঘটনা ইতিহাসে বিরল। বাংলাদেশের নিকটতম প্রতিবেশীদের অন্যতম মায়ানমারের সাথেও বাংলাদেশের সম্পর্ক মধুর হয় এই সময়ে। ২০০২ সালের ডিসেম্বরে মায়ানমারের প্রধানমন্ত্রী সিনিয়র জেনারেল থান 'শ (Than Shwe) ঢাকা সফরে এলে অত্যন্ত অন্তরঙ্গ পরিবেশে কয়েকটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। কক্সবাজার থেকে ইয়াঙ্গুন পর্যন্ত একটি সড়ক নির্মাণের পরিকল্পনাও গৃহীত হয়। শুধু থাইল্যান্ড এবং মায়ানমার কেন, ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেন্টের ঢাকা আগমনও একটি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। সুকর্ণপুত্রী মেঘবতীর সাথে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর সৌহার্দ্যপূর্ণ আলোচনা দুই ভ্রাতৃপ্রতিম দেশের মধ্যে সুসম্পর্কের এক নতুন অধ্যায়। আসিয়ানের এই তিন দেশের সাথে বাংলাদেশের সুসম্পর্ক অত্যন্ত ইঙ্গিতবহ। তাছাড়াও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়ার সাথে, দূরপ্রাচ্যের জাপান ও দক্ষিণ কোরিয়ার সাথে বাংলাদেশের ঘনিষ্ঠতর সম্পর্ক রচনায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করে এই সময়ে। ফলে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে উন্মোচিত হয় বাণিজ্য বৃদ্ধি ও বাংলাদেশের শ্রমিকদের কর্মসংস্থানের শত বাতায়ন। অন্যদিকে মুসলিম বিশ্বের সাথেও বাংলাদেশের সম্পর্ক আরো ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে। ইসলামী সংহতি সম্মেলনের (Organization of Islamic Coference) মহাসচিব পদে বাংলাদেশ প্রার্থী নির্বাচিত করেছে সালাহউদ্দিন কাদের চৌধুরীকে। এরই মধ্যে বহুসংখ্যক মুসলিম রাষ্ট্র বাংলাদেশের প্রার্থীর পক্ষে সমর্থন জ্ঞাপন করেছে। এই আমলে যুক্তরাষ্ট্র এবং ব্রিটেনের সাথেও সম্পর্ক আরো ঘনিষ্ঠ হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র বিষয়ক মন্ত্রী কলিন পাওয়েল ঢাকায় এসে বাংলাদেশের নীতি-নির্ধারকদের সাথে দ্বি-পাক্ষিক বিষয়ে আলোচনা করে গেছেন। কলিন পাওয়েলের কথায় 'বাংলাদেশ একটি উদারনৈতিক মুসলিম রাষ্ট্র'। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী টনি ব্লেয়ারও বাংলাদেশের অসাম্প্রদায়িক এবং উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। কানাডা বাংলাদেশকে শুল্কমুক্ত পণ্যের প্রবেশাধিকারের আশ্বাস দিয়েছে। মোটকথা, গত দু'বছরে বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সুসম্পর্ক রচনা, জাতীয় স্বার্থ সংরক্ষণ, বাণিজ্য বিস্তার ও বাংলাদেশীদের কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে অর্জন করেছে বিশিষ্ট মাইলফলক। অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে শাজাহান সিরাজের উদ্যোগে পলিথিন মুক্ত এবং নাজমুল হুদার উদ্যোগে দূষণমুক্ত পরিবেশ সৃষ্টির পদক্ষেপ যেমন বৈপ্লবিক, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বাণিজ্য বিস্তারের উদ্যোগও তেমনি অর্থপূর্ণ।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

ISBN 984 8613 05-6